কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ২২
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী
বাংলাপিডিএফ.নেট পরিবেশিত
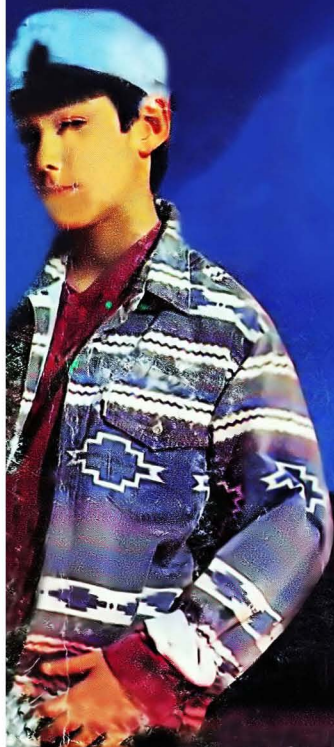
ভলিউম-২২

তিন গোয়েন্দা

৭৬, ৭৭, ৭৮

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1288-7
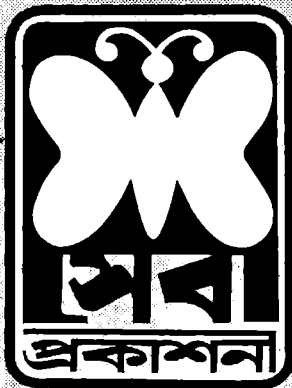
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Volume-22
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

একষট্টি টাকা

চিতা নিরুদ্দেশ ৫—৭২
অভিনয় ৭৩—১৪০
আলোর সঙ্কেত ১৪১—২১৬

তিন গোয়েন্দার আরও বইঃ

তি. গো. ভ. ১/১ (তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা) ৬৬/-
তি. গো. ভ. ১/২ (ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো) ৬৬/-
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)
তি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)
তি. গো. ভ. ৩/১ (হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি) ৫৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি) ৫৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১ (ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)
তি. গো. ভ. ৪/২ (ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)
তি. গো. ভ. ৫ (ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল) ৫৮/-
তি. গো. ভ. ৬ (মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)
তি. গো. ভ. ৭ (পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)
তি. গো. ভ. ৮ (আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ) ৬০/-
তি. গো. ভ. ৯ (পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল) ৬১/-
তি. গো. ভ. ১০ (বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)
তি. গো. ভ. ১১ (অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো) ৬৫/-
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া) ৬৩/-
তি. গো. ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)
তি. গো. ভ. ১৪ (পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন) ৭১/-
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর) ৬৯/-
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ) ৭২/-
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ) ৬০/-
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড) ৬৮/-
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)
তি. গো. ভ. ২০ (খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)
তি. গো. ভ. ২১ (ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার) ৬৮/-
তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত) ৬১/-
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী) ৬৫/-
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি)
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ) ৭১/-
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা) ৫৮/-
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব) ৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর) ৬৩/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট) ৬৫/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর) ৫৫/-

তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৬১/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৪৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কি রহস্য, নেকড়ের গুহা)
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৬১/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৫৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৫৩/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুটকি শত্রু) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুটকি গোয়েন্দা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭২ (ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭৪ (কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউনভিলে গণ্ডগোল) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৭৫ (কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা) ৫০/-
তি. গো. ভ. ৭৮ (চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৯ (লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাটি+তুষার মানব)
তি. গো. ভ. ৮০ (মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি)
তি. গো. ভ. ৮১ (কালোপর্দার অন্তরালে+ভয়াল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৮২ (বনদস্যুর কবলে+গাড়ি চোর+পুতুল-রহস্য) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৩ (খনিতে বিপদ!+গুহা-রহস্য+কিশোরের নোটবুক) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৪ (মৃত্যুগুহায় বন্দি+বিষাক্ত ছোবল+শুটকি রাজকুমার) ৪১/-

চিতা নিরুদ্দেশ

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৯৪

এয়ারপোর্ট থেকেই ট্যাক্সি নিল কিশোররা। আবার ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে এসেছে ওরা। তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ান।

পেছনের সীটে নড়েচড়ে বসল জিনা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'কথা বললেই তো আবার বলবে বাচাল। কিন্তু না বলেও পারছি না। আজকে যে আমার কি হলো। আসলে এত খুশি লাগছে কিছুতেই চুপ থাকতে পারছি না। পুরো পনেরো দিন কাটাব বিগ হোলোতে। এ কি যা তা কথা। এতদিন আর কখনও থাকিনি টকারদের বাড়িতে। ওদের লাইটহাউসটা দেখার আমার অনেক দিনের শখ। এবার পারব। ছুটিটা দারুণ কাটবে আমাদের, তাই না? কারণ আংকেলের চিঠিটা পেয়ে তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি তিনি আমাদের দাওয়াত করেছেন। টকারই চাপাচাপি করে এটা করিয়েছে, বুঝলে। ইস্, এত আস্তে চলছে কেন গাড়িটা!'

যেন তার কথার সমর্থন জানাতেই 'ঘাউ' করে উঠল পাশে বসা রাফি। মাথা দোলাল।

'কুত্তাটাও বাচাল হয়ে গেছে আজকে,' মুচকি হেসে বলল কিশোর।

অন্য কেউ এমন করে বললে মুহূর্তে রেগে উঠত জিনা। কিন্তু কিশোরের কথায় রাগ করে না। হাসল কেবল।

'এটাই ভাল,' জিনার পক্ষ নিল মুসা, 'বাচাল হওয়া। ছুটিতে এসেছি, চুপ করে থাকব নাকি? তোমার মত সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকব?'

'গম্ভীর হয়ে আছে কি আর সাধে?' ফোড়ন কাটল রবিন। 'ও এখন প্রকৃতি দেখছে। প্রকৃতি প্রেমিক।'

'দেখছে দেখুক, কে মানা করে? আমাদের কথায় বাধা না দিলেই হলো। এই রবিন, তোমার কি মনে হয়? টকারই তার বাবাকে রাজি করিয়েছে?'

রবিনের আগেই জিনা বলে উঠল, 'নিশ্চয়। একা একা বাড়িতে থাকতে কত আর ভাল লাগে। আহা, বেচারার মা নেই। বাবা থেকেও নেই। খালি আছেন বই আর গবেষণা নিয়ে। একটা মাত্র ছেলে। তার দিকেও নজর দেয়ার সময় নেই।'

'টকারকে আমার খুব ভাল লাগে,' মুসা বলল। প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে এখানে পথ। একপাশে পাহাড়ের দেয়াল। একটা মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে রাফির দিকে ফিরল সে। 'তোর দোস্তকে আবার দেখতে পাবি, রাফি। নটিকে।'

'ঘাউ,' করে আবার মাথা দোলাল রাফি।

লিটল হোলো গ্রাম পেরিয়ে এল গাড়ি। নতুন একটা নির্দেশক দেখা গেল। চিড়িয়াখানার দিকে নির্দেশ করছে। আগের বার যখন এসেছিল কিশোররা, এটা

দেখেনি।

বিগ হোলোতে ঢুকল গাড়ি।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল জিনা, 'ওই যে টকার! গেটের কাছে। নিশ্চয় আমাদের অপেক্ষা করছে।'

'বানরটা কাঁধেই আছে,' রবিন বলল।

'থাকবেই তো। ও কি কাছছাড়া করে নাকি?'

'না করে না,' মুসা বলল। 'তুমি যেমন রাফিকে করতে চাও না।'

গাড়ি দেখেই দরজা খুলে বেরোল টকার। প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। চিৎকার করে বলল, 'এত দেরি যে? সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা সব ভাল তো?'

ট্যাক্সি থেকে নেমে তার সঙ্গে হাত মেলাল সবাই। অদ্ভুত কাণ্ড করল বানরটা। রাফির সঙ্গে হাত মেলাল। ট্যাক্সি বিদেয় করে দিয়ে যার যার ব্যাগ-স্যুটকেস হাতে তুলে নিল ওরা। অনর্গল কথা বলছে টকার। অনেক কথা জমা হয়ে আছে পেটে। একবারেই সব উগড়ে দিতে চায়।

বলল, 'চমকে দেয়ার মত একটা জিনিস আছে,' চোখে তার মিটিমিটি হাসি।

থমকে দাঁড়াল মুসা, 'কি জিনিস?'

'অত অস্থির কেন? ঢোকোই না আগে গেটের ভেতরে।'

ভারি গেটটা ফাঁক হয়েই আছে। সবাই ঢোকার পর সেটা লাগিয়ে দিল টকার। এদিক ওদিক ঘুরতে থাকল গোয়েন্দাদের কৌতূহলী চোখ। কি এমন জিনিস, যেটা দেখলে চমকে যাবে ওরা?

সবার আগে দেখতে পেল রবিন। অস্ফুট শব্দ করে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা চাপা গর্জন। বিরাট বড় একটা জানোয়ার বেড়ালের মত লাফিয়ে এসে পড়ল বাগানের রাস্তায়।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এ কি!'

'বলেছিলাম না চমকে যাবে,' হাসতে হাসতে বলল টকার। বন্ধুদের অবাক হওয়া চোখের দিকে তাকাল একে একে। তারপর বলল, 'ভয় নেই। টারকজ কামড়াবে না তোমাদের। পোষা। আব্বার এক বন্ধু আছেন, শিকারী। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোরও তাঁর খুব নেশা। আফ্রিকায় সাফারিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই একটা মরা বাঘিনীর পাশে মিউ মিউ করছিল চিতার বাচ্চাটা। তুলে নিয়ে এসে পেলেপুষে বড় করেছেন। আবার চলে গেছেন দক্ষিণ আমেরিকায়। অনেক দিন থাকবেন। টারকজকে উপহার দিয়ে গেছেন আমাদের। খুব ভাল পাহারা দিতে পারে সে। কুকুরের চেয়ে কম না। এই টারকজ, আয়, এদিকে আয়।'

জিনার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে রাফিয়ান। সবার চোখ জানোয়ারটার দিকে। চিতাবাঘের মত হলদে চামড়া, তাতে কালো কালো ফুটকি।

'চিতাবাঘ অর্থাৎ লেপার্ড নয় এটা, চিতা,' সঙ্গীদের বুঝিয়ে বলল রবিন। 'দেখতে বেড়ালের মত হলে হবে কি, ও আসলে কুকুর গোষ্ঠীর প্রাণী। ফলে স্বভাবতই কুকুরের মত আচরণ করে।'

'কারও ক্ষতি করে না ও,' টকার বলল। 'কেউ ওর সঙ্গে লাগতে না এলে কিংবা চুরি করতে বাড়িতে না ঢুকলে ও কাউকে কিছু বলে না। রাফি, কি বলিস? তোর পছন্দ হয়েছে? ভয়ের কিছু নেই, বোকা ছেলে।'

খুব অবাক হয়েছে রাফি। সন্দিহান চোখে দেখছে চিতাটাকে। কিন্তু নটি যখন নির্ভয়ে গিয়ে জানোয়ারটার কাঁধে চড়ে বসল, ওটাও তাকে কিছু করল না, তখন সাহস পেল। কয়েক পা এগিয়ে গেল। টারকজও তার দিকে এগোল কয়েক কদম। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত যেন টান টান হয়ে রইল উত্তেজনা। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। তারপর ঠিক একই সময়ে দুজনে দুজনের দিকে গলা বাড়িয়ে শুঁকতে শুরু করল।

'ঘাউ!' আন্তরিক ভঙ্গিতে প্রথম কথা বলল রাফি।

ঘরঘর আওয়াজ বেরোল টারকজের গলা থেকে।

নটি বুঝল কুকুরটার সঙ্গে চিতাটার ভাব হয়ে গেছে। টারকজের পিঠ থেকে এক লাফে মাটিতে নেমে মানুষের মত করে হাততালি দিল। আনন্দে ডিগবাজি খেলো কয়েকবার।

হাসিতে ফেটে পড়ল জিনা। সবাই যোগ দিল তার সঙ্গে। টারকজকে আর সামান্যতম ভয় পাচ্ছে না কেউ।

বাগানে হট্টগোল শুনে রান্নাঘর থেকে বেরোল প্রফেসর কারসওয়েলের হাউসকীপার ডোরা। মোটাসোটা, খাটো, মাঝবয়েসী মহিলা একসময় সুন্দরী ছিল বোঝা যায়। টকারকে খুব ভালবাসে। তিন গোয়েন্দা আর জিনাকে দেখে হেসে বলল, 'ও মা, এসে গেছ! এসো এসো। কেমন আছ?'

'ভাল,' জানাল গোয়েন্দারা।

'টারকজ তোমাদের ভয় দেখিয়েছে? ভয়ের কিছু নেই। ও খুব ভাল মানুষ। থাকলেই বুঝবে। বেড়াল ছানার মতই গায়ে গা ঘষতে আসে।'

আরও কয়েকটা সাধারণ কথার পর 'নাস্তা রেডি' এই খবরটা দিল ডোরা। কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে আসার কথা বলে আবার চলে গেল ঘরের দিকে।

বন্ধুদেরকে বাবার ঘরে নিয়ে এল টকার।

গভীর মনযোগে কাজ করছেন প্রফেসর। কোন দিকে খেয়াল নেই।

'আব্বা, ওরা এসেছে,' টকার বলল।

'কারা? আমি তো কাউকে আসতে বলিনি,' মুখ ফেরালেন না বিজ্ঞানী।

'নিশ্চয় বলেছ। লিখিত ভাবে বলেছ। একেবারে চিঠি লিখে। ভুলে গেছ? জিনা আর কিশোরদেরকে আসতে বলোনি তুমি?'

কিশোর বলল, 'গুড মরনিং, আংকেল।'

এতক্ষণে মুখ ফেরালেন কারসওয়েল। 'আরি, কিশোর যে! জিনা তুমিও আছ! তোমার আব্বা কেমন আছে? নতুন আর কিছু আবিষ্কার করতে পারল? ওকে গিয়ে বলো, এসে যেন দেখা করে আমার সঙ্গে...'

জিনা জবাব দেবার আগেই টকার বলল, 'এমন ভঙ্গিতে বলছ, যেন পাশের

গাঁয়েই থাকেন পারকার আংকেল। তিনি তো আছেন আমেরিকায়...'

'তাই তো, তাই তো,' আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন প্রফেসর। আবার কাজে মন দিলেন তিনি।

'ওরা এখানে থাকতে এসেছে, আব্বা। চিঠি লিখে তুমিই আসতে বলেছ। পনেরো দিন থাকবে। তুমি সব ভুলে বসে আছ।'

'থাকবে, তাই না? তা থাকুক না। আমাকে বিরক্ত না করলেই হলো। এক মাস থাকুক, দুই মাস থাকুক, যত দিন খুশি থাকুক।...তুই জানালার সামনে দাঁড়ালি কেন? কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। কুত্তাটাকে সরা। চিতাটা গেল কোথায়? বল না, এসে এটাকে তাড়িয়ে দিক। কুত্তার গায়ে উকুন থাকে।...খালি এসে বিরক্ত করিস! কোন কাজ করতি দিস না!...'

'ওকে কুত্তা বলছ কেন আব্বা? ও তো আমাদের রাফি, জিনার কুকুর...'

'ও তাই নাকি? তা ঠিক আছে, তাড়াতে হবে না। কিন্তু রাফি হলেও কুকুর তো, উকুন থাকবেই...যা খেলতে যা। আমাকে কাজ করতে দে।' আবার দিন-দুনিয়া ভুলে গেলেন প্রফেসর।

তাঁকে আর বিরক্ত করল না ওরা। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। পেছনে দরজাটা ভেজিয়ে দিল কিশোর।

দুই

বেরিয়েই ফুঁসে উঠল জিনা, 'বিজ্ঞানীগুলোর মাথায় দোষ থাকে! এই যে আমার আব্বাটাকে দেখো না। কি করে আর না করে। কি যে বলে তাই জানে না। ইস্, দুনিয়ায় কারও বাপ যেন আর বিজ্ঞানী না হয়!'

কেন খেপেছে জিনা, বুঝতে পারছে তিন গোয়েন্দা। রাফির গায়ে উকুন আছে বলাতে রেগেছে।

রবিন বলল, 'কিন্তু তাঁদের মত ভাল মানুষ কজন আছে? একটু খামখেয়ালি এই যা...'

'ওটাই তো আমার সহ্য হয় না। কেউ কথা বলতে গেলে যদি পাত্তা না দেয় ভাল লাগে?'

তা লাগে না। তবে বিজ্ঞানীদের ওই 'কেউ'এর দলে না ফেলার জন্যে জিনাকে অনুরোধ করল মুসা। জিনার রাগ ভাঙাতে বেশিক্ষণ লাগল না ওদের। আবার হাসিখুশি হয়ে উঠল সে।

বাগানে খেলছে চিতা আর বানরটা। টকার বলল, 'টারকজকে সবাই ভালবাসে। ডোরা বাসে, আমি বাসি, নটি বাসে। এমন কি আব্বারও মাঝেসাঝে মনে পড়ে যায় ওর কথা।'

নাস্তায় বসার আগে টারকজ আর নটিকেও ডেকে আনা হলো।

চমৎকার একটা দিন কাটল গোয়েন্দাদের। সারাদিন বাগানে, লনে ছুটাছুটি করে খেলে বেড়াল তিনটে জানোয়ার। খুব ভাব হয়ে গেছে তিনটেতে।

সন্ধ্যায় ডোরার হাতের দারুণ সুস্বাদু রান্না খেয়ে সকাল সকাল শুতে গেল ছেলেমেয়েরা। দিনটা কেটেছে উত্তেজনার মাঝে। ক্লান্তও হয়েছে ওরা। তাই শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

জিনার বিছানার নিচে কার্পেটে শুয়েছে রাফি। মাঝরাতে তার গরগর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল জিনার। 'কি হয়েছে রাফি?' জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল সে। কানে এল অদ্ভুত শব্দ। বাইরের বাগানে পা টিপে টিপে হেঁটে বেড়াচ্ছে কে যেন।

'নিশ্চয় টারকজ,' ভাবল জিনা। 'বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।' কিন্তু তবু কেন যেন খচখচ করতে থাকল মনের ভেতর। শেষে আর বিছানায় থাকতে পারল না। উঠে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে।

প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না। বাইরের আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে দেখল নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে একটা ছায়া···না না, দুটো ছায়া। কি যেন একটা ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। তারপর চাপা একটা আওয়াজ, গলা টিপে ধরলে শ্বাস নিতে গেলে যেমন হাঁসফাঁস শব্দ হয় তেমনি। ঠিক এই সময় জোরে বাতাস বইতে শুরু করল। দুলে উঠল গাছের ডাল, পাতা। কান পেতে থেকেও আর কিছু শুনতে পেল না জিনা। আরও খানিকক্ষণ অন্ধকারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও কিছু দেখতে না পেয়ে আবার এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। কিন্তু ব্যাপারটা মন থেকে তাড়াতে পারল না। বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। এক ঘুমে পার করে দিল বাকি রাতটা।

পরদিন সকালে ঝরঝরে শরীর মন নিয়ে ঘুম ভাঙল তার। রাতের ব্যাপারটা এখন কল্পনা বলে মনে হলো। হাতমুখ ধুয়ে খাবার ঘরে এসে দেখল ছেলেরা সব নাস্তার টেবিলে বসে আছে। কিশোর বাদে বাকি তিনজনেই উত্তেজিত। কিশোর গম্ভীর। কিছু ভাবছে।

টকার জানাল জিনাকে, কাল রাতে গায়েব হয়ে গেছে টারকজ।

মুসা হেসে বলল, 'রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেছে আমাদের কিশোর মিয়া।'

টকার বলল, 'ডোরা বলেছে, চিতাটা নাকি বাগানে নেই। নাস্তার জন্যে ডেকে ডেকে সারা হয়েছে, জবাবই দেয়নি টারকজ। অথচ অন্য দিন একবার ডাকলেই চলে আসে। সমস্ত বাগান গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে এসেছে ডোরা। চিহ্নই নেই চিতাটার।'

'সে জন্যেই আমি বলছি বাগানে গিয়ে খুঁজে দেখার কথা,' কিশোর বলল। 'কোন সূত্র পেয়ে যেতেও পারি।'

রবিন বলল, 'সূত্র আর কি? ওটা নটির চেয়ে কম দুষ্টু না। কাল তো দেখলামই কি কাণ্ডটা করল। শিওর বাগানের বাইরের ঝোপ বা গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে আছে। বরং ওখানে গিয়ে খোঁজা উচিত।'

প্রফেসর কারসওয়েল রয়েছেন তাঁর স্টাডিতে, কাজ করছেন। তিন গোয়েন্দা ভেবে অবাক হয়, আদৌ তিনি ঘুমান কিনা। মাঝে মাঝে দিনের পর দিন ওঘর থেকে বেরোনই না তিনি। কাউকে ঢুকতে দেন না। নিতান্ত অসময়ে ডোরাকে ডেকে খাবার দিতে বলেন। ট্রেতে করে খাবার দিয়ে আসে ডোরা। ওঘরে একটা ক্যাম্প

বেড আছে। কয়েক ঘণ্টা ওটাতেই শুয়ে ঘুমিয়ে নেন প্রফেসর। সর্বক্ষণ ডুবে থাকেন জরুরী গবেষণায়।

টারকজকে খুঁজতে বেরোতে তৈরি হলো সবাই। কিশোর বলল, 'আগে ডোরাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে নিই। তারপর বেরোব।'

রান্নাঘরে পাওয়া গেল হাউসকীপারকে। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কি আর বলব, আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। কাল রাতে বাগানেই খাবার দিয়ে এসেছি ওকে। তখনও ছিল। আজ সকালে দেখি নেই। বাগানের চারপাশে শক্ত বেড়া দেখেছই তো। ওই বেড়া ভাঙতে পারবে না টারকজ। এত উঁচু, ডিঙোতেও পারবে না। চিতাটাকে খুব ভালবাসেন প্রফেসর সাহেব। শুনলে রেগে যাবেন।'

'এক্ষুণি বলার দরকারও নেই,' কিশোর বলল। 'আমরা খুঁজতে বেরোচ্ছি। ভাববেন না। ধরে নিয়ে আসব।'

মাথা নেড়ে ডোরা বলল, 'আমার মন বলছে এত সহজে পাবে না ওকে। সিরিয়াস কিছু হয়েছে ওর। নইলে এভাবে বাতাসে মিলিয়ে যেত না।'

বিশাল বাগানে তন্ন তন্ন করে খুঁজল সবাই মিলে। তাদের সঙ্গে রাফি আর নটিও রয়েছে। কোন লাভ হলো না। চিতাটাকে তো পাওয়া গেলই না, তার কোন চিহ্নও রেখে যায়নি। কোন সূত্র নেই। কি ঘটেছে বোঝা গেল না।

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল কিশোর। ভুরু কোঁচকাল। জিনার দিকে তাকাল, 'জিনা, তুমি না বললে কাল রাতে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'শুনেছি। দুটো ছায়ামূর্তিও দেখেছি।' নাস্তা খাওয়ার সময় সব বলেছে, এখন আরেকবার গল্পটা বলল সে।

'আমার কি মনে হয় জানো?' বন্ধুদের মুখের দিকে এক এক করে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'টারকজকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কোন ভাবে গেটের চাবি জোগাড় করেছে কেউ। কাল রাতে তালা খুলে ঢুকে ধরে নিয়ে গেছে চিতাটাকে।'

'কিন্তু কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'একটা চিতাকে কিডন্যাপ করতে আসবে কেন কেউ?'

'আমি বুঝতে পারছি,' বলে উঠল মুসা। 'ব্যাটারা চোর। এ বাড়িতে চুরি করতে চায়। টারকজ থাকলে সেটা করতে পারবে না। তাই তাকে আগে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমার মনে হয় আজ রাতে আবার আসবে ওরা, আসল কাজটা সারতে।'

মাথা নাড়ল জিনা, 'আমার তা মনে হয় না। চুরি করার ইচ্ছে থাকলে কাল রাতেই করতে পারত। টারকজ কোন গোলমাল করেনি। সহজেই সেরে ফেলতে পারত ওরা।'

'আশ্চর্য! টারকজ তো চুপ থাকার বান্দা নয়। কিছু করল না কেন?'

'করার সামর্থ্যই হয়তো ছিল না,' জবাব দিল কিশোর। 'ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তাকে।'

'কিংবা বিষ!' মুসা বলল।

'সর্বনাশ!' শিউরে উঠল টকার।

'দাঁড়াও,' তার কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল জিনা, 'এখনই এত ভয় পেও না। এগুলো তো সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। হয়তো দেখা যাবে সবই আমাদের বেশি বেশি কল্পনা। কোন ঝোপের মধ্যেই ওকে পেয়ে যাব।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'বিষ খাওয়ালে লাশটা সরাতে যেত না চোরেরা। বাগানেই মরে পড়ে থাকত ওটা।'

'চিতার চামড়া খুব দামী, আমি শুনেছি,' আশ্বস্ত হতে পারল না টকার। 'ওই চামড়া দিয়ে চেয়ার কিংবা সোফার গদি হয়। কার্পেটও বানানো যায়।'

'না,' জোর দিয়ে বলল কিশোর, 'বিষ ওকে খাওয়ানো হয়নি। ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই এসেছিল ওরা। নিয়ে গেছে। ব্যস।'

'কিন্তু কেন?' আবার একই প্রশ্ন করল রবিন।

'সেটাই জানতে হবে। তদন্ত করে বের করব।'

খবর শুনে টকারের মতই ঘাবড়ে গেলেন তার আব্বাও। কিন্তু সেটা সামান্য সময়ের জন্যে। বললেন, 'একটা কিছু করতেই হয়। তবে আজ তো পারছি না। এই কাজটা না সারলেই নয়। যা করার কাল করব।'

টকার বলল, 'আব্বা, কাল দেরি হয়ে যাবে। আজই কিছু একটা করো।'

'কিছু করার আগে আজকের দিনটা অন্তত দেখা দরকার। হয়তো গেছে কোথাও, খিদে পেলেই ফিরে আসবে। আজ রাতের মধ্যে না ফিরলে কাল পুলিশকে খবর দেব...'

জরুরী গবেষণায় ডুবে গেলেন আবার প্রফেসর। ঘরে যে লোক আছে ভুলেই গেলেন।

কিন্তু পরদিন সকালেও ফিরে এল না টারকজ। বরং নতুন আরেকটা ঘটনা ঘটল।

তিন

রোজই সকালে ডাকবাক্স খোলে ডোরা। সেদিনও খুলল। প্রফেসর কারসওয়েলের নামে একটা চিঠি পেল। চিঠি আরও আছে। প্রচুর চিঠিপত্র আসে বিজ্ঞানীর নামে। কিন্তু এই বিশেষ চিঠিটা সে সব সাধারণ চিঠি নয়। ডাকে আসেনি। খামে ভরে কেউ ফেলে দিয়ে গেছে। তাতে ডাকঘরের ছাপ নেই, টিকিট নেই।

খামটা দেখেই ভুরু কোঁচকাল ডোরা। অতি সাধারণ কাগজ, দোমড়ানো, ময়লা। তার ওপরে ক্যাপিটাল লেটারে প্রফেসর কারসওয়েলের নাম। হাতের লেখা খুব খারাপ।

প্রফেসরের কাছে খামটা নিয়ে গেল ডোরা। আনমনে সেটা হাতে নিয়ে ছিঁড়লেন তিনি। কিন্তু চিঠিতে চোখ বুলিয়েই খেপে গেলেন। চিৎকার দিয়ে বললেন, 'এত্ত বড় সাহস! আমাকে হুমকি দিয়ে চিঠি লেখে! আমাকে!'

চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে ঘরে ঢুকল ছেলেমেয়েরা। প্রফেসরকে শান্ত করার

চেষ্টা করছে ডোরা। কিন্তু তিনি কানই দিচ্ছেন না। রাগে হাত ছুঁড়ছেন। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করল টকার।

'কি হয়েছে?' আরেকবার চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। চিঠিটা ধরলেন ছেলের নাকের কাছে। 'টারকজকে কিডন্যাপ করেছে ওরা! হুমকি দিয়ে চিঠি লিখেছে আমাকে!'

ঝট করে কিশোরের দিকে ঘুরে গেল চার জোড়া চোখ, মুসা, রবিন, জিনা ও টকারের। ঠিকই অনুমান করেছিল গোয়েন্দাপ্রধান।

'নিশ্চয় অনেক টাকা চায়?' জানতে চাইল জিনা।

'টাকা না, টাকা না। তাহলে তো দিয়েই দিতাম। ওরা চায় অন্য জিনিস। নতুন একটা ফুয়েলের ফরমুলা আবিষ্কার করেছি আমি। ওটাই দিতে হবে ওদেরকে। না দিলে…' দু-হাতে মাথা চেপে ধরলেন প্রফেসর।

'কি করবে?' শঙ্কা ফুটেছে টকারের চোখে।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। 'না খাইয়ে রাখবে টারকজকে। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে যাবে বেচারা, আবার বুনো হয়ে উঠবে। তখন ছেড়ে দেবে ওকে। গাঁয়ে তখন কি রকম আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবে ও কল্পনা করতে পারো? সোজা গিয়ে চড়াও হবে ফার্মের পোষা জানোয়ারের ওপর, ছাগল-ভেড়া মেরে একশেষ করবে। আর যেহেতু ওটা আমার পোষা চিতা ছিল, সব দোষ সব দায়-দায়িত্ব এসে পড়বে আমার ঘাড়ে। সমস্ত কিছুর ক্ষতি পূরণ আমাকে দিতে হবে। তা-ও না হয় দেয়া গেল, যদি সময় মত এসে আমাকে জানায়। কিন্তু যদি না জানায়? বিরক্ত হয়ে, রেগে গিয়ে যদি চিতাটাকে গুলি করে মেরে ফেলে লোকে?'

আঁতকে গেল টকার, 'গুলি করবে! টারকজকে! না না, সেটা কিছুতেই হতে দিতে পারি না আমরা!'

'না, পারি না!' সমর্থন করল মুসা।

'ভাবার জন্যে দুদিন সময় দিয়েছে আমাকে ওরা,' প্রফেসর বললেন। 'ইতিমধ্যে আমাকে আরেকটা চিঠি দেবে। কোথায় কিভাবে ফরমুলাটা পৌঁছে দিতে হবে সেটা জানিয়ে। ওটা দিলেই টারকজকে ফিরিয়ে দেবে ওরা।'

'নিশ্চয় দেবেন না আপনি?' জিজ্ঞাসু চোখে কারসওয়েলের দিকে তাকাল জিনা।

'জানি না। একটা সাংঘাতিক সমস্যায় ফেলে দিল। ডিসাইড করা কঠিন। না দিলে চিতাটাকে দিয়ে গাঁয়ের ক্ষতি করাবে ওরা। শেষমেষ মারা পড়বে জানোয়ারটা। আবার দিয়ে দিলে গেল এত পরিশ্রমে করা এত দামী একটা ফরমুলা। কষ্টটা করলাম আমি, মজাটা মারবে ওরা।'

'কিন্তু আংকেল, টারকজকে বাঁচানোর একটা উপায় করতেই হবে। কতগুলো শয়তান লোকের লোভের জন্যে ওরকম সুন্দর একটা জানোয়ার মারা পড়বে, ভাবতেই পারি না। কিছু একটা করা দরকার!'

সেদিন সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে বসার আগে আর প্রফেসরের দেখা পেল না

গোয়েন্দারা। সারাটা দিন ব্যস্ত রইল ওরাও। পুরো বাগানটায় গরুখোঁজা করে খুঁজল। কিন্তু সামান্যতম সূত্র পেল না যা দিয়ে টারকজকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারে।

ওদেরকে আন্তরিক সাহায্য করল রাফি। কিডন্যাপারদের গন্ধ খুঁজে বের করল তার অসাধারণ তীক্ষ্ণ নাক। কিন্তু বাগানের ভেতরে কেবল পাওয়া গেল সেই গন্ধ। গেটের বাইরে বেরোলেই আর কিছু নেই। হারিয়ে যায়।

'খুব কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল টারকজকে,' অনুমানে বলল জিনা। 'তাকে ঘুম পাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। সে জন্যেই গেটের বাইরে বেরিয়ে আর গন্ধ পায় না রাফি।'

ছোট্ট নটিও তার বন্ধুকে খুঁজে বের করার জন্যে যতটা সাহায্য করা সম্ভব করল, কিন্তু সে-ও কিছু বের করতে পারল না।

রাতের খাওয়ার সময় ওদেরকে জানালেন প্রফেসর, তিনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

'অনেক ভেবে দেখলাম, ফরমুলাটা ওদেরকে দেয়া একদম উচিত হবে না। টারকজের বিনিময়েও নয়। সরি, টকার, এছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। জিনিসটাতে আমার কোন ব্যাক্তিগত আগ্রহ নেই। এটা থেকে টাকা আয় করব না। যদিও ইচ্ছে করলে বিক্রি করে দিয়ে অনেক টাকা কামাতে পারি। কিন্তু সেটা করব না। ফরমুলাটা আমি দান করে দেব সরকারকে। আমার দেশের উপকার হবে, সারা দুনিয়ার মানুষের উপকার হবে। এরকম একটা জিনিস কতগুলো শয়তান লোকের হাতে পড়তে দিতে পারি না আমি।'

চোখ মিটমিট করতে লাগল টকার। পানি ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তিন গোয়েন্দা আর জিনাও চোখ নামিয়ে রেখেছে। এক প্লেট পটেটো চিপস টেবিলে নামিয়ে রেখে অ্যাপ্রনের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল ডোরা। সবাই বুঝতে পারছে প্রফেসর যা করতে যাচ্ছেন সেটাই ঠিক, কিন্তু চিতাটার পরিণতিও মেনে নিতে পারছে না। বেচারার জন্যে ভীষণ দুঃখ হচ্ছে ওদের।

চুপচাপ খেতে লাগল সবাই। কারও মুখে কথা নেই। খাওয়ার পর ওদেরকে ল্যাবরেটরিতে ডেকে নিয়ে গেলেন প্রফেসর। বললেন, 'এই জায়গায় বসে আমি আবিষ্কার করেছি ফরমুলাটা। অসাধারণ একটা আবিষ্কার বলতে পারো এটাকে। এরকম একটা জিনিস কারও একা ভোগ করার অধিকার নেই। চোরগুলোকে দিয়ে দিলে সেই কাজই করবে ওরা। এটা খাটিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করবে। কারও কোন উপকারে লাগবে না সেই টাকা, কেবল নিজেদের পকেট ভারি করবে। জেনেশুনে কি করে সেটা করতে দিই বলো?'

'বুঝতে পারছি আপনার উদ্দেশ্য,' জিনা বলল। 'মানবজাতির কল্যাণে একটা চিতার জীবন উৎসর্গ করতে চাইছেন।'

'ঠিক। একেবারে গুছিয়ে বলেছ কথাগুলো।'

এতক্ষণে মুখ খুলল কিশোর, 'চোরগুলো আপনার নরম মনটার ওপর ভরসা করেছিল। ভেবেছিল, চিতাটাকে সাংঘাতিক ভালবাসেন আপনি। ওটার বিনিময়ে

যা চায় তাই দিয়ে দেবেন। ভুল করেছে।'

'ওরা আরও ভেবেছিল, টকারের মুখ চেয়ে হলেও আমি চিতাটার বিনিময়ে ওদেরকে ফরমুলাটা দিয়ে দেব। আমার মা-মরা একমাত্র ছেলেকে অসুখী করতে চাইব না।'

মাথা উঁচু করে দাঁড়াল টকার। 'কিছুতেই না। আব্বা, চোরগুলোর কাছে কিছুতেই মাথা নোয়াতে যেও না তুমি। দেশের চেয়ে, দুনিয়ার মানুষের চেয়ে একটা চিতা কখনই বড় হতে পারে না আমার কাছে।'

'চিতাটার জন্যে তোর চেয়ে কম দুঃখ হচ্ছে না আমার, টকার।'

'আমি বুঝতে পারছি। টাকা চাইলে, যত টাকাই হোক ওদেরকে দিয়ে দিতে তুমি, আমি জানি।'

কালো একটা মেঘ কেটে গেল যেন প্রফেসরের মুখ থেকে।

ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

ইঞ্জিনের ব্যাপারে খুব আগ্রহ মুসার। জিজ্ঞেস করল, 'আংকেল, ফরমুলাটার বিশেষত্ব কি?'

'সাধারণ পেট্রলে একটা মোটর গাড়ি যতটা চলে এই তেলে চলবে তার চেয়ে পাঁচ—ছয় গুণ বেশি…'

'খাইছে! এই অবস্থা!'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর।

'সরকারকে জানিয়েছেন?'

'না। শেষবারের মত পরীক্ষা করছি। কোথাও কোন ত্রুটি রয়ে গেল কিনা দেখছি। ওই চোরগুলো কি করে জেনে গেল বুঝতে পারছি না…যাক, যা হওয়ার হয়েছে। তোমরা এখন যাও। আমি কাজ করব। চোরগুলোকেও একটা চিঠি লিখব, ওদের প্রস্তাবে আমি রাজি নই।'

'আব্বা,' প্রায় ককিয়ে উঠল টকার, টারকজের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না, 'আরেকটু অপেক্ষা করে দেখি না আমরা, ওরা কি করে? পুলিশকে জানাচ্ছ না কেন? ওরা চেষ্টা করলে হয়তো টারকজকে খুঁজে বের করতে পারবে।'

'সময় নেই, টকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফরমুলাটা শেষ করতে হবে এখন আমাকে। হুমকি যখন এসেছে আর দেরি করার উপায় নেই আমার। আমি রাজি নই জানলে ওরা এসে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। তার আগেই আমি এটা জায়গামত পৌঁছে দিতে চাই। পুলিশকে খবর দিলে সময় নষ্ট হবে আমার।'

কিন্তু তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হতে পারল না ছেলেমেয়েরা।

'বুঝতে পারছ না তোমরা।' বুঝিয়ে বললেন প্রফেসর, 'ওরা এলেই প্রশ্ন শুরু করবে আমাকে। প্রচুর মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। চোরগুলোও জেনে যাবে পুলিশ তদন্ত করছে। তখন ওরা আর চুপ থাকবে না, যেভাবেই হোক ফরমুলাটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে আমার কাছ থেকে।…নাহ্, তোমরা যাই বলো, পুলিশকে এখন জানাতে আমি পারব না। যেটা ঠিক করেছি সেটাই করব। এবং সেটা করাই

নিরাপদ। যাও, তোমরা এখন যাও।'

তারপরেও বেরোতে চাইল না জিনা। মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয়, টারকজ সত্যিই মানুষের ক্ষতি করবে?'

'না, সরাসরি তা করবে না। হামলা চালাবে গরু আর ছাগল-ভেড়ার ওপর। মানুষের কোন ভয় নেই।'

'চোরগুলো যা বলেছে তা কি সত্যিই করবে বলে মনে হয় আপনার?'

'করবে। কারণ, এটা অনেক টাকার ব্যাপার। হাতছাড়া হয়ে গেলে সাংঘাতিক খেপে যাবে ওরা। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেও তখন টারকজকে বুনো বানিয়ে ছেড়ে দেবে। মোট কথা, চিতাটাকে শেষ করবেই ওরা।'

মুখ কালো করে ল্যাবরেটরি থেকে বেরোল ছেলেমেয়েরা। বাইরে এখনও দিনের আলো রয়েছে সামান্য, পুরোপুরি নেভেনি। বিশাল বাগানে এত গাছপালা আর ফুল, কিন্তু একেবারেই শূন্য মনে হলো টকারের কাছে। বাগানের পথে পথে টহল দিতে দেখা গেল না চিতাটাকে।

রাগ মাথা চাড়া দিতে শুরু করল তার মনে।

'কিছু একটা করতেই হবে আমাদের!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কিশোর, কত জনের জন্যেই তো কত কিছু করেছ তোমরা। টারকজের জন্যেও কিছু কোরো না। তোমাদের কাছে হাতজোড় করছি আমি।'

'হাতজোড়ের দরকার নেই। তুমি না বললেও সেটা করতাম। কি করে করব সেটা নিয়েই ভাবছি। পুলিশকে যখন খবর দিতে চান না আংকেল, আমাদেরই যা করার করতে হবে। এত সহজে ছেড়ে দেব শয়তানগুলোকে ভেবেছ?'

আশা বাড়ল টকারের। কিশোর পাশার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। চকচক করে উঠল চোখ। 'এমন ভাবে বলছ, যেন বেরই করে ফেলবে টারকজকে!'

'এখনও জোর করে কিছু বলতে পারছি না। তবে চেষ্টা তো করবই। পেয়েও যেতে পারি ওকে। এই এলাকা তো তোমার চেনা। তোমাকে নিয়ে বেরোব আমরা দল বেঁধে। গাঁয়ের সবখানে খুঁজে দেখব।'

'কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে তোমার?'

'শিওর না।'

'কাল ভোরে উঠেই তাহলে বেরিয়ে পড়ব, কি বলো?' রবিন বলল, 'তদন্ত যখন করবই ঠিক করেছি দেরি করার কোন মানে হয় না।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'তা তো হয়ই না। তবে কাল ভোরে নয়, তার অনেক আগে থেকেই আমাদের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এবং তার জন্যে এবাড়ির সীমানার বাইরেও যেতে হবে না আমাদের।'

কিশোরের এরকম রহস্য করে কথা বলার সঙ্গে অভ্যস্থ তার দুই সহকারী রবিন আর মুসা। প্রশ্ন করল না। কেবল তাকিয়ে রইল গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে।

চোখ মিটমিট করতে লাগল টকার।

জিনা বলল, 'বাগানে খোঁজার কথা বলছ তো? লাভটা কি? কোথাও কি বাকি রেখেছি নাকি? একটা ইঞ্চি বাকি রাখিনি।'

'তা রাখিনি,' স্বীকার করল কিশোর। 'কিন্তু ওভাবে আর খুঁজতে যাচ্ছি না আমরা। কিডন্যাপারদের তালাশেও যাচ্ছি না, ওরাই আমাদের কাছে আসবে।'

'আমাদের কাছে আসবে!' কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছে না টকার। 'কি বলছ তুমি, কিশোর? ওরা আমাদের কাছে আসতে যাবে কেন?'

'আসতে হবে ওদের। তোমার আব্বা কি বললেন ভুলে গেছ? আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দিয়েছেন তাঁকে কিডন্যাপাররা। ইতিমধ্যে তাঁকে জানাবে ওরা, কিভাবে কোথায় ফরমুলাটা পৌঁছে দিতে হবে।'

'তা তো মনেই আছে, ভুলিনি। কিন্তু...'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। এমন হতে পারে, আরেকটা চিঠি লিখেই সেসব কথা তাঁকে জানাবে ওরা। সেই চিঠি ডাকে না পাঠিয়ে আজকে যে ভাবে লেটার বক্সে ফেলে গেছে...'

'বুঝতে পেরেছি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'সেটা ফেলার জন্যে আজও আসতে পারে ওরা!'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে লুকিয়ে বসে...' জিনা বলল। কিন্তু তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না টকার। সে-ই শেষ করে দিল, 'লেটার বক্সের ওপর চোখ রাখলেই যে ফেলে যায় তাকে ধরতে পারব!'

'হয়তো।'

'তাহলে আর কি?' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুসার চোখ। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকব। চোরটা এলে আর কথা নেই...'

বাধা দিল কিশোর, 'এক সঙ্গে বসব না সবাই। লোক বেশি হয়ে গেলে চোরটার চোখে পড়ে যেতে পারি। তাছাড়া সারা রাত না ঘুমিয়ে থাকারও কোন অর্থ হয় না। অনেক লোক আছি আমরা। দুজন দুজন করে পালা করে পাহারা দিলেই চলবে।'

তার কথায় একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল অন্যেরা।

চার

সে রাতটা অনেক দীর্ঘ মনে হলো ওদের কাছে। প্রথমে পাহারা দিতে বসল রবিন আর জিনা। অবশ্যই সঙ্গে রইল রাফি। সে যেখানে ইচ্ছে ঘুমাতে পারে। ঝোপের মধ্যে শুয়েও ঘুমাতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

গেটের ধারে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে বসে পাহারা দিতে লাগল ওরা। একজনের চোখ রাস্তার দিকে, আরেকজনের লেটার বক্সের ওপর। রাফির কানে সব শব্দই ঢোকে, তাই বিশেষ কোন দিকে নজর রাখার তার দরকার নেই।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল। কিছুই ঘটল না। ওদের পালা শেষ। ঝোপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুসা আর কিশোরকে ডেকে তুলল দুজনে। এক ডাক দিতেই বিছানায় উঠে বসল কিশোর। কিন্তু মুসার ঘুম ভাঙাতে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে

ধাক্কাধাক্কি করতে হলো। চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল মুসা, 'উঁম্, কি হয়েছে!···চোরটা এল?'

'না। ওঠো।' কিশোর বলল, 'এবার আমাদের পালা।'

পা টিপে টিপে বাইরে বেরোল ওরা। প্রফেসর আর ডোরা যাতে না জেগে যায় সে জন্যে। জেগে গেলে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। ওরা যে তদন্ত শুরু করেছে, এটাও কারসওয়েলকে জানতে দিতে চায় না। অঘটন ঘটে যাওয়ার ভয়ে তাহলে ওদেরকে তদন্ত করতে দেবেন না।

'ওই ঝোপটাতে গিয়ে বসো তুমি,' ফিসফিস করে মুসাকে বলল কিশোর। 'রাফি, তুই আমার সঙ্গে আয়।' বলে গেটের ধারের একটা বড় গাছের দিকে এগোল সে। 'এলে ব্যাটাকে ধরতেই হবে, বুঝলি।'

গাছটার আড়ালে বসে সারতেও পারল না সে, লেটার বক্সের কাছে একটা ছায়া নড়তে দেখল। মনে হলো, উঠে আসছে বাক্সের ওপর দিকে। দম বন্ধ করে ফেলল কিশোর। ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। তবে ছায়াটাকে হাতের মত লাগল তার কাছে। ভাবল, দস্তানা পরা কোন হাত চিঠি ফেলতে এগোচ্ছে বাক্সের দিকে।

হঠাৎ চোখের পলকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রাফি। ঘেউ ঘেউ করে দৌড় দিল বাক্সের দিকে।

ঝোপে বসে অবাক হয়ে গেল মুসা। এই তো সবে বসেছে, এক্ষুণি কি হলো? কাঠ হয়ে বসে রইল সে। বেরোবে কি বেরোবে না বুঝতে পারছে না। কিশোরের গলা শোনা গেল না। তার নির্দেশ ছাড়া কিছু করতে গিয়ে বকা শুনতে চায় না।

আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। ভুল যা করার করে ফেলেছে কুকুরটা। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাফির পেছনে দৌড় দিল কিশোর। যদি চোরটাই হয়ে থাকে, সময় মত চেপে ধরতে হবে। মুসাকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। বুঝে ফেলেছে দস্তানা পরা হাত মনে করেছিল যেটাকে সেটা কি?

বেড়াল। সে জন্যেই আটকে রাখা যায়নি রাফিকে। অচেনা বেড়াল দেখলেই রেগে যায় কুকুরেরা, হুঁশ থাকে না, রাফিও তার ব্যতিক্রম নয়।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে রাফি। ভয়ে বাঁকা হয়ে গেছে বেড়ালটা। তবে লেজ তুলে পালানোর বান্দা নয়। তৈরি হয়ে আছে। কুকুরটা তাকে কামড়াতে এগোলে থাবা মেরে নাক চিরে দেবে।

রাফি করছে হউ, হউ। বেড়ালটাও সমান তালে ফুঁসছে।

ধমক দিয়ে ওগুলোকে থামানোর চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। কে শোনে কার কথা। গণ্ডগোলে ঘুম ভেঙে গেল কারসওয়েল আর ডোরার। জানালা খুলে মুখ বের করল দুজনেই। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করল।

কি আর করে? বানিয়ে বলতে হলো কিশোরকে, বেড়ালের গন্ধ পেয়ে রেগে গিয়ে তাড়া করেছে কুকুরটা। ভাগ্য ভাল, দুজনেই ঘুমের ঘোরে রয়েছে। একজনেরও মাথায় এল না জিজ্ঞেস করার কথা, এত রাতে বাগানে কি করছে কিশোর?

জানালা থেকে সরে গেল দুটো মুখই।

ধমক দিয়ে রাফিকে বেড়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনল কিশোর। বেড়ালটাও সুযোগ পেয়ে দুই লাফে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

আবার এসে গাছের আড়ালে বসল কিশোর। রাফিকে সাবধান করে দিল, আর যাতে কোন গোলমাল না করে। কিন্তু তাতেও লাভ হবে বলে মনে হলো না। চোরটা কাছাকাছি থেকে থাকলে নিশ্চয় বুঝে ফেলেছে লুকিয়ে বসে ওর জন্যে পাহারা দেয়া হচ্ছে। আর আসবে না।

যা ভেবেছে, তা-ই। অহেতুক বাকি সময়টা বসে থাকল ওরা। কয়েক ঘণ্টা পর বেরিয়ে এল টকার। এবার সে আর মুসা পাহারা দেবে। বেশিক্ষণ পাহারার ভার পড়েছে তার ওপর। তাতে মোটেও অখুশি নয় সে। বরং নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ লোক মনে করছে।

ভোর পর্যন্ত পাহারা দিল মুসা আর টকার। আলো ফোটা শুরু হতেই উঠে এসে ঘরে ঢুকল। সারা বাড়ি যখন জেগে উঠেছে তখনও ওরা ঘুমিয়েই রইল।

দেরি করেই সেদিন নাস্তা খেতে বসল ছেলেমেয়েরা।

সব শুনে রাফিকে বকাবকি শুরু করল জিনা। মন মরা হয়ে রইল বেচারা কুকুরটা। বেড়ালের মত মহাশত্রুকে মারতে গেছে, এতে তার দোষটা কোথায় বুঝতে পারছে না।

কিন্তু দশটা বাজতেই জানা গেল, অযথাই দোষ দেয়া হয়েছে রাফিকে। তার চেঁচামেচিতে পালায়নি চোর। আসলে আসেইনি। ডাকে পাঠিয়েছে চিঠি। গাঁয়ের পোস্ট অফিস থেকে পোস্ট করেছে। তেমনি সাধারণ খাম। দোমড়ানো। ময়লা। ওপরে ক্যাপিটাল লেটারে লেখা ঠিকানা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হাঁটু কাঁপতে লাগল ডোরার। না জানি আবার কি ভয়ঙ্কর কথা লেখা আছে! কিডন্যাপারদের পাল্লায় পড়েনি তো আর কখনও, ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।

প্যাসেজে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ছেলেমেয়েদের। হাতের চিঠিটা দেখেই বুঝে ফেলল যা বোঝার।

'কিডন্যাপারদের চিঠি!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল টকার।

'খাইছে! তার মানে সারারাত খামাকাই বসে বসে পিঁপড়ের কামড় খেলাম...' বলেই চোখ পড়ল কিশোরের চোখে। থমকে থেমে গেল। সর্বনাশ! মনের ভুলে দিয়েছে ফাঁস করে।

সন্দেহ দেখা দিল ডোরার চোখে। সবার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই বুঝল না। নিরীহ মুখের ভঙ্গি করে রেখেছে সবাই। তবু সাবধান করে দেয়ার জন্যে বলল, 'তোমরা যে গোয়েন্দা, জানি। খবরদার, ওসব ছেলেমানুষী করতে গিয়ে সব পণ্ড কোরো না। সাংঘাতিক রেগে যাবেন তাহলে প্রফেসর কারসওয়েল।'

চুপ করে রইল সবাই। হ্যাঁ-ও বলল না, না-ও বলল না। কারণ ওরা খুব ভাল করেই জানে, চিতাটাকে খুঁজে বের করার আগে ক্ষান্ত দেবে না কেউই। সে কথা বলল না ডোরাকে।

ল্যাবরেটরির দিকে এগোল ডোরা। পেছন পেছন চলল সবাই।

আধ মিনিট পরই বেরিয়ে এল ডোরা। তখন ঢুকল ওরা। আগে টকার, পেছনে অন্যেরা।

কাজে ডুবে আছেন প্রফেসর। টেবিলে পড়ে আছে চিঠিটা। খুলেনইনি। তার মানে পাত্তাই দিচ্ছেন না আর কিডন্যাপারদের।

টকার জিজ্ঞেস করল, 'আব্বা, চিঠিটা পড়বে না?'

'ও আর পড়ে কি হবে?' লেখা থেকে চোখ না তুলেই জবাব দিলেন প্রফেসর। 'ইচ্ছে হলে নিয়ে গিয়ে পড়োগে। যত যা-ই লিখুক, আমার জবাব হবে *না,* ব্যস।'

চিঠিটা তুলে নিল টকার।

ওটা নিয়েই তাকে বেরিয়ে আসতে ইশারা করল কিশোর।

বাড়ির পেছনে ঝোপের ছায়ায় এসে বসল ওরা। চিঠিটা খোলার ভার পড়ল রবিনের ওপর। খুলে পড়তে লাগল সে। চুপ হয়ে আছে রাফি। নটিও দুষ্টুমি করছে না। টকারের কাঁধে লক্ষ্মী হয়ে বসে আছে। ব্যাপার গুরুতর, বুঝে ফেলেছে যেন।

সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে দুই বার করে পড়ল রবিন। মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে।

পুরো একটা মিনিট ঝিম মেরে বসে রইল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর আনমনে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'হুঁ, তাহলে আজ রাত দশটায় বনের ভেতর যেতে হবে ডোরাকে। একা। প্রফেসর কারসওয়েলের জবাব নিয়ে।'

'বনের মধ্যে খোলা জায়গার কথা বলল।' টকারের দিকে তাকাল মুসা, 'চেনো নিশ্চয় জায়গাটা?'

'চিনি। ডোরাও চেনে।'

'ওখানে গিয়ে দেখতে পাবে একটা ওক গাছের গুঁড়ি,' চিঠিতে যা লেখা আছে তার পুনরাবৃত্তি করল জিনা। 'তার ওপরে একটা পাখির খাঁচা রাখা থাকবে। জবাব লেখা কাগজটা রাখতে হবে তার মধ্যে। ফরমুলা দিতে যদি রাজি থাকেন কারুস আংকেল, তাহলে ওটা হাতে পাওয়ার চব্বিশ ঘন্টা পর বাড়ি ফিরে আসবে টারকজ।'

টকারের দিকে তাকাল মুসা। 'রাতের বেলা একা যেতে ভয় পাবে না ডোরা?'

'কি জানি। পাওয়ারই তো কথা। কিডন্যাপারদের ব্যাপারটা না থাকলে অবশ্য পেত না।'

'আমার মনে হয় না ওর কোন ক্ষতি করবে ওরা,' জিনা বলল। 'শয়তানী যা করার তা জবাব পাওয়ার পর করবে।'

'যেমন?' কি করবে ওরা আন্দাজ করতে পারছে মুসা, তবু জিনার মুখ থেকে শোনার জন্যে প্রশ্নটা করল।

'প্রতিশোধ নেবে। ঝড়টা যা যাওয়ার যাবে বেচারি টারকজের ওপর দিয়ে।'

কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল টকারের চেহারা।

'অত সহজে পার পেতে দেব না ব্যাটাদের,' কিশোর বলল। 'শোনো, কি করব। আজ বিকেলে ডোরা যাওয়ার আগেই জায়গাটার কাছে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব আমরা। জবাবটা নিতে কেউ না কেউ আসবেই। তাকে অনুসরণ করবে

রাফি। আমরাও যাব পেছনে। কোথায় যায় চিনে আসব। তারপর তোমার আব্বাকে বলে পুলিশকে খবর দেওয়াব। চিতাটাকেও উদ্ধার করব, চোরগুলোকেও ধরব।'

উজ্জ্বল হলো টকারের মুখ। 'তাই তো! এই সহজ কথাটা তো ভাবিনি!'

'এখনই গিয়ে পুলিশকে বলি না কেন?' জিনার প্রশ্ন।

'বোকা নাকি?' মুসা বলল, 'পুলিশ এলে কারস আংকেল বিরক্ত হবেন। কিডন্যাপাররাও জেনে যাবে, গোপনে কিছু একটা করা হচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে। সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। রেগে গিয়ে দেখা যাবে গুলি করে তক্ষুণি মেরে ফেলেছে টারকজকে।'

কড়া চোখে মুসার দিকে তাকাল জিনা। তাকে বোকা বলেছে। যা তা কথা! সবাই ভয় পেয়ে গেল। বলার সময় বলে ফেলেছে মুসা, এখন সে-ও ভয় পেয়ে গেল।

সবার মনের ভাবটা বুঝে ফেলেছে বোধহয় জিনা। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে ফিক করে হাসল। বলল, 'ভেবেছিলে রেগে উঠব, তাই না? অকারণে রাগি না আমি। আসলেই বোকার মত কথা বলেছি।'

আবার হাঁপ ছাড়ল সবাই।

আগের কথার খেই ধরে রবিন বলল, 'বুদ্ধিটা ভালই হয়েছে। গিয়ে লুকিয়েই বসে থাকব। এলে পিছু নেব।'

মুসা বলল, 'পিছু নেয়ার দরকার কি? একজন হলে তো ধরেই ফেলতে পারি। আমাদের সঙ্গে একলা পারবে না। ধরে নিয়ে যাব পুলিশের কাছে। পুলিশ তার মুখ থেকে কথা আদায় করে নিতে পারবে।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'একজন ধরা পড়লে দলের বাকি লোকগুলো পালাবে। টারকজকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। তখন তাদেরকে ধরা মুশকিল হয়ে যাবে। একবারে ধরতে হবে সবগুলোকে। কোন মতেই সাবধান করে দেয়া চলবে না। কাজেই, আমি না বললে কেউ কিছু করতে যে-ও না।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'কাল রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারিনি। দুপুরে খেয়েই শুয়ে পড়ব। ঘুমিয়ে নেব দু-তিন ঘণ্টা। বলা যায় না, আজও রাত জাগতে হতে পারে।'

পাঁচ

সন্ধ্যাবেলা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। রাফিকে সঙ্গে নিল, তবে নটিকে রেখে গেল বাড়িতে। ওকে নেয়া উচিত মনে করল না। ও চুপ থাকতে পারে না। জরুরী মুহূর্তে সব ভজঘট করে দিতে পারে।

গাঁয়ের পথ ধরে সারি দিয়ে নীরবে এগিয়ে চলল দলটা। পৌঁছে গেল বনের কাছে। গাছপালার ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়াল খোলা জায়গাটার ধারে।

'ভাল ঝোপঝাড় আছে,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'লুকিয়ে বসলে কেউ দেখতে পাবে না। কিশোর, ওই ঝোপটাতে বসি, কি বলো?'

কিশোর তাকিয়ে আছে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির দিকে।

টকার বলল, 'ওটাই।'

'বুঝতে পারছি। খাঁচাটা আছে।'

রবিন আর জিনাও দেখেছে খাঁচাটা। সরু শিক দিয়ে তৈরি খুবই হালকা জিনিস। ওপরে একটা গোল আঙটা লাগানো। ধরার জন্যে।

'কে যেন আসছে!' কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামাল মুসা।

ওরা যে পথে এসেছে সেদিকেই শোনা যাচ্ছে পদশব্দ।

'জলদি লুকিয়ে পড়ো সবাই,' নির্দেশ দিল কিশোর।

কয়েক মিনিট পর গাছের আড়াল থেকে বেরোতে দেখা গেল ডোরাকে। এগিয়ে আসছে দ্রুতপায়ে। কল্পনাই করতে পারছে না ছয় জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যায় ভয় পাচ্ছে। পাওয়ারই কথা। দোষ দেয়া যায় না।

খোলা জায়গাটায় বেরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ডোরা। এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজল গাছের গুঁড়িটা। চোখে পড়ল। চিনতে পারল খাঁচাটা দেখে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে সোজা এগিয়ে গেল সেদিকে। চিঠির জবাব লিখে দিয়েছেন প্রফেসর কারসওয়েল। খামটা বের করে ঢুকিয়ে দিল খাঁচার মধ্যে। তারপর আর একটা সেকেণ্ডও দেরি না করে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। আসার সময় যত তাড়াতাড়ি করেছিল তার চেয়ে দ্রুত। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল গাছের আড়ালে।

আরও কিছুক্ষণ শোনা গেল তার জুতোর আওয়াজ। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

ফিসফিসিয়ে কিশোর বলল, 'এইবার আসছে আসল কাজ। সবাই হুঁশিয়ার থাকবে। জিনা, রাফিকে বলে দাও কোন কারণেই যেন শব্দ না করে।'

পাথর হয়ে বসে রইল সবাই। আশপাশের ঝোপ আর গাছগুলোর মতই স্তব্ধ। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। একটা পাখিও ডাকছে না। নিজেদের হৃৎপিণ্ডের শব্দই যেন বড় বেশি হয়ে কানে বাজছে। যে কোন সময় এখন এসে হাজির হতে পারে টারকজের কিডন্যাপার।

রাফির কলারে শক্ত হলো জিনার আঙুল। কি করতে হবে বুঝে গেছে বুদ্ধিমান কুকুরটা। চুপ হয়ে রইল সে। এমনকি লেজের ডগাও নাড়ল না।

সবার চোখ খাঁচাটার দিকে।

টকার ভাবছে, 'সব কিছু এখন ভালয় ভালয় শেষ হলেই হয়। যদি আমাদের দেখে ফেলে? কি হবে?'

গোয়েন্দাগিরি তারও ভাল লাগে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কয়েকটা অ্যাডভেঞ্চার করেছে। আরও করার ইচ্ছে আছে। তাই কিশোর যা যা করতে বলে, ঠিক তা-ই করে।

রাফি বাদে দলের আর সবার চেয়ে মুসার কান আর চোখের ক্ষমতা দুটোই বেশি। তাই সে-ই আগে শুনতে পেল। কিশোরের কানে কানে বলল, 'আসছে!'

তার আগেই কান খাড়া করে ফেলেছে রাফি। তাকিয়ে রয়েছে বনের উল্টো

দিকের খোলা জায়গার দিকে।

সবাই শুনতে পাচ্ছে এখন। কিছু একটা নড়ছে বনের ভেতর। গলা বাড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে সেদিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

কেঁপে উঠল একটা ঝোপের পাতা। হঠাৎ করেই খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওটা। খুব সুন্দর ছোট জাতের একটা হরিণ।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল টকার। অন্যেরাও ফেলল। হতাশার। অস্থির হয়ে উঠেছে ওরা। চোরটা আসতে এত দেরি করছে কেন?

চলে গেল হরিণটা। আবার অপেক্ষার পালা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। লুমিনাস ডায়াল ঘড়িতে দেখল অনেক রাত হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা সময় যে এভাবে পার হয়ে গেছে টেরই পায়নি উত্তেজনার কারণে। পৌনে দশটা বাজে। আর কতক্ষণ?

হঠাৎ আবার কানে এল শব্দ।

দম বন্ধ করে ফেলল সবাই। দেখা যাক এবার কি বেরোয়? বনের ভেতরে অন্ধকারে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে কেউ। শুকনো পাতায় পা পড়ে মচমচ শব্দ হচ্ছে। খুব সাবধানে হাঁটছে। পায়ের নিচে পড়ে মট করে ভাঙল শুকনো একটা ডাল। এবার আর চোরটা না হয়েই যায় না, আশা করল সবাই।

শব্দ শুনে মনে হয় না বড় মানুষ। সেই তুলনায় বেশি হালকা। কিশোর ভাবছে, 'বড় মানুষ তো নয়ই, মেয়েমানুষও নয়। ছোট ছেলেটেলে হবে।'

সন্দেহের কথাটা কাউকে বলল না সে। কথা বলল না ভয়ে। যদি ফিসফিস করে বললেও শত্রুর কানে চলে যায়। তাদের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যাবে। এতক্ষণ কষ্ট করে বসে যে থেকেছে তার কোন অর্থই হবে না আর।

কান খাড়া করে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বসে রইল সে। ঠিক কোনখান থেকে আসছে শব্দটা বোঝার চেষ্টা করছে।

চাঁদ উঠেছে। হলদেটে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে বনের মধ্যে। আলো আঁধারির খেলা। রহস্যময় করে তুলেছে পরিবেশ।

খোলা জায়গাটার উল্টো দিকে একটা নিচু ঝোপের ওপর কিশোরের দৃষ্টি স্থির। ডালপাতা ফাঁক হয়ে সরে যাওয়ার অপেক্ষা করছে সে। বড় মানুষ বেরোবে না, জানে। বেরোবে ওদেরই বয়েসী কোন কিশোর। কিংবা তার চেয়েও ছোট শরীরের আরও কম বয়েসী কোন ছেলে।

কিন্তু তার ধারণা ঠিক হলো না। ডালপাতা সরে গিয়ে একটা ফাঁক দেখা গেল, সেখান দিয়ে বেরিয়েও এল প্রাণীটা, তবে কোন মানুষ নয়। একটা কুকুর। কালো একটা স্প্যানিয়েল।

কিশোরের পর পরই ওটাকে দেখতে পেল মুসা। 'খাইছে!' দারুণ নিরাশায় গুঙিয়ে উঠল সে। 'একের পর এক জানোয়ারই বেরোচ্ছে কেবল! মানুষ বেরোয় না কেন?'

ঝট করে এদিকে কান খাড়া করল কুকুরটা। কথার শব্দ কানে গেছে সম্ভবত।

রবিন, জিনা আর টকারও হতাশ হয়েছে। সবাই কোন না কোন মন্তব্য করল।

কিন্তু কিশোর চুপ। আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে কুকুরটার দিকে।

অদ্ভুত আচরণ করছে কুকুরটা। জিনাও লক্ষ্য করেছে সেটা। সে-ও চুপ হয়ে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে স্প্যানিয়েলটার দিকে।

দাঁড়িয়ে গেছে ওটা। সামনের একটা পা তুলল। নাক তুলল আকাশের দিকে। বাতাস শুঁকছে।

হেসে নিচু গলায় খোঁচা দিয়ে বলল রবিন, 'প্রকৃতির প্রেমে পড়েছে। চাঁদ দেখছে…'

'চুপ!' থামিয়ে দিল তাকে কিশোর। তার কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা।

অস্থির হয়ে উঠেছে রাফি। অপেক্ষা করছে জিনার ইঙ্গিতের। ইঙ্গিত পেলেই এখন ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কুকুরটার ওপর। কিন্তু তার নাকে আলতো টোকা দিল জিনা। চুপ করে থাকার ইঙ্গিত। ব্যাপারটা ভাল লাগল না রাফির। তবে নির্দেশ অমান্য করল না। জিনার বিরাগভাজন হতে চায় না সে কোনমতেই।

কুকুরটার দিকে চোখ সবার।

হঠাৎ যেন মনস্থির করে ফেলল স্প্যানিয়েল। তিন লাফে ছুটে এসে থমকে দাঁড়াল কাটা গাছের গুঁড়িটার কাছে। এক লাফে উঠে পড়ল ওপরে। খাঁচার ওপরের আঙটাটা কামড়ে ধরে আর একটা মুহূর্তও দেরি না করে আবার লাফিয়ে নেমে সোজা ছুটল যেদিক দিয়ে বেরিয়েছে সেদিকে।

এরকম কিছু ঘটবে আশা করেনি কেউ। বোকা হয়ে গেল। কয়েকটা সেকেণ্ড নড়ার কথাও মনে হলো না কারও। কিছু বলল না।

সবার আগে কথা ফুটল মুসার। চিৎকার করে বলল, 'খাইছে! নিয়ে গেল তো! খাঁচাটা চুরি করল…'

'না, চুরি করেনি,' গলা কাঁপছে কিশোরের। 'ওটার মালিক নিশ্চয় চোরেরা। ওরাই পাঠিয়েছে। ইস্, আমি একটা গাধা! এরকম কিছু ঘটতে পারে আগেই ভাবা উচিত ছিল।'

কাঁদো কাঁদো গলায় টকার বলল, 'আর কোন আশা নেই! পিছুও নিতে পারব না, আর ধরতেও পারব না চোরগুলোকে!'

ঘুম ভেঙে জেগে উঠল জিনা। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'পারব না মানে? এত সহজেই ছেড়ে দেব!' রাফির গলায় আলতো চাপড় দিতে দিতে বলল, 'এই রাফি, ওঠ। যা, কিছু কাজ দেখা। কুত্তাটার পিছে পিছে যা। খবরদার, ঝগড়া করবি না। চুপে চুপে দেখে আসবি কোথায় যায় ওটা। আমরা রইলাম এখানে। যা। জলদি।'

'হউ!' করে উঠে দাঁড়াল রাফি। পাকা ট্রেনিং পাওয়া। জিনার সব কথাই বোঝে যেন মানুষের মতই।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে গেল সে। কয়েক লাফে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে ঢুকে গেল ওপাশের বনে। তাকে হারিয়ে যেতে দেখল গোয়েন্দারা।

টকারের অপরিচিত নয় রাফি। ও যে কতখানি বুদ্ধিমান, জানে। তবু বিশ্বাস করতে পারল না। জিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার সব কথা বুঝল ও? ঠিক

ঠিক করতে পারবে?'

মুচকি হেসে জিনা বলল, 'দেখোই না পারে কিনা।'

'কি জানি। আমার মনে হচ্ছে বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছ ওকে।'

'তোমার মুখে একথা মানায় না। জানোয়ার পোষা তোমার শখ। ভাল করেই জানো, যতটা বোকা ওদেরকে ভাবা হয় আসলে ততটা নয়।'

'তা ঠিক। তবে পিছু নিয়ে গিয়ে জায়গা চিনে আসার কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না। বড় জোর গিয়ে স্প্যানিয়েলটাকে ধরে ঝগড়া শুরু করবে।'

'মোটেও তা করবে না। ও আমার কথা বুঝতে পারে। প্রচুর ট্রেনিং দিয়েছি। দেখবে, যা যা বললাম ঠিক ঠিক করে আসবে।'

এ ব্যাপারে তিন গোয়েন্দা কোন মন্তব্য করল না। রাফিকে ওরা চেনে। জিনা যা বলেছে ঠিকই বলেছে। রাফির বুদ্ধি ওদেরকেও অবাক করেছে বহুবার।

কিশোর বলল, 'বেশি অস্থির হয়ে পড়েছ বলেই তোমার দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না, টকার। রাফি পারবে। যা বলেছে, করে আসবে।'

'তাহলে কি শুধুই বসে থাকব আমরা এখন?'

হেসে বলল রবিন, 'তাহলে আর কি করবে?'

'কতক্ষণ থাকব?'

কিশোর জবাব দিল, 'সেটা নির্ভর করে স্প্যানিয়েলটা কত দূরে যায় তার ওপর। তবে বেশিক্ষণ লাগবে বলে মনে হয় না। খাঁচাটা যত ছোটই হোক, একটা কুকুরের জন্যে কম ভারি নয়। কামড়ে ধরে ছুটতে ছুটতে একটা সময় চোয়াল ব্যথা হয়ে যাবে কুকুরটার। যত ট্রেনিং পাওয়াই হোক, জিরানোর জন্যে থামতে ওকে হবেই। খাঁচাটা নামিয়ে রাখবে মাটিতে। তারপর আর তুলে নেবে কি নেবে না, সন্দেহ আছে। তার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে সেটা। কাজেই তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না কিডন্যাপাররা। ওর চোয়াল ব্যথা হওয়ার আগেই খাঁচাটা নিয়ে নিতে চাইবে। আর তা করতে হলে বেশি দূরে থাকা চলবে না ওদের।'

'না থাকলেই ভাল।'

চুপ হয়ে গেল টকার।

আর ঝোপে বসে থাকার কোন দরকার নেই। বেরিয়ে এল ওরা। খোলা জায়গায় বেরিয়ে ঘাসের ওপর আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসল। সময় কাটানোর জন্যে গল্প শুরু করল।

টকার তাতে ভাল করে যোগ দিতে পারল না। সে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ঝোপের দিকে।

সময় কাটছে। আসছে না রাফি।

আস্তে আস্তে ধৈর্য হারাচ্ছে সবাই। ওরাও এখন বার বার তাকাচ্ছে ঝোপের দিকে। রাফিকে দেখার আশায়।

ভাবনাটা রবিনের মাথায়ই এল প্রথম। বলল, 'ভয় লাগছে, বুঝলে? রাফি যদি আর না ফেরে?'

ঝট করে তার দিকে চোখ ফেরাল জিনা, 'মানে? ফিরবে না মানে? ভাল

করেই জানো, আমার কথা কখনও অমান্য করে না সে…'

'না, সে কথা বলছি না, জিনা। আমি ভাবছি অন্য কথা। যদি কিডন্যাপারদের চোখে পড়ে যায় ও? ওরা তার ক্ষতি করে?'

তাই তো! একথাটা তো ভেবে দেখা হয়নি। চোরগুলোর কথা কিছুই বলা যায় না। ওরা ওকে গুলি করেও মেরে ফেলতে পারে। অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল জিনা।

হাত ধরে তাকে টেনে বসিয়ে দিল মুসা। 'চুপ করো! একটা শব্দ শুনলাম।'

কান খাড়া করল সবাই।

আবার হলো শব্দ। শুকনো পাতায় পা পড়েছে কারও।

অধীর হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল সবাই।

কয়েক সেকেণ্ডের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রাফি।

ছেলেমেয়েদেরকে দেখতেই হউ! হউ! করে লম্বা ডাক ছেড়ে ছুটে আসতে লাগল তাদের দিকে।

আনন্দে লাফ দিয়ে উঠে তার দিকে দৌড় দিল জিনা।

অন্যেরাও বসে রইল না। উঠে জিনার পেছন পেছন এগোল।

ছয়

আধ মিনিট পরেই রাফির পেছন পেছন আবার বনে ঢুকল দলটা। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে। আশায় আনন্দে দুলছে ওদের বুক। রাফি কথা বলতে পারে না। কাজেই ওদেরকে বলতে পারল না কিডন্যাপারদের আস্তানা দেখে এসেছে কিনা। তবে স্প্যানিয়েলটা কোথায় গেছে এটা যে দেখেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সারি দিয়ে চলেছে ওরা। সবার আগে, অর্থাৎ রাফির ঠিক পেছনেই রয়েছে টকার। টারকজকে দেখার জন্যে আর তর সইছে না। কাঁটা ডালে ঘষা লেগে হাত-মুখের চামড়া ছড়ে যাচ্ছে যে খেয়ালই করছে না। টারকজকে ফিরে পেতে যে কোন কাজ করতে সে রাজি। মারাত্মক বিপদের মুখোমুখি হতেও পিছ পা হবে না।

ছুটে চলেছে রাফি। তার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সবাই। দুবার শেকড়ে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টকার। দুবারই তাকে টেনে তুলল মুসা। বলল, 'দেখে হাঁটতে পারো না?'

বনের পথে এত তাড়াতাড়ি চলতে সবারই অসুবিধে হচ্ছে। রাফিকে আরেকটু আস্তে চলতে বলল জিনা।

বেশিক্ষণ লাগল না, বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল রবিন, 'এবার কোন দিকে?'

'কোন দিকে, রাফি?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। সাগরের দিকে নেমে

গেছে ঢাল। চাঁদের আলোয় সাগরের পানিকে তরল রূপার মত লাগছে। ওদের পেছনে বন। তার ওধারে বিগ হোলো গ্রাম। সামনে শুধু সাগর আর আকাশ।

সাগরের দিকে নেমে চলল রাফি। একটা পথ চলে গেছে পানির দিকে।

চারপাশে তাকিয়ে শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'আমাদেরকে সৈকতে নিয়ে চলেছে কেন ও? বাড়ি নেই ঘর নেই, চ্যাপ্টা সৈকত। জিনা, রাফি ভুল করেনি তো?'

'তুমি করতে পারো, রাফি করবে না,' ফুঁসে উঠল জিনা। রাফির সামান্যতম সমালোচনা সইতে পারে না সে, যে-ই করুক। 'দেখোই না কি করে?'

'কিন্তু চোরগুলোর লুকানোর কোন জায়গা তো দেখতে পাচ্ছি না?'

'কথা না বলে হাঁটো ওর পেছন পেছন,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর।

সৈকতের কোমল মিহি বালিতে এসে এক মুহূর্তের জন্যে থামল রাফি। তারপর মাটির দিকে নাক নামিয়ে শুঁকতে শুঁকতে এগোল। একটা জায়গায় এসে চক্কর দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগল, একই জায়গায়।

'কোন কিছুর গন্ধ পেয়েছিস?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

জবাব দিল না রাফি। একই ভাবে ঘুরছে।

পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল কিশোর। বালিতে আলো ফেলে দেখল। প্রায় একই সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠল অন্য চারজন।

রাফি কি শুঁকছে দেখতে পেয়েছে সবাই। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট হয়নি, তাই বুঝতে পারেনি। টর্চের আলোয় পরিষ্কার।

'পায়ের ছাপ!' চাপা গলায় বলল রবিন।

'মানুষের,' জিনা বলল। 'দেখো, পাশাপাশি গেছে আরেকটা কুকুরের পায়ের ছাপ।'

'দুজন লোক,' দেখতে দেখতে বলল মুসা। 'দুই ধরনের জুতো। গামবুটের সোলের মত লাগছে।'

'কিন্তু গেছে তো সাগরের দিকে।'

'হ্যাঁ।' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। জানতে চায়, এবার কি করবে?

কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কারও।

কিশোর বলল, 'নৌকা নিয়ে এসেছিল ব্যাটারা। নিজেরা এখানে থেকেছে। স্প্যানিয়েলটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে খাঁচাটা তুলে আনার জন্যে। কুকুরটা ওটা নিয়ে ফেরার পর ওকে আবার নৌকায় তুলে নিয়ে চলে গেছে।'

'সে তো বুঝেইছি,' রবিন বলল। 'এখন কি করব?'

নৌকা নিয়ে গেছে। কোন দিকে গেছে কে জানে? অনুসরণ করার উপায় নেই। হতাশ হয়ে মুসা বলল, 'উপকূলের যে কোন গাঁয়ে গিয়ে উঠতে পারে। বের করব কি করে?'

জিনা বলল, 'ধারেকাছে কোন গুহায় গিয়েও ঢুকতে পারে। পাহাড় যখন আছে, গুহাও নিশ্চয় আছে। তাতে চিতাটাকে লুকিয়ে রাখাও সহজ।'

মুসা বলল, 'থাকলেই কি? এখন সেটা খুঁজে বের করতে পারব না। এখানে থেকে আর কি করব? চলো, যাওয়া যাক। টকার, যাবে না?'

কিন্তু এভাবে খালি হাতে বাড়ি ফেরার কোন ইচ্ছেই নেই টকারের। বিছানায় শুয়েও কোন লাভ নেই। ঘুমাতে পারবে না।

টর্চ নিভিয়ে দিল কিশোর। টকারের মতই তারও খালি হাতে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। বলল, 'একটা কিছু করা দরকার।' নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'কিন্তু কি করব?'

কেউ উপায় বাতলাতে পারল না।

'এসো, আলোচনা করে দেখি। বুদ্ধি একটা বেরিয়েও যেতে পারে।'

সবাই ঘিরে এল তাকে।

'নৌকা নিয়ে এসেছিল ওরা, রাইট?' কিশোর বলল। কারও জবাবের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই বলল, 'এর দুটো কারণ হতে পারে। একটা তো বুঝতেই পারছি, যাতে কেউ পিছু নিতে না পারে সে জন্যে। আরেকটা কারণ হলো, কাছাকাছিই থাকে ওরা। এই কথাটা গোপন রাখতে চায়।'

'হুঁম, এটা সম্ভব,' মাথা দোলাল রবিন।

'আর যেহেতু নৌকা নিয়ে এসেছে, কাছাকাছিই কোথাও সেটা ভেড়াতে হবে ওদের। কারণ জোয়ার আসছে। সৈকত পুরো ঢেকে যাবে। ডাঙায় উঠতে হলে তাড়াতাড়ি করতে হবে। নইলে পানির জন্যে নামতে পারবে না। আমাদেরও তাড়াতাড়ি করতে হবে। কোথায় নেমেছে ওরা, জোয়ারের আগে সেটা বের করতে না পারলে পরে আর পারব না। পানিতে সব দাগ আর চিহ্ন ধুয়ে মুছে যাবে।'

'কোনখানে যেতে চাও তুমি?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কাছেই দুটো ছোট ছোট খাঁড়ি আছে। দিনের বেলা ম্যাপ ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম যে, তখনই দেখেছি। আমার বিশ্বাস ওগুলোরই কোনটাতে নৌকা নিয়ে ঢুকেছে ওরা। তাড়াহুড়ো করতে পারলে হয়তো আজ রাতেই চিতা রহস্যের একটা কিনারা করে ফেলতে পারব।'

'খাঁড়ি দুটো আমি চিনি,' প্রায় চিৎকার করে বলল টকার। আবার আশার আলো দেখতে পেয়েছে। 'চলো, জলদি চলো। শর্টকাটেই নিয়ে যেতে পারব।'

'তাহলে তো ভালই। চলো।'

কিন্তু মুসার মনে হলো এভাবে গিয়ে সুবিধে হবে না। বরং বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। বলল, 'সোজা গিয়ে বাঘের মুখে পড়ব না তো? লোকগুলো বড় হুঁশিয়ার।'

'অপরাধীরা হুঁশিয়ারই হয়,' কিশোর বলল। 'নাথিং ভেনচার, নাথিং উইন। আর অত ভয় কিসের? অনেক লোক আমরা। রাফিকে নিয়ে সাতজন।'

'সাতজন দেখলে কোথায়? ছয়জন।'

'আমাদের ডবল ক্ষমতা রাফির। কাজেই তাকে দুজন ধরছি। কামড়াকামড়ির হিসেবটা ধরলে আরও বেশি...'

'ব্যস ব্যস হয়েছে, আর দরকার নেই,' দুই হাত তুলে নাড়তে নাড়তে মুসা বলল। 'তোমার সঙ্গে কথায় যে পারব না সে তো জানিই। তা-ও বলতে গিয়েছিলাম। চলো, কোথায় যেতে হবে।'

'টকার, এগোও,' কিশোর বলল।

সাগরের দিকে পেছন করে হাঁটতে শুরু করল টকার। টিলাটক্করে ভরা একটা জংলা জায়গা পেরিয়ে ঘুরে আবার বেরিয়ে এল সৈকতে। বালির চেয়ে পাথরই বেশি এখানে। ক্রমাগত ঢেউয়ের ঘষা খেয়ে খেয়ে মসৃণ চকচকে হয়ে গেছে পাথরগুলো। তার ওপর দিয়ে হাঁটতে অসুবিধে হয়।

তবু থামল না ওরা। এসে দাঁড়াল প্রথম খাঁড়িটার পাড়ের ছোট্ট সৈকতে।

'এই, তোমরা সব দাঁড়াও এখানে,' কিশোর বলল। 'আমি আর মুসা গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে আসি খাঁড়িগুলোতে। একদম নড়বে না।'

'আমি আসব তোমাদের সঙ্গে,' জেদ ধরল টকার।

'দেখো, বেশি লোক গেলে বিপদ…'

'আমি গেলে তোমাদের সুবিধে। কারণ এ জায়গা আমার চেনা, তোমাদের অচেনা…'

'ঠিক আছে, এসো। তবে শব্দ করবে না। এই রাফি, আয়।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিশোরদের চলে যেতে দেখল জিনা আর রবিন।

টর্চ জ্বাললে ভাল হত, পায়ের ছাপ থাকলে দেখা যেত, কিন্তু ঝুঁকি নিল না কিশোর। কাছাকাছি থাকলে আলো দেখে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে চোরেরা।

'রাফি, মাটি শুঁকে দেখ, গন্ধ পাস নাকি,' বলে তার মাথায় আলতো একটা চাপড় দিল কিশোর।

ইঙ্গিতটা বুঝল রাফি। নাক নিচু করে শুঁকতে শুরু করল। কিন্তু কিছুই পেল না। এদিকে মনে হয় আসেনি লোকগুলো।

শেষ পর্যন্ত টর্চ জ্বালার ঝুঁকিটা আর না নিয়ে পারল না কিশোর। মাটিতে ছাপ থাকলে আলো ছাড়া দেখা যাবে না।

কিন্তু একটা ছাপও নেই। আগের দিন জোয়ারের পরে আর কেউ আসেনি এদিকটায়।

হতাশ হয়ে রবিন আর জিনার কাছে ফিরে এল ওরা।

'দ্বিতীয় খাঁড়িটায়ও দেখব,' অতটা আশা আর করতে পারছে না কিশোর, তবু হাল ছাড়তে রাজি নয়।

এবারও পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল টকার।

নাহ্, দ্বিতীয় খাঁড়িটার কাছে এসেও কোন সুবিধে করা গেল না। পায়ের ছাপ আছে এখানকার সৈকতে, প্রচুরই আছে, কিন্তু কোনটা যে চোরগুলোর বোঝার উপায় নেই। লিটল হোলো গাঁয়ের লোক এখানে নিয়মিত আসে সাঁতার কাটতে। বালিতে তাদের পায়ের ছাপ।

আর কিছু করার নেই। বড়ই নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে চলল গোয়েন্দাদের দলটা। মুখ নিচু করে রেখেছে টকার। অনেক কষ্টে চেপে রেখেছে চোখের পানি। তার প্রিয় টারকজকে পাওয়া গেল না। মনে মনে ফুঁসছে সে—যদি খালি ধরতে পারতাম ব্যাটাদের…

পা টিপে টিপে বাড়িতে ঢুকল ওরা। প্রফেসরের ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে।

নিশ্চয় তিনি কাজে ব্যস্ত। ভালই হয়েছে। নইলে ওরা যে এত রাত পর্যন্ত ঘরে ছিল না জেনে যেতেন। কৈফিয়ত দিতে দিতে তখন জান বেরোত।

কিন্তু ডোরা? ডোরা কি করছে? নিশ্চয় ওদের দেরি দেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে খুব একচোট বকা খেতে হবে। বকুক, যত খুশি। কেয়ার করে না ওরা। কেবল কারস আংকেলকে বলে না দিলেই হলো।

ভীষণ গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। এভাবে যে ওদের ওপর টেক্কা দেবে চোরগুলো, কল্পনাই করতে পারেনি। তাহলে অন্য কোন একটা বুদ্ধি করেই বেরোত। কে ভাবতে পেরেছিল নিজেরা না এসে একটা কুকুরকে পাঠাবে চিঠি তুলে নিয়ে যেতে!

বেশ, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর, *চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলাম আমি তোমাদের। এর একটা বিহিত যদি না করি আমি, আমার নাম কিশোর পাশা নয়!*

সাত

পরদিন উজ্জ্বল রোদ উঠল। একরত্তি মেঘ নেই আকাশে। সাগরের দিক থেকে আসা উষ্ণ কোমল একঝলক বাতাস বাগানের গাছগুলোর মাথা দুলিয়ে দিয়ে গেল। গ্রীষ্মের চমৎকার একটা দিন। এমন দিনে বিগ হোলোর লোকের মনে খুশির আমেজ, ফুরফুরে মেজাজ। কেবল কয়েকজনের বাদে। তারা বিষণ্ণ। প্রকৃতি তাদের মনে দাগ কাটতে পারেনি। আর তারা হলো আমাদের কিশোর গোয়েন্দারা।

ভারি মন আর মেঘে ঢাকা মুখ নিয়ে যেন ঘুম থেকে উঠল ওরা। টকারের চোখ লাল। নিজের ঘরে একলা শুয়ে শুয়ে অনেক কেঁদেছে। কারও দিকে তাকাতে পারছে না। তার অবস্থা দেখে ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে জিনা আর মুসা। মুসার তো বার বার মুঠোবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে হাত। সামনে পেলে ঘুসিই মেরে বসত কিডন্যাপারদের নাকে।

ডোরারও মন খারাপ। থেকে থেকেই ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। মুখ গোমড়া করে রেখেছে। টকারের দুরবস্থা দেখে, রাতে কোথায় গিয়েছিল সে কথা আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো না।

সব বিষণ্ণতার মাঝেও কেবল প্রফেসর কারসওয়েলই স্বাভাবিক রয়েছেন। টারকজ আর কিডন্যাপারদের একেবারে দূর করে দিয়েছেন মন থেকে। ফরমুলা ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই মাথা ঘামাচ্ছেন না। খুব শীঘ্রিই শেষ হয়ে যাবে কাজ, সেই আনন্দ আর উত্তেজনায় মশগুল তিনি।

তাড়াহুড়া করে নাস্তা সেরে উঠে চলে গেলেন প্রফেসর।

বন্ধুরা তার বাবাকে হৃদয়হীন ভেবে বসতে পারে একথা মনে করে টকার বলল, 'আব্বার মন নেই একথা বলা যাবে না। খুবই আছে। অনেক মানুষের চেয়ে অনেক বেশিই আছে। আসলে কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না তো। দুনিয়ার আর কোন দিকেই খেয়াল থাকে না।'

'সেটা আমরা জানি,' জিনা বলল।

এত মানসিক চাপ সইতে না পেরে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে ডোরার। ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল, 'তোমাদের খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকলে এখন দয়া করে ওঠো। মুখগুলোকে ওরকম করে রেখো না। বাইরে চমৎকার আবহাওয়া। বাগানে গিয়ে খেলতে পারো। ইচ্ছে হলে সাইকেল নিয়ে দূরেও কোথাও যেতে পারো। যা করো করো, কেবল ঘরে বসে থেকে আমাকে জ্বালিও না।'

ঘরে বসে থাকার ইচ্ছে যেমন নেই ওদের, সাইকেল নিয়ে বেরোতেও ভাল লাগছে না। পিকনিক কিংবা হাসি-আনন্দ এই মুহূর্তে ভাল লাগছে না ওদের। ডোরাকে বিরক্ত না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'আমার কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করছে না,' টকার বলল।

'একটা সূত্র-টুত্র পাওয়া গেলে খুব ভাল হত,' আনমনে বলল কিশোর। 'চিতাটাকে খুঁজতে যেতে পারতাম…'

সবাইকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন। হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছে চলে এসেছে ওরা। তার চোখ পড়েছে ডাক-বাক্সটার ওপর। সাদা একটা খামের কোণা বেরিয়ে আছে। কিডন্যাপাররা যে খামে করে চিঠি দিয়েছে, সেই একই রকম খাম।

'চিঠি!' বলতে বলতে ছুটে গেল সে।

অন্যেরাও দৌড় দিল সেদিকে। সবার আগে পৌঁছল টকার। বাক্স খুলে বের করল চিঠিটা। কিডন্যাপারদেরই চিঠি, কোন সন্দেহ নেই। খাম দেখেই বোঝা যায়।

রাগে কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল মুসার। বাতাসে মুঠো তুলে ঝাঁকাতে লাগল। ভয় পেয়ে গিয়ে টকারের ঘাড়ে মুখ গুঁজল নটি।

'হায় হায়, কি গাধামিটাই না করলাম!' আফসোস করতে লাগল কিশোর। 'কাল রাতে লেটার বক্সে চোখ রাখার কথা মনে হয়নি একটিবারও। রাখলে ধরে ফেলতে পারতাম।'

মাথা নাড়তে নাড়তে জিনা বলল, 'চিঠি যে দেবে সেটা তো আর জানতে না। এমনও হতে পারে, আমরা যখন সৈকতে গিয়ে ওদেরকে খোঁজাখুঁজি করছি তখন ফেলে গেছে।'

'মনে হয় না। তখন সময় পায়নি। চিঠিটা নিয়ে গিয়ে পড়েছে। এরপর কি করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনায় বসেছে। আরেকটা চিঠি লিখেছে। তারপর ফেলতে এসেছে বাক্সে। ফেলেছে আমরা আসার পর। যদি খালি একটিবার মাথায় আসত কথাটা, ইস্…কাল চোখ রাখলে ঠিক ধরে ফেলতে পারতাম।'

লাথি মেরে খোয়া বিছানো পথ থেকে একটা ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলল টকার। অধৈর্য কণ্ঠে রবিনকে বলল, 'কি লিখেছে জানা দরকার। চলো, আব্বার কাছে নিয়ে যাই।'

খামটা উল্টো করে ধরে রেখেছিল এতক্ষণ রবিন। নাড়াচাড়া করতে গিয়ে চোখ পড়ল ঠিকানাটার ওপর। চিৎকার করে উঠল, 'আরি! তোমার আব্বার নয়, তোমার নাম! তোমাকে লিখেছে চিঠিটা!'

একটান দিয়ে রবিনের হাত থেকে খামটা প্রায় কেড়ে নিল টকার। ফড়াৎ করে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল খামের মুখ। কাঁপা হাতে ভেতরের কাগজটা খুলতে গিয়ে হাত থেকে ফেলে দিল।

দেরি আর সহ্য হচ্ছে না কিশোরের। নিচু হয়ে টকারের আগেই তুলে নিল চিঠিটা। বলল, 'তোমার যা অবস্থা, পড়তেই পারবে না। আমিই পড়ি।'

সবাই ঘিরে এল তাকে। গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে হাতের কাগজটায় কি লেখা আছে। কিছু একটা ঘটছে আন্দাজ করে ফেলেছে রাফি আর টকার। ওরাও গলা বাড়িয়ে দিয়েছে।

জোরে জোরে পড়ল কিশোর, *'তোমার আব্বা আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কাজটা ভাল করেনি। আমরা জানি চিতাটাকে তুমি কতটা ভালবাস। তাই আরেকটা সুযোগ দিচ্ছি।...'*

থেমে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। সবাই উত্তেজিত। শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। টকারের তো চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে।

আবার পড়তে লাগল কিশোর, *'যদি চিতাটাকে আবার দেখতে চাও, তোমার আব্বার ফরমুলাটা চুরি করে এনে দেবে আমাদেরকে। ল্যাবরেটরিতে ঢোকা তোমার জন্যে সহজ। এবার আমাদের কথা না শুনলে আর জ্যান্ত দেখবে না চিতাটাকে। সেই সঙ্গে তুমি তো বটেই, তোমার বন্ধুরাও বিপদে পড়বে। ভীষণ বিপদ। সুতরাং যা বলছি করো। ফরমুলাটা নিয়ে আসবে বনের ভেতরের খোলা জায়গায়। যেখানে আগের বার রেখে গেছিল তোমাদের হাউসকীপার। বিষ্যুৎবার রাতে আসবে। একা। সাবধান, একথা কাউকে কিচ্ছু বলবে না। তাহলে খুব খারাপ হবে।'*

চিঠির নিচে সই নেই। থাকবে আশাও করেনি কিশোর।

'একই জায়গায় রাখতে বলেছে,' বিড়বিড় করল মুসা।

'কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়েই আব্বার জিনিস চুরি করতে পারব না আমি,' টকার বলল।

'তা তো করবেই না,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'ভেব না। চার দিন সময় পেয়েছি হাতে। একটা না একটা বুদ্ধি বেরিয়েই যাবে।'

'তো?' কিশোরের দিকে তাকাল জিনা, 'এখন কি করব? হাত-পা গুটিয়ে বসে তো আর থাকতে পারব না। একটা কিছু করা দরকার।'

'তা তো করবই। চারটে দিন যখন পেয়েই গেলাম, পুরোদমে তদন্ত চালিয়ে যাব।'

টারকজ এখনও বেঁচে আছে, সুস্থ আছে জেনে মেঘ কেটে গেছে টকারের মুখ থেকে। আবার সজীব হয়ে উঠেছে। বলল, 'চার দিন ব্যাটাদের ধরার জন্যে অনেক সময়।'

তর্জনী নাচাল কিশোর, 'শোনো কি করব। প্রথমে বিগ হোলোতে খুঁজব আমরা। কিছু না পেলে তারপর যাব লিটল হোলোতে। চিতাটাকে লুকিয়ে রাখা

যায় এরকম কোন জায়গা বাকি রাখব না। এই দুটো গাঁয়ে না পেলে চলে যাব পাশের গাঁয়ে। রাফি আমাদের সাহায্য করবে। টকার, টারকজ কোথায় ঘুমাত, চলো তো দেখি। ভাল করে তার গায়ের গন্ধটা রাফিকে শুঁকিয়ে নিই।'

আট

দশ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। দিনের বেলায় এখন নটিকে নিতে কোন অসুবিধে নেই। বলা যায় না, কাজেও লেগে যেতে পারে। তাই তাকে সঙ্গে নিল টকার।

প্রথমে একটা পরিত্যক্ত পুরানো খামারে সবাইকে নিয়ে এল সে। চিতার মত একটা জানোয়ারকে ওখানে সহজেই লুকিয়ে রাখা যায়।

ভেতরে ঢুকে দেখার প্রয়োজন পড়ল না। বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিয়ে নটিকে ছেড়ে দিল টকার। উঁচু দেয়াল, গাছের ডাল, ঘরের চাল আর জানালায় উঠে ভাল করে খুঁজে এল বানরটা। টারকজকে দেখতে পেল না। দেখলে চেঁচামেচি শুরু করত। নেমে এসে টকারের কাঁধে চড়ল আবার।

একটু পর পরই টারকজের গন্ধ মেশানো এক টুকরো কাপড় ধরা হয় রাফির নাকের সামনে। সেই গন্ধের মালিক কোথায় আছে খুঁজে বের করতে বলা হয় তাকে।

'এভাবে হবে না, বুঝলে,' কিশোর বলল। 'সারা গাঁয়ে তো আর চিতার গন্ধ ছড়িয়ে নেই যে বের করবে। সন্দেহজনক জায়গাগুলোতে গিয়েই কেবল ওকে খুঁজতে বলা উচিত।'

'ওর ভুল হচ্ছে না তো?' মুসা বলল।

'রাফি করবে ভুল?' রেগে উঠল জিনা। 'ও কক্ষনো ভুল করে না।'

বিগ হোলোর কোন জায়গা বাদ দিল না ওরা। লিটল হোলোরও অর্ধেক খোঁজা শেষ। নিরাশা আবার চেপে ধরতে আরম্ভ করেছে টকারকে।

'পাব তো?'

'অত তাড়াতাড়িই আশা ছাড়ার কিছু নেই,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। 'নিশ্চয় পাব।'

খোঁজাখুঁজি চলতে থাকল।

পুরানো একটা গোলাবাড়ির দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল রাফি। পাল্লার নিচের দিকের কাঠ পচে নরম হয়ে গেছে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে শুঁকতে শুঁকতে আচমকা গরগর শুরু করল সে। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল।

'খাইছে!' চাপা গলায় বলল মুসা। 'পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে!'

ছোট একটা খামারের মধ্যে ঘরটা। খানিক দূরে উঠানে করকর, ক্যাঁককোঁক করছে অনেকগুলো মুরগী। শস্য ছিটিয়ে দিচ্ছে এক মহিলা। সেগুলো খাওয়ার জন্যে তার চারপাশে ঘুরঘুর করছে মুরগীগুলো।

মুরগীর ডাকাডাকি ছাড়িয়ে একটা ঘরের ওপাশ থেকে শোনা গেল একটা

বিরক্তি মেশানো কর্কশ পুরুষকণ্ঠ, 'ধরে ফেলেছিলাম আরেকটু হলেই। পালাল। কোথায় যে লুকাল বুঝতে পারলাম না। ব্যাটা। ধরতে পারলে আজ মুরগী চুরি বের করতাম।'

'একটা কুত্তা দরকার আমাদের, টম,' চাষীর স্ত্রী বলল। 'সোবারটা মরার পর থেকেই তো চোরের উৎপাত। আজ এটা, কাল সেটা, নিয়েই তো চলেছে। তোমাকে কত বলছি একটা কুত্তা আনতে, কানই দাও না।'

ফিসফিস করে টকার বলল, 'শুনলে? মুরগী চুরি হচ্ছে। নিশ্চয় কিডন্যাপাররা। টারকজকে খাওয়ানোর জন্যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

'কিন্তু খাওয়ানোর তো কথা নয়,' রবিন বলল। 'ওরা বলেছে ওকে না খাইয়ে রাখবে, যাতে বুনো হয়ে ওঠে। জিনা, রাফিটা কিসের গন্ধ পেয়েছে কিছু বুঝতে পারছ?'

রাফির নাকে হাত রেখে ওকে চুপ করতে বলল জিনা। যা দেখে উত্তেজিত হয়েছে সেটাকে খুঁজে বের করতে বলল।

নির্দেশ পেয়ে পাল্লার নিচের কাঠ আঁচড়াতে শুরু করল রাফি। কয়েকটা আঁচড় দিয়েই তলার মাটি খুঁড়তে লাগল।

'সাবধান রাফি,' মুসা বলল, 'কিডন্যাপাররা ভেতরে থাকতে পারে।'

'কিংবা টারকজ,' বলল টকার।

'ওরা নেই,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর। 'এখানে কিডন্যাপাররা থাকতে পারবে না। টারকজকেও লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। দেখছ না, কাছেই মানুষ থাকে। অন্য কিছু আছে।'

'সেটাই দেখব,' মুসা বলল। 'কাছাকাছি তো কাউকে দেখছি না। দরজা ভেঙে ঢুকব নাকি?'

বাধা দিতে গেল জিনা, 'না না, চাষীরা কাছাকাছিই আছে। শব্দ শুনে চলে এলে...'

কিন্তু জিনার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজার গায়ে কাঁধ লাগিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করল মুসা। কিশোর তাকিয়ে রইল পথের দিকে। কেউ আসছে কিনা দেখছে। এলে হুঁশিয়ার করে দেবে মুসাকে।

পুরানো পাল্লা। কজাগুলোও মরচে পড়া, পুরানো। প্রচণ্ড চাপ সইতে না পেরে মড়মড় করে খুলে এল কাঠ থেকে। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভেতরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মুসা। স্তূপ করে রাখা আছে বাগান করার আর চাষের যন্ত্রপাতি। ওগুলোর ওপরে পড়ে যে জখম হলো না সে এটাই আশ্চর্য।

দরজা ভাঙার আর যন্ত্রপাতি পড়ার বিকট শব্দ হলো। ওদের মনে হলো, পুরো গাঁয়ের লোক শুনে ফেলেছে এই শব্দ।

'মুসা, ব্যথা পেয়েছ!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

'না...ঠিকই আছে...'

প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করে দাঁত খিঁচিয়ে ঘরের কোণে ছুটে গেল রাফি।

ওকে ধরার জন্যে ছুটে এল জিনা। দেখে, ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে আছে

একটা লোক। মানুষের এত রোমশ শরীর আর দেখেনি সে। লম্বা লম্বা চুল, গোঁফ-দাড়ি, যেন একটা বনমানুষ। ভয়ে কাঁপছে। দু-হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে কি যেন লুকানোর চেষ্টা করছে।

পারল না। দেখে ফেলল গোয়েন্দারা। দুটো মুরগী। গলা মুচড়ে মেরে ফেলেছে। যাতে কঁক কঁক করতে না পারে।

'বাহ্, তাহলে এই কাণ্ড,' মুচকি হাসল মুসা। হাত ডলছে। ছড়ে গেছে জায়গাটায়।

'খবরদার, নড়বে না,' লোকটাকে ধমক দিয়ে বলল জিনা। 'গলা কামড়ে ধরতে বলব কিন্তু কুকুরটাকে।'

'সরাও…সরাও ওকে!' ককিয়ে উঠল লোকটা। ভীষণ ভয় পাচ্ছে রাফিকে। 'কামড়ে দেবে তো!'

গোলাঘরের বাইরে ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। এত গণ্ডগোল কিসের দেখতে এসেছে চাষী আর তার এক সহকারী।

'এই, কি হচ্ছে?' চাষী বলল। 'ও, এই ব্যাপার। এখানেই এসে লুকিয়েছে তাহলে। তাই তো বলি, গেল কোথায়? ভাবতেই পারিনি এত কাছে এসে লুকাবে।'

'আমার কুকুরটা ওর গন্ধ পেয়েছে,' গর্বের সঙ্গে বলল জিনা। 'নইলে কি আর আমরাই ধরতে পারতাম। নিন, ধরুন। নিয়ে গিয়ে পুলিশে দিন। রাফি, হয়েছে। চুপ কর।'

জিনার দিকে তাকিয়ে হাসল চাষী। তার সহকারী গিয়ে চোরটার কলার চেপে ধরল। জবুথবু হয়ে গেছে লোকটা। একেবারেই ছিঁচকে চোর।

'একটা কাজের কাজই করে দিলে তোমরা,' গোয়েন্দাদের প্রশংসা করতে লাগল চাষী। 'প্রায়ই মুরগী চুরি হচ্ছিল। কোনমতেই ধরতে পারছিলাম না। চোরের পেছনে সারাদিন তো আর পাহারা দিয়ে বেড়াতে পারি না। আরও হাজারটা কাজ থাকে। এই খানিক আগেও তাড়া করেছিলাম। পালাল। এখানে এসে যে ঢুকে বসে থাকবে কল্পনাই করিনি।'

ওদেরকে অনেক ধন্যবাদ দিল চাষী।

সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। বলল, 'একটা চিতাকে খুঁজছি আমরা। আপনি কি দেখেছেন?'

'চিতা!' অবাক হলো লোকটা। তারপর হেসে উঠল, 'সে তো চিড়িয়াখানায় থাকে। গাঁয়ে নতুন একটা চিড়িয়াখানা হয়েছে। যাও। ওখানে গেলে পেয়ে যাবে।'

'আমাদেরটা পোষা।'

অবাক চোখে কিশোরের দিকে তাকাল চাষী। 'তাই নাকি? তাহলে আর বলতে পারলাম না। তবে জন্তুজানোয়ারের ব্যাপারে কিছু বলা যায় না। হয়তো চিড়িয়াখানায় সঙ্গীর দেখা পেয়েছে। রয়ে গেছে ওখানে। এমন হতে পারে না?'

'তা পারে।'

আর কথা বাড়াল না কিশোর।

চোরটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল চাষী আর তার সহকারী। গোলাঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গোয়েন্দারা।

'নাহ্, কোন কাজই হচ্ছে না,' রবিন বলল। 'সবই কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে।'

'চলো না চিড়িয়াখানাতেই যাই,' মুসা বলল।

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'চিড়িয়াখানা?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ। একটা কথা নিশ্চয় মানবে, টারকজকে যে লোক চুরি করেছে সে জানোয়ার সামলাতে জানে। টকার, কদ্দিন হলো চিড়িয়াখানাটা বসেছে?'

'এই বছরখানেক।'

'তাহলে তো হয়েই গেল,' সমাধান দিয়ে দিল মুসা। 'কারস আংকেল যে বিজ্ঞানী এটা জানার জন্যে প্রচুর সময়। চিড়িয়াখানার মালিকও কিডন্যাপার হতে পারে। কিংবা কীপার, দেখাশোনার ভার যাদের ওপর তারা।'

'হুঁম,' মাথা দোলাল কিশোর, 'মাঝে মাঝে সত্যিই বুদ্ধি খুলে যায় তোমার। ওখানকার লোক হলে চিতাটাকে লুকিয়ে রাখাও সহজ। কোন একটা খাঁচায় রেখে দেবে। লোকে কিচ্ছু সন্দেহ করতে পারবে না।' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মুখ। 'মুসা, ভাল কথা মনে করেছ! চলো, চিড়িয়াখানাতেই যাই।'

রওনা হতে যাবে সবাই এই সময় বাধা দিল রবিন, 'শোনো, একটা ব্যাপার ভাবনি। কিডন্যাপাররা চিড়িয়াখানার লোক হলে টকারকে চিনে ফেলবে। সন্দেহ করতে পারে।'

'তাই তো! আজ আমার হলো কি? একটা ভাবনাও যদি ঠিকমত ভাবতে পারতাম,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর। 'এখন যাওয়া উচিত হবে না। রাতে যাব। আকাশ পরিষ্কারই আছে। বৃষ্টিটিষ্টি হবে বলে মনে হয় না। খাঁচাগুলোকে ঘরে নেয়ার প্রয়োজন মনে করবে না কীপাররা। চিতাটা থাকলে সহজেই খুঁজে বের করে ফেলব।'

নয়

রাতে খাওয়ার পর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকলেন প্রফেসর কারসওয়েল। টুকটাক হাতের কাজ সেরে ঘুমাতে গেল ডোরা। সুযোগ বুঝে চুপি চুপি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা।

চিড়িয়াখানায় পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না।

একটা খোলা মাঠে বসানো হয়েছে চিড়িয়াখানা। কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। টিকেট করে ঢুকতে হয়। তাই নির্দিষ্ট প্রবেশ পথ ছাড়া যাতে অন্য কোনখান দিয়ে লোক ঢুকতে না পারে সেদিকে নজর রেখেছে কর্তৃপক্ষ। তবু খুঁজতে খুঁজতে বেড়ায় একটা ফোকর পেয়ে গেল ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে সে পথে ভেতরে ঢোকা সম্ভব।

ঠিক হলো, বাইরে থেকে পাহারা দেবে একজন। কাউকে আসতে দেখলে ভেতরে যারা যাবে তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেবে। রবিন থাকবে। তার সঙ্গে থাকবে রাফি।

এক এক করে বেড়ার ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল অন্যেরা। অন্য পাশে এসে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কেউ আছে কিনা। চাঁদের আলো আছে। থাকলে দেখা যাবে।

'কে যেন আছে,' ফিসফিস করে বলল টকার। 'ডানে।'

আছে ঠিকই, তবে মানুষ নয়। ছোট্ট একটা জায়গা ঘিরে খোয়াড় বানিয়ে তার ভেতরে রাখা হয়েছে দুটো উটপাখি। ঘুমিয়ে আছে পাখি দুটো। নড়ল না।

ডান দিকেই কিছু দূরে কয়েকটা খাঁচা চোখে পড়ল। সেদিকে হাত তুলে কিশোর বলল, 'জানোয়ারের খাঁচা। এগোও।'

সাবধানে পা টিপে টিপে এগোল চারজনে। শব্দ না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখল।

প্রথম খাঁচাটায় ঘুমিয়ে আছে দুটো সিংহী ও একটা সিংহ। মানুষের সাড়া পেল কিনা বোঝা গেল না। কারণ একটা গোঁফও নাড়ল না।

দ্বিতীয় খাঁচাটার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল টকার। একটা চিতা। ফিসফিসিয়ে ডাকল সে, 'টারকজ! টারকজ! উঠে আয়!'

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল চিতাটা। এগিয়ে এসে খাঁচার শিক ঘেঁষে দাঁড়াল। টকার তাকে কৌতূহলী করেছে। কিন্তু চিনতে পারার কোন লক্ষণ দেখাল না।

ভাল করে দেখল জানোয়ারটাকে টকার। না, এটা টারকজ নয়।

'তুমি শিওর?' হতাশ হয়ে বলল মুসা।

'হ্যাঁ। টারকজের নাকের পাশে খানিকটা জায়গার লোম সাদা। দূর, কোন লাভ হলো না এসে!'

'এখানে নেই, এ ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল, এই আরকি,' জিনা বলল।

'অনেক জায়গা এখনও খোঁজা বাকি,' বলল কিশোর। 'পুরোটায় খুঁজে দেখব।'

ঘুরতে লাগল ওরা। আর একটা চিতাও নেই কোন খাঁচায়। অহেতুক সময় নষ্ট মনে হলো। নিরাশ হয়ে ঘুরে দাঁড়াল, বেরোনোর জন্যে। কিন্তু নটির যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

অস্থির হয়ে উঠেছে ছোট্ট বানরটা। হয়েছে অনেকক্ষণ থেকেই। কিন্তু চিতা খোঁজায় এতই মশগুল ছিল টকার, খেয়ালই করেনি এতক্ষণ।

একটা খাঁচার সামনে আসতে হঠাৎ এক লাফ দিয়ে টকারের কাঁধ থেকে গিয়ে খাঁচার শিক ধরে ঝুলে পড়ল নটি। তীক্ষ্ণ কিচিরমিচির শুরু করল। ভেতরে আরও অনেক বানর। একটা নটিরই প্রজাতি। আকারে কিছুটা বড়।

'এই নটি, আয়। আয় বলছি।'

কিন্তু টকারের ডাক যেন কানেই ঢুকল না বানরটার। শিকের গায়ে নাক চেপে ধরে হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। তার চেহারার বানরটাকে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকতে লাগল।

ভেতরের বানরটাও আগ্রহী হলো। এগিয়ে এল কাছে।

কিচিরমিচির করে প্রচুর কথা চালাচালি হলো দুটোতে।

'চলো, যাই,' তাড়া দিল মুসা। 'এখানে দেরি করে লাভ নেই। টকার, ধরো, বানরটাকে ধরে আনো।'

কিন্তু জাতে ওটা বানর। ধরে আনো বললেই তো আর আনা যায় না। টকার ধরতে যাওয়ার আগেই শিকের ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে নটি। দেহটাকে মুচড়ে মুচড়ে ঢুকে গেল ভেতরে। শরীরটা ছোট বলেই পারল। তার সমান হলে ভেতরের বানরগুলোও এতদিনে খাঁচায় আটকে থাকত না, বেরিয়ে যেত বাইরে।

ভেতরে ডাল সহ মরা একটা গাছের কাণ্ড পুঁতে দেয়া হয়েছে মাটিতে। তাতে ঝোলাঝুলি শুরু করল বানরদুটো। খেলা জুড়ল। তাড়া করে বেড়াতে লাগল একে অন্যকে।

ধরা পড়ার ভয়ে জোরে চিৎকারও করতে পারছে না টকার। ফিসফিস করে যতটা সম্ভব ডাকতে লাগল নটিকে।

কিন্তু খেলা পেয়ে গেছে বানর। মনিবের ডাক কানেই তুলল না। চেঁচামেচিতে জেগে উঠল বাকি বানরগুলোও। মজা পেয়ে ওরাও খেলা জুড়ে দিল রাত দুপুরে। সেই সঙ্গে চিৎকার। নীরব রাতে বহু দূর থেকে শোনা যাবে ওগুলোর চেঁচামেচি।

ঘাবড়ে গিয়ে চারপাশে তাকাতে শুরু করল কিশোর। তাগাদা দিল, 'টকার, জলদি বের করো ওটাকে! না পারলে থাক। কাল এসে নিয়ে যাব...'

কিন্তু বলতে দেরি করে ফেলেছে। আরও আগেই যাওয়া উচিত ছিল। বানরের হাঁকডাকে জেগে গেছে দুজন কীপার। কি হয়েছে দেখতে আসছে। দুজনের হাতেই টর্চ। একজনের হাতে একটা শটগান।

তীব্র আলো এসে পড়ল গোয়েন্দাদের গায়ে।

'আরি, পোলাপানগুলো এখানে কি করছে?' বলল একজন।

'বানর চুরি করতে এল নাকি?' অন্যজনের প্রশ্ন।

ব্যস, গেল রেগে জিনা। 'দেখুন, বাজে কথা বলবেন না! আমরা চোর নই। রাত দুপুরে আর কাজ পেলাম না, বানর চুরি করতে এসেছি!' গজগজ করতে লাগল সে।

'তাহলে কি জন্যে এসেছ?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কীপার।

'আমরা চোর নই,' মুসা বলল।

'তাহলে এসেছ কেন?' ধমক দিয়ে বলল অন্যজন।

'ওই ওটা...ওই বানরটাকে ধরার চেষ্টা করছি...' ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গিয়ে আরও গোল পাকিয়ে দিল মুসা।

'তাহলে স্বীকার করছ বানর চুরি করতে এসেছ?'

মুসার হাত চেপে ধরল লোকটা।

'চলো, পুলিশের কাছে। যা বলার ওদেরকে বলো। কাণ্ড দেখো! বানরও আবার চুরি করে!'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। বলল, 'দেখুন, আপনারা বুঝতে

পারছেন না, আপনাদের কোন জানোয়ার চুরি করতে আসিনি আমরা। ওই বানরটা আমাদের। ভেতরে ঢুকে গেছে। ডাকাডাকি করছি, তবু বেরোচ্ছে না। সত্যি বলছি।'

কিশোরের কথা বিশ্বাস করল না লোকগুলো। টিটকারির সুরে একজন বলল, 'তাই নাকি? তাহলে ডাকো না, ভাল করে ডাকো। তোমাদের হলে তো বেরিয়েই আসবে।'

মরিয়া হয়ে টকার বলল, 'বললাম না, শুনছে না। কত ডাকাডাকি করলাম, তাকায়ই না। নতুন বন্ধু পেয়েছে তো···ওই দেখুন, কেমন গলা জড়াজড়ি করে আছে।'

দ্বিতীয় লোকটার কি মনে হলো কে জানে। বলল, 'অত করে যখন বলছে, দেখাই যাক। বের করি বানরদুটোকে। প্রমাণ হয়ে যাবে।'

একজনকে পাহারায় রেখে চলে গেল অন্য লোকটা। দুটো শেকল নিয়ে এল। এক মাথায় চামড়ার কলার লাগানো। খাঁচার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বানর দুটোকে ধরে কলার পরিয়ে দিল গলায়। শেকল ধরে টানতে টানতে বের করে আনল। টকারকে বলল, 'ডাকো তোমার বানরটাকে।'

খেলার মাঝে এভাবে বাধা পড়ায় বিরক্ত হয়েছে অন্য বানরটা। নটি পেয়েছে ভয়। এরকম পরিস্থিতিতে আর পড়েনি সে। অচেনা কোন লোক তার গলায় শেকল পরায়নি আর। টকারকে ডাকতে হলো না। তার আগেই ছুটে গেল তার দিকে।

এগিয়ে এল টকার। তার কাঁধে চড়ে বসল নটি।

অন্য বানরটা মনে করল এটাও আরেকটা খেলা। সে-ও গিয়ে চড়ল টকারের কাঁধে।

হেসে উঠল মুসা।

তার দেখাদেখি হাসতে শুরু করল কীপারেরাও।

কিন্তু কিশোর আর জিনা গম্ভীর। আঁচ করে ফেলেছে বিপদ কাটেনি এখনও। প্রমাণিত হয়নি যে নটির মালিক টকার।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে একজন কীপার বলল, 'এবার কি বলবে? দুটো বানরই তোমাদের?'

'না,' জবাব দিল টকার। 'এই ছোট বানরটা আমার।'

'প্রমাণ তো হলো না।'

চুপ হয়ে গেল টকার। বুঝতে পারছে না আর কি ভাবে প্রমাণ করবে।

কিশোর বলল, 'ডাকার আগেই ছোটটাকে ওর কাঁধে উঠতে তো দেখলেন। দ্বিতীয় বানরটা দেখাদেখি গিয়ে উঠেছে। এক কাজ করতে পারেন। আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে খাঁচায় ক'টা বানর ছিল। গুণে দেখুন। যদি সমান সমান হয়, তাহলে বুঝবেন আমরা মিথ্যে কথা বলছি। আর একটা বেশি হলে তো হলোই। ওটা আমাদের।'

কথাটা মনে ধরল কীপারদের। গুণে দেখল, খাঁচায় আঠারোটা বানর রয়েছে। থাকার কথা উনিশটা। বাইরের দুটোকে নিয়ে হয় বিশটা। একটা বেশি। তার

মানে ঠিকই বলছে ছেলেগুলো।

এবার মেনে নিল ওরা।

কড়া গলায় একজন জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে এখানে ঢুকলে কেন?'

এই প্রশ্নটা আসবেই জানত কিশোর, তৈরি ছিল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'রাতের বেলা জন্তুজানোয়ারেরা কি করে দেখার খুব কৌতূহল হচ্ছিল। বলে ঢুকতে চাইলে তো ঢুকতে দিতেন না, তাই বেড়ার একটা ফোকর দিয়ে চুরি করে ঢুকেছি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। ছেড়ে দেবে কি দেবে না সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন। কিন্তু কোন অপরাধ প্রমাণ করতে পারেনি বলেই বোধহয় শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়াই ঠিক করল। নটির গলা থেকে কলার খুলে নিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এবারের মত মাফ করে দিলাম। আর যদি এভাবে এখানে দেখি, ভাল হবে না। যাও।'

এই লোকটার কথাবার্তা শুরু থেকেই পছন্দ হচ্ছিল না জিনার। রেগে উঠতে যাচ্ছিল। সেটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরল কিশোর। লোকগুলোকে ধন্যবাদ দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে সরে এল সেখান থেকে।

বাইরে বেরিয়ে দেখল, ওদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে রবিন। দেখেই বলে উঠল, 'এত দেরি করলে? আমি তো ভাবলাম বিপদেই পড়েছ। রাফিকে পাঠাব ভাবছিলাম।'

'বিপদেই পড়েছিলাম।' কি হয়েছিল জানাল তাকে মুসা।

'হুঁ,' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'কোন ফন্দিই তো কাজে লাগছে না। কি করব এবার? টারকজকে পাওয়ার কোন পথ তো দেখছি না আর।'

'বুদ্ধি একটা নিশ্চয় বেরিয়ে যাবে,' অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় কিশোর। 'কালও তল্লাশি চালিয়ে যাব। না পেলে তখন অন্য বুদ্ধি করা যাবে।'

দশ

বুধবার দিন বিকেলে বাড়ির পেছনের মাঠটায় এসে বসল গোয়েন্দারা। জরুরী আলোচনা আছে। সবাই গম্ভীর। যেখানে যেখানে খোঁজার কথা, সমস্ত জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও টারকজের কোন চিহ্নই পায়নি ওরা।

মাঠের ধার দিয়ে একটা নালা বইছে। তার কিনারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে লম্বা ঘাসে মুখ ঢেকেছে টকার। ধরা গলায় বলল, 'কোন দিন···কোন দিন আর ওকে খুঁজে পাব না আমরা। চিতার মত একটা জানোয়ারকে লুকিয়ে রাখা সোজা কথা নয়। তার মানে···' কথাটা শেষ করতে পারল না সে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

একটা ঘাসের ডগা দাঁতে কাটছিল কিশোর। ছুঁড়ে ফেলল।

'দেখো টকার, বলেছিলাম, যদি এভাবে খুঁজে না পাই অন্য বুদ্ধি করব। কালকের মধ্যে টারকজকে পাওয়া না গেলে সেটাই করতে হবে।'

'তার মানে একটা ফন্দি তুমি করেই রেখেছিলে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। নিজে থেকে না বললে কোন কথাই কিশোরের পেট থেকে বের করা যায় না

সময় না হলে বলেও না। 'তো এখন কি সময় হয়েছে? বলবে বুদ্ধিটা কি করেছ?'

দুই হাঁটু জড়ো করে বুকের কাছে টেনে নিল কিশোর। থুঁতনি রাখল তার ওপর। এক এক করে তাকাল সবার মুখের দিকে।

সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এমনকি রাফিও। যেন বুঝে ফেলেছ গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলবে এখন গোয়েন্দাপ্রধান।

'আমাদের ভাগ্য ভাল,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল কিশোর, 'বিগ হোলোতে আমাদের ইচ্ছে মত কাজ করতে পারছি আমরা। একেবারে স্বাধীন। বড়রা নাক গলাতে আসছে না। সেই সুযোগটাই নেব। কাল দিনের বেলা তো বটেই, দরকার হলে সারা রাত নজর রাখব। ডোরার ধারণা টারকজকে মেরে ফেলা হয়েছে। ওটার পিছু নিয়ে যে কিডন্যাপারদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা, একথা কল্পনাও করবে না। আর কারস আংকেল তো এতদিনে নিশ্চয় চিতাটার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। কাজেই তদন্ত চালাতে কোন বাধা নেই আমাদের।'

চোখমুখ বিকৃত করে ফেলল মুসা। 'সেইটাই তো করছি আমরা। আর কি করব?'

'করছি। অন্ধকারে থেকে। কোন সূত্র নেই কিছু নেই। অন্ধের মত চারদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। কাল এর সমাপ্তি ঘটাতে হবে।'

কি করতে চায় কিশোর, খুলে বলার জন্যে চাপাচাপি শুরু করল সবাই। কোনখান থেকে কিভাবে নজর রাখবে?

ঘড়ি দেখল কিশোর। উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এসো আমার সঙ্গে। সাইকেল নিয়ে গেলে ডিনারের আগেই ফিরে আসতে পারব। সেখানে গিয়ে তারপর বলব সব কথা।'

'সেই জায়গাটা কোথায়? কোনখানে আমাদের নিয়ে যাচ্ছ?'

'লিটল হোলো। সেই জায়গাটায় যেখানে সৈকতে নেমেছিল কিডন্যাপাররা। কুত্তাটাকে পাঠিয়েছিল। এসো, সময়মত ফিরতে চাইলে তাড়াহুড়া করা দরকার।'

জায়গাটা বেশি দূরে নয়। সাইকেলে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

'জায়গা জায়গা করতে ভাল লাগে না। ঠিকমত বোঝানোও যায় না,' রবিন বলল। 'এর একটা নাম দেয়া দরকার।'

'ঠিক বলেছ।' সঙ্গে সঙ্গে নাম বলে দিল টকার, 'নাম রাখা হোক টারকজ বীচ।'

সবাই সমর্থন করল তাকে।

উপকূলের পাহাড়ী পথ ধরে টারকজ বীচের পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা। আরও দুটো ছোট ছোট সৈকত পেরিয়ে পৌঁছল লিটল হোলোতে।

সাইকেল থেকে নেমে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। গাঁয়ের লোকেরা মূলত মৎস্যজীবী। পুরুষেরা সব মাছ ধরতে বেরিয়ে যায়। চুপচাপই থাকে সাধারণত গ্রামটা। নীরব। কিন্তু আজ যেন মৌচাকের মত ব্যস্ততা সেখানে। মৌমাছিদের মতই গুঞ্জন করে চলেছে। উঁচু মইয়ে চড়ে রাস্তার দুই ধারে নিশান লাগাচ্ছে পুরুষেরা। আরও নানা ভাবে সাজাচ্ছে। বন্দরের দেয়ালে দেয়ালে

রঙিন জাল ছড়িয়ে দিয়ে সাজাচ্ছে মেয়েরা। কিছু জেলে তাদের নৌকার পরিচর্যা করছে। রঙ করছে। অলঙ্করণ করছে।

'ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'ও জানো না?' জ্ঞান দেয়ার সুযোগ পেয়ে গেছে বইয়ের পোকা রবিন। 'গাঁয়ে ফেটি উৎসব হবে। মূল অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে নৌকাবাইচ। শুরু হবে কাল দুপুরের পর থেকে, রাত পর্যন্ত চলবে।' বই পড়ে এসব কথা জেনেছে সে।

কিশোরও জানে এই উৎসবটার কথা। বলল, 'হ্যাঁ, অনেক লোক আসবে যাবে। নৌকার ভিড় হবে। নিশান ওড়াবে। আলো জ্বালাবে। একের পর এক অনুষ্ঠান হবে। শেষ হবে বাজি পোড়ানো দিয়ে। প্রচুর হই হট্টগোল হবে। এই সুযোগটাই কাজে লাগাব আমরা।'

'আমি এখনও বুঝলাম না কি করতে চাও তুমি?' মুসা বলল।

'কালকে পর্যন্ত সময় দিয়েছে টকারকে কিডন্যাপাররা, ভুলে গেছ?'

'সে তো মনেই আছে,' টকার বলল। 'কিন্তু তুমি কি করতে চাও কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি, আর যা-ই করতে বলো, করব। কিন্তু মরে গেলেও আব্বার ফরমুলা চুরি করে এনে দেব না ব্যাটাদের। টারকজ কেন, কারও জন্যেই না।'

গলা কেঁপে উঠল তার।

টকারের কাঁধে আলতো চাপড় দিল কিশোর। 'শান্ত হও।'

সবাইকে নিয়ে জেটির একধারে একটা নিরালা জায়গায় চলে এল সে। যাতে আড়ি পেতে কেউ তাদের আলোচনা শুনে ফেলতে না পারে। বলল, 'সহজ একটা বুদ্ধি করেছি। টকার, কাল বিকেলে তুমি চলে যাবে বনের মধ্যের খোলা জায়গাটায়। গাছের গুঁড়িতে নিশ্চয় খাঁচাটা রেখে দেবে কিডন্যাপাররা। আশা করবে তুমি তাতে ফরমুলাটা রাখবে। অবশ্যই তুমি তা রাখবে না। তার বদলে রাখবে একটা মেসেজ···'

'কি মেসেজ?'

'একটা নোট। তাতে লিখে দেবে ওদের কথামত কাজ করতে তুমি এক পায়ে খাড়া। ফরমুলাটা হাতানোর চেষ্টা করছ। কিন্তু সারাক্ষণ তোমার আব্বা ল্যাবরেটরিতে থাকেন বলে পারছ না। সুযোগের অপেক্ষায় আছ। তোমাকে যেন আরও কিছুটা সময় দেয় ওরা। ফরমুলাটা পেলে তোমার ঘরের জানালার বাইরে একটা স্কার্ফ ঝুলিয়ে দেবে। তাতে ওরা বুঝতে পারবে ওটা তুমি···'

গুঙিয়ে উঠল টকার, 'কক্ষনো রাজি হবে না ওরা!'

'না হলে নেই। ওদের রাজি হওয়ার জন্যে কোন মাথাব্যথাও নেই আমার। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হলেই হলো। মেসেজ নিয়ে তুমি চলে যাবে বনের ভেতর···'

'তা নাহয় গেলাম। মেসেজটা খাঁচায় রাখার পর কি করব? নজর রাখব?'

'সোজা বাড়ি চলে যাবে। আর কিচ্ছু করার চেষ্টা করবে না। ফিরেও তাকাবে না। যা বললাম, সোজা বাড়ি। মনে থাকবে?'

'থাকবে। তোমরা কি করবে?'

'আসল কাজটাই আমরা করব। আমরা থাকব এখানে। অনেক আগেই চলে আসব। টারকজ্র বীচে গিয়ে নজর রাখব, যেখান থেকে কুত্তাটাকে পাঠিয়েছিল কিডন্যাপাররা।'

সবার আগে বুঝতে পারল রবিন। তারপর জিনা। মুসা আর টকারের বুঝতে একটু সময় লাগল। কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বড় বড় হয়ে গেল সবার চোখ।

'খাইছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আর বলতে হবে না, বুঝে গেছি! কিডন্যাপারদের আসতে দেখব আমরা, কুত্তাটাকে পাঠাবে খাঁচাটা আনতে, তারপর...'

'তার আর পর নেই,' খুশি হতে পারল না জিনা। 'সৈকতে লুকানোর কোন জায়গা নেই, ভুলে গেছ? কোথায় বসে দেখব? দেখতে পারলেও পিছু নেব কি ভাবে? ওরা নৌকা নিয়ে আসবে, কুত্তা পাঠাবে, মেসেজটা নেবে, তারপর আবার নৌকা নিয়ে চলে যাবে। আমাদের আছে সাইকেল। সাগরের ওপর দিয়ে সাইকেল চলে না।'

'তাই তো!' যতটা খুশি হয়েছিল ততটাই মুষড়ে পড়ল আবার টকার। 'একথাটা নিশ্চয় তুমি ভাবনি, কিশোর?'

সামান্যতম মলিন হলো না কিশোর পাশার মুখ। মুচকি হাসল।

'ভাবব না কেন?' বলল সে। 'সবই ভেবেছি। ওরা আসবে জলপথে, আমরাও পিছু নেব জলপথে। লুকাবও জলযানে। ঠিক আছে?'

জবাব দিল না কেউ। হাঁ করে তাকিয়ে কিশোরের পরবর্তী কথা শোনার অপেক্ষা করছে।

'ছোট একটা মোটরবোট ভাড়া করব আমরা। টকারের নৌকাটা ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু ওটার গতি বাড়ানো যাবে না। একটা মোটরবোট হলে লুকিয়ে থাকা থেকে শুরু করে পিছু নেয়া, সব করতে পারব। উপকূলের যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারব। কেউ কিছু সন্দেহও করবে না। ভাববে, উৎসবের দিনে আমরাও একটু আনন্দ করছি। নৌকা ভাড়া করে অনেকেই করে সেদিন। আর লোকের ভিড়ে আমাদের দিকে নজরও দেবে না কেউ। এত লোকের মধ্যে নিজেদেরকে নিরাপদ ভাববে কিডন্যাপাররাও। সতর্ক থাকার প্রয়োজন বোধ করবে না। কল্পনাই করবে না ওরা, আমরা নজর রেখেছি।'

'চমৎকার!' প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল রবিন, 'আইডিয়াটা সত্যিই চমৎকার!'

এতদিনে একটা পথ পাওয়া গেল। আনন্দে নাচতে শুরু করল টকার। তার সঙ্গে যোগ দিল মুসা। গান ধরল জিনা। হাত তালি দিতে লাগল। রাফি ভাবল, এটা একটা মজার খেলা। আমিই বা বসে থাকি কেন? মুসা আর টকারের পাশে গিয়ে সে-ও লাফাতে শুরু করল।

ব্যাপারটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল কয়েকজন জেলের। কি হয়েছে দেখতে এগোল

ওরা।

গোয়েন্দারা বলল, ওরা পিকনিকে বেরিয়েছে। উৎসবের আগের দিন থেকেই ফুর্তি শুরু করেছে।

ওদের কথা পছন্দ হলো জেলেদের। প্রথমে ওরাও হাততালি দিল। তারপর গলা মেলাল জিনার সঙ্গে। কয়েকজন জেলেনী এগিয়ে এল। এলোমেলো পা ফেলছে টকার আর মুসা। তাদেরকে শিখিয়ে দেয়ার ছুতোয় নিজেরাই নাচতে শুরু করল।

দেখতে দেখতে জমে উঠল চমৎকার একটা নৃত্যানুষ্ঠান।

সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। খাতির করে ফেলল কয়েকজন জেলের সঙ্গে। ভাল একটা মোটরবোটের খোঁজ নিতে লাগল।

ওদের একজনের একটা বোট আছে। তবে একদল ছেলেমেয়ের কাছে ভাড়া দিতে রাজি হলো না প্রথমে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার আস্থা অর্জন করে তাকে বোট দিতে রাজি করিয়ে ফেলল কথা আর অভিনয়ের ওস্তাদ কিশোর পাশা।

বোটের মালিক মধ্যবয়েসী। নাম হার্বার্ট জিম কলিনস। কিন্তু বুড়ো জিম নামেই বেশি পরিচিত। বলল, বোট নিয়ে হাজির থাকবে সে। কিশোররা যেন সময়মত চলে আসে।

আসার সময় মুখ গোমড়া করে ছিল সকলেই। বাড়ি ফেরার সময় এখন ফুরফুরে হয়ে গেছে হৃদয় মন। গান আর থামে না জিনা ও টকারের। সাইকেল চালানোর সময়ও ছেড়ে দিয়েছে গলা।

ওদের ধারণা, নতুন পরিকল্পনায় কাজ হবেই হবে।

এগারো

পরদিন দুপুরের খাওয়ার পর অভিযানে বেরোতে তৈরি হলো গোয়েন্দারা। কি কি করতে হবে আরেকবার ভাল করে টকারকে বুঝিয়ে দিল কিশোর।

'কি করবে মনে আছে তো?' সকাল থেকে এই নিয়ে দশতম বার বলল সে, 'ঠিক দশটায় বনের মাঝের খোলা জায়গাটায় পৌঁছবে। খাঁচার মধ্যে রাখবে মেসেজটা। তারপর একটিবারের জন্যেও পেছনে না তাকিয়ে হাঁটা দেবে। সোজা চলে আসবে বাড়িতে। মনে থাকবে?'

'আরে বাবা থাকবে, থাকবে! কানে শুনি না নাকি আমি? হাঁদা ভেবেছ? এই কয়টা কথা মনে রাখতে না পারলে গাদা গাদা বই মুখস্থ করে আর পরীক্ষা পাস করা লাগত না।'

তার কথায় রাগ করল না কিশোর। মুচকি হাসল।

টকারের রাগের আসল কারণটা বুঝে গেছে সে। একা একা বনে যেতে ইচ্ছে করছে না তার। ওরা থাকবে উৎসবের জায়গায়, মোটরবোট নিয়ে সাগরে বেরোনোরও সম্ভাবনা আছে, আর তাকে একলা বসে থাকতে হবে বাড়িতে, এটা কিছুতে মেনে নিতে পারছে না। এছাড়া আর কিছু করার নেই বলেই কেবল

প্রতিবাদ করছে না।

আকাশ পরিষ্কার। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। রওনা হলো লিটল হোলোতে।

সাইকেল চালাতে চালাতে কিশোর বলল, 'এমন ভঙ্গি করতে হবে আমাদের যেন সাধারণ দর্শক আমরা।'

লিটল হোলোতে পৌঁছে বুড়ো জিমের বাড়িতে সাইকেলগুলো রেখে জেলে পল্লীতে ঘুরতে যাবে ঠিক করল। একেবারেই অকারণে ঘুরবে, তা নয়। ক্ষীণ একটা আশা আছে, পরিচিত কোন গন্ধ নাকে লাগতে পারে রাফিয়ানের।

সুতরাং গাঁয়ে পৌঁছে আগে বুড়ো জিমের সঙ্গে দেখা করল ওরা। আগের দিন মোটর বোটের অ্যাডভান্স করে গিয়েছিল। আজ পুরো ভাড়া মিটিয়ে দিল।

জিম বলল, 'বোটটার নাম শার্ক। জেটিতে বাঁধা পাবে আটটা সময়। নিয়ে নিও। চালাতে পারবে তো?'

ঘাড় কাত করল জিনা, 'নিশ্চয় পারব। এর চেয়ে বড় বোটও চালিয়েছি।'

সাইকেল রেখে বেরোল ওরা। হেঁটে চলল গাঁয়ের পথে। পুরোদমে চলছে উৎসব। সবাই ব্যস্ত। আনন্দে উচ্ছল। সন্দেহজনক কোন মুখ নজরে পড়ল না।

আসল সময়ের এখনও বহু দেরি। সময় কাটানোর জন্যে উৎসবে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। অনেক মজার মজার খেলা আর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। সুইংবোটে চড়ল, এয়ারগান দিয়ে খেলনা হাঁসকে গুলি করল, আরও নানা রকম খেলা খেলল। কোনটাতে হারল, কোনটাতে পুরস্কার জিতল। দারুণ কাটছে সময়।

সাতটা বাজল। হাসতে হাসতে রবিন বলল, 'আমরা কি উৎসব করতেই এসেছি নাকি?'

'না,' গম্ভীর হওয়ার ভান করে মুসা বলল, 'আরও কাজ আছে। তার মধ্যে খাওয়া একটা। আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে কোন স্ন্যাকবারে ঢুকে পড়া দরকার। গায়ের শক্তি বজায় রাখতে হবে তো। কিডন্যাপাররা এলে কি হবে বলা যায় না। সারা রাতে আর কিছুই হয়তো মুখে দিতে পারব না।'

খিদে সবারই পেয়েছে। ঢুকে পড়ল একটা খাবারের দোকানে।

প্লেট ভর্তি করে ভাজা ভেড়ার মাংস আর চিপস খেলো। তারপর চকলেট কেক। সঙ্গে চলল বোতলের পর বোতল লেমোনেড। খাওয়া শেষ হলো স্ট্রবেরি আর ভ্যানিলা আইসক্রীম দিয়ে।

রাফি তো সে সব খেলই, বাড়তি পেল একটা বড় হাড়। দোকানের মালিক মহিলার পছন্দ হয়ে গেছে কুকুরটাকে। কাউন্টারের ওপাশ থেকে তাই হাড়টা ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

ঘড়ি দেখল কিশোর। জানাল, সময় হয়েছে।

'এখান থেকে বেরিয়ে সোজা জেটিতে যাব,' বলল সে।

'এখন পানিতে পড়লে,' রসিকতা করল মুসা, 'পাথরের মত টুপ করে তলিয়ে যাব। কয়েক মন ভারি হয়ে গেছে পেট। শরীরের ভেতর কোথাও আর এক বিন্দু

বাতাস নাই।'

বোটটা সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। আগে দাঁড়টানা নৌকা ছিল। অনেক পুরানো। রঙ আর কিছু মেরামতি করে ছোট একটা নতুন আউটবোর্ড মোটর বসিয়ে নেয়া হয়েছে।

বোটে উঠল ওরা। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই সাগরের ধারে বাস করেছে জিনা। পানির প্রতি একটা বিশেষ টান আছে। যখন তখন সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতার কাটে। ছোটখাট যত রকমের বোট আছে, সব চালাতে পারে। জেলেদের সঙ্গে ভাব করে লঞ্চ আর ফিশিং বোটও চালিয়েছে দু-তিনবার। কাজেই এই বোটটা চালানো তার জন্যে কোন ব্যাপারই নয়।

তেলটেল আছে কিনা প্রথমেই দেখে নিল। ইঞ্জিনটায় হাত বোলাল। তারপর স্টার্টারের দড়ি ধরে দিল টান। একটানেই স্টার্ট হয়ে গেল। সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। পছন্দ হয়েছে। নৌকার বডিটা যেমনই হোক, ইঞ্জিনটা চমৎকার।

গীয়ার দিতেই কেঁপে উঠল বোট। পিছিয়ে জেটি থেকে বের করে আনল জিনা। নাক ঘুরিয়ে স্পীড দিতেই খেপা ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ওটা। গতি কমিয়ে দিল সে। আশেপাশে জলযানের অভাব নেই। বেখেয়াল হলে ধাক্কা লেগে যেতে পারে। ঝুঁকি নেয়া উচিত না। অন্যান্য নৌকার ফাঁকফোকর দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে এগোল।

সারি দিয়ে ঘাটে নোঙর করে রাখা আছে অসংখ্য নৌকা। রঙিন নিশানে সাজানো।

একটু পরেই ঘাট থেকে খোলা সাগরের দিকে রওনা দিল সাজানো নৌকাগুলো। উঁচু পর্দায় মিউজিক বাজছে। বাইচ শুরু হতে দেরি নেই।

শার্ককেও রঙিন নিশান দিয়ে সাজানো হয়েছে। বাতাসে উড়ছে সেগুলো। ওদেরই মত আরও অনেকে নৌকা নিয়ে বেরিয়েছে যারা বাইচে অংশ নেবে না। প্রচুর লোক আসছে যাচ্ছে। সুতরাং নিরাপদেই টারকজ বীচে পৌঁছে গেল ওরা, কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে।

ওখানে যে খাঁড়িটা আছে তার মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে দিতে গেল জিনা।

বাধা দিল কিশোর, 'বাইরেই থাকো। এখানে নোঙর ফেলব। সৈকতটাও চোখে পড়বে, সাগরেরও তিন দিকই দেখতে পাব।'

মরচে পড়া পুরানো একটা নোঙর আছে বোটে। সেটা তুলে নিয়ে পানিতে ফেলল মুসা। ঘষা খেতে খেতে নেমে গেল শেকল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল জিনা। ছোট ছোট ঢেউয়ে আলতো দোল খেতে থাকল শার্ক।

অন্ধকারে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

সময় খুব দ্রুত কেটে যেতে লাগল। লিটল হোলো বন্দরের আলো চোখে পড়ছে। বাজনাও কানে আসছে। ওদের সামনে দিয়ে নৌকার আসা-যাওয়া চলছেই। প্রতিবারেই মনে হচ্ছে এই বুঝি ওদের নৌকাটা এল, যেটার জন্যে বসে

আছে।

কিন্তু বার বার ওদের হতাশ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে নৌকাগুলো। থামছেও না, এদিকে মুখও ঘোরাচ্ছে না। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

কোন দিক দিয়ে যে সময় পার হয়ে গেল টেরই পেল না ওরা। লিটল হোলোর গির্জার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজার ঘণ্টা শোনা গেল।

বুকের মধ্যে দুরুদুরু শুরু হলো ওদের। দশটা বাজে! নিশ্চয় এতক্ষণে বনের মধ্যের খোলা জায়গায় পৌঁছে গেছে টকার। কিন্তু এখনও কিডন্যাপাররা আসে না কেন? আর কখন আসবে?

বিড়বিড় করল মুসা, 'টকার এখন খাঁচায় মেসেজ রাখছে।'

'কি করে রাখবে?' রবিন বলল, 'চোরগুলো আসেইনি এখনও। খাঁচা রাখল কখন?'

ভারি গলায় কিশোর বলল, 'মনে হয় একটা ভুল করে ফেলেছি। জবাব যখন চেয়েছে, খাঁচাও ওরা নিশ্চয় রেখে এসেছে। হয় আমরা আসার অনেক আগেই রেখে দিয়ে এসেছে, নয়তো এদিক দিয়ে আসেইনি। অন্য কোন দিক দিয়ে গিয়ে রেখে এসেছে খাঁচাটা। তুলেও নেবে অন্যখান থেকে। গাধামী করেছি! এরকম কিছু ঘটতে পারে আগেই ভাবা উচিত ছিল।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

'ভাবলেই কি লাভ হত? কোন দিক দিয়ে যাবে ওরা আমরা জানি না। কয় দিকে নজর রাখতে পারতাম? বুদ্ধিটা ঠিকই করেছিলে, কিন্তু...'

'ব্যাটারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি চালাক,' তিক্ত কণ্ঠে কথাটা শেষ করে দিল কিশোর।

তার বাহুতে হাত রাখল জিনা। কোমল গলায় বলল, 'আসলে, এর বেশি আর কিছু করারও ছিল না আমাদের। অহেতুক মন খারাপ করছ।'

'টকার কি ভাববে বলো?'

'কিছুই ভাববে না। সে বোকা নয়।'

'কিন্তু এই ভুলটার জন্যে টারকজের বিপদ আরও বেড়ে গেল। ফরমুলাটা পেল না কিডন্যাপাররা। সময় আর না-ও দিতে পারে। রেগে গিয়ে এখন মেরে ফেলতে পারে চিতাটাকে।'

'মারলে আমাদের কিছু করার নেই,' জিনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে কিশোরকে সান্ত্বনা দিল রবিন। 'সেটা ওর ভাগ্য। আসলেই তো আমাদের আর কিছু করার ছিল না। কি করতে পারতাম?'

আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল ওরা। যদি আসে কিডন্যাপাররা, এই আশায়। কিন্তু এল না ওরা।

লিটল হোলোর নৌকাবাইচও শেষ হয়েছে। বাজি পোড়ানো শুরু হয়েছে। আকাশ আলোকিত করে দিচ্ছে নানা রঙের বাজি। তুমুল শব্দে মিউজিক বাজছে বোধহয় জেটিতে, এখান থেকেও বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'চলো, বাড়ি যাই,' ভোঁতা গলায় বলল মুসা। 'এখানে শুধু শুধু বসে থেকে

আর ঠাণ্ডা বাধিয়ে লাভ নেই। শিশির পড়ে ভিজে যাচ্ছে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল জিনা। নোঙর তুলল মুসা।

জেটিতে ওদেরই অপেক্ষায় রয়েছে বুড়ো জিম। ওদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে। দাঁতের ফাঁকে পাইপ। তার নৌকা-তাকে বুঝিয়ে দিয়ে ডাঙায় নামল গোয়েন্দারা। সাইকেলগুলো নিয়ে রওনা হলো বাড়িতে।

বনের ধার দিয়েই গেছে পথ। সেখানে এসে কিশোর বলল, 'এক কাজ করি, দাঁড়াও। চট করে একবার জায়গাটা দেখে আসি।'

রবিন বলল, সে-ও যাবে সঙ্গে।

মুসা আর জিনাকে সাইকেলগুলোর কাছে পাহারায় রেখে রবিন ও রাফিকে নিয়ে বনে ঢুকল কিশোর। খোলা জায়গাটায় ঢুকে গাছের গুঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল। খাঁচা-টাচা কিছু নেই।

'তার মানে এখনও আসেনি ওরা,' নিচু স্বরে বলল রবিন।

'এসেছে তো বটেই। ফরমুলাটার জন্যে পাগল হয়ে আছে ওরা। খাঁচা না দেখলে গুঁড়ির ওপরই চিঠি রেখে গেছে টকার। এসে নিয়ে গেছে চোরেরা।'

মাঝরাতে বাড়ি ফিরল ওরা।

ওদের জন্যেই অস্থির হয়ে আছে টকার। বাগানেই রয়েছে। ওরা গেটের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল।

'খবর কি? ওদের পিছু নিতে পেরেছিলে? টারকজ কোথায় আছে? ভাল আছে? চিঠিটা খাঁচায় রেখে সোজা হাঁটা দিয়েছি। একটিবারও পেছনে ফিরে তাকাইনি। কি হলো, তোমরা…'

থেমে গেল সে। বুঝে ফেলেছে, খবর ভাল নয়।

বারো

ওরা মনে করেছিল এভাবে পরাজিত হয়ে এসে দুচোখের পাতা এক করতে পারবে না, কিন্তু মরার মত ঘুমাল সবাই। সকালের আগে জাগলই না। কয়েক বার করে ডেকে ওদের ঘুম ভাঙাতে হলো ডোরাকে। অবশেষে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তার টেবিলে গিয়ে বসল ওরা।

'হয়েছেটা কি তোমাদের?' প্লেটে ডিম ভাজা দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল ডোরা। 'এত অলস ছেলেমেয়ে তো দেখিনি। বাজে ক'টা জানো? দশটা।'

সে তো আর জানে না, কত রাতে ঘুমাতে গিয়েছিল ওরা।

আবহাওয়া একই রকম আছে। খুব ভাল। কিন্তু খেলতে গিয়ে মোটেও ভাল লাগল না ওদের। কোন কিছুতেই মন বসাতে পারল না। ফলে একটা বিষণ্ণ দিন কাটল। ওদের শুকনো, চোখের কোণে কালি পড়া মুখগুলো দেখে ভাবনায় পড়ে গেল ডোরা। ফলে খাবারের টেবিলের সামনে কোমরে হাত দিয়ে গম্ভীর হয়ে সকালের প্রশ্নটাই করল, 'কি হয়েছে?'

'কিছু না, কিছু না,' অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলেন প্রফেসর কারসওয়েল, তিনি

মনে করেছেন তাঁকেই জিজ্ঞেস করেছে ডোরা। 'সব কিছু ভালই চলছে। ফরমুলাটা কপি করা প্রায় হয়ে গেছে। আর বড় জোর দু-তিন দিন। সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারব।'

বলে মনের ভুলে লবণের শিশিটা পকেটে ভরে, চশমাটা মরিচের গুঁড়োর শিশির পাশে ফেলে রেখে খুশি মনে উঠে চলে গেলেন তিনি।

কোনমতে কিছু গিলে নিয়ে বাগানে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। এক কোণে হাত-পা ছড়িয়ে বসল ঘাসের ওপর। খেলা জুড়ল রাফি আর নটি। কিন্তু তাদের দিকে দর্শকদের মন নেই দেখে খেলতে ভাল লাগল না।

একটু পরে গেটে দেখা দিল পোস্ট অফিসের পিয়ন। হাসি মুখে ডাক দিল, 'এই টকার, তোমার চিঠি।'

লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল টকার।

তার হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে শিস দিতে দিতে চলে গেল পিয়ন।

খামের ঠিকানার দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল টকার। তাকে ঘিরে এল তিন গোয়েন্দা আর জিনা।

আরেকটা চিঠি পাঠিয়েছে কিডন্যাপাররা।

'কি লিখেছে, পড়ো পড়ো,' জানার জন্যে আর তর সইছে না মুসার।

কাঁপা হাতে খামটা ছিঁড়ল টকার। ভেতরের কাগজটা বের করে ধরিয়ে দিল রবিনের হাতে, 'তুমিই পড়ো।'

জোরে জোরে পড়তে লাগল রবিন, *'মনে হচ্ছে ফরমুলাটা জোগাড় করার আন্তরিক ইচ্ছে আছে তোমার। সে জন্যেই তোমার এই অনুরোধ রাখলাম। তবে এই শেষ, আর সময় বাড়াব না। আরও তিন দিন সময় দিলাম। তারপর আর সাবধান করব না। শেষ করে দেব চিতাটাকে। সোমবার রাত দশটায় বনের সেই জায়গাটায় ফরমুলাটা রেখে আসবে। খাঁচার মধ্যে আর কোন চিঠিটিঠি চাই না। শুধু ফরমুলাটা। মনে থাকে যেন।'*

ঢোক গিলল টকার।

মুখ তুলল রবিন। 'ব্যস, এই। আর কিছু নেই।'

গম্ভীর মুখে মুসা বলল, 'এইবার আর কোন ফাঁক রাখেনি। হয় ফরমুলাটা দিতে হবে নয় তো…'

চোখ ছলছল করছে টকারের। ফিসফিস করে যেন নিজেকেই বলল, 'আর কোন দিন টারকজকে দেখতে পাব না!'

জিনাও মুখ কালো করে ফেলেছে। চোখে আগুন। এখন হাতের কাছে চোরগুলোকে পেলে মেরেই বসত, তার যে রাগের রাগ।

সবাই তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। একটা জবাব আশা করছে।

গভীর ভাবনায় ডুবে আছে গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে তার ঘন ঘন চিমটি কাটা দেখেই বোঝা যায়।

হঠাৎই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। হাসি ফুটল। বন্ধুদের উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণই আশা। এখনও মারা যায়নি টারকজ।'

'কি বলতে চাও?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টকার, 'নিশ্চয় আরেকটা বুদ্ধি বের করে ফেলেছ?'

'করেছি। এবং এটা আগেরটার চেয়ে অনেক ভাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঝুঁকি আছে। তবু চেষ্টা না করে ছাড়ব না।'

'ঝুলিয়ে রেখেছ কেন?' জিনা বলল, 'বলে ফেলো না!'

'দোহাই তোমার, কিশোর,' অনুনয় করল মুসা। 'তোমার এই পেটে কথা রেখে দেয়া সহ্য হয় না। এইবারটি অন্তত মাপ করে দাও ভাই। শাস্তিটা দিয়ো না। বলো, কি ভেবেছ?'

'খুব সহজ। শোনো, ওদের অস্ত্র আমরা ওদেরকেই ফিরিয়ে দেব। কিডন্যাপারদের ধরতে যখন ব্যর্থই হলাম, আমরাই কিডন্যাপার হয়ে যাব...'

'আল্লারে,' কপাল চাপড়াল মুসা, 'আর পারি না! মঙ্গল গ্রহের ভাষা!'

'অপরাধীদের ধরতে না পেরে শেষে অপরাধী হয়ে যেত বলছ?' ভুরু নাচিয়ে বলল জিনা।

'আমার কথা শেষ করতে দাও। যেমন কুকুর তার তেমনি হবে মুগুর। কিডন্যাপারদের বোঝাতে হবে যে ওদের শিক্ষা আমরাও পেয়ে গেছি। ওরা করেছে আমাদের চিতা কিডন্যাপ, আমরা করব ওদের কুকুর। এই সোমবারেই করব।'

বোকা হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। কিছুই বুঝতে পারছে না।

রবিন চুপ।

জিনা গম্ভীর।

টকার হাঁ।

'ওদের কুকুরটাকে ছিনতাই করবে!' অবশেষে মুখ খুলল জিনা।

'হ্যাঁ, করব। কিডন্যাপারদের নাগাল পাচ্ছি না আমরা, ওদের কুকুরটার তো পাব। কিছুতেই ফেরত দেব না ওটা। যতক্ষণ না ওরা টারকজকে ফেরত দেয়।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন, 'কাজ হবে না। বুঝলে, কাজ হবে না। আমাদের কাছে চিতাটার যতটা দাম, ওদের কাছে কুকুরটার ততটা নয়।'

'স্বাভাবিক ভাবে তাই মনে হয়। কিন্তু এটা সাধারণ কুকুর নয়। অনেক সময় অনেক কষ্ট করে ওটাকে ট্রেনিং দিতে হয়েছে। কিডন্যাপারদের কাছে তাই ওটার অনেক দাম। একটা সাধারণ চিতার কোন মূল্যই নেই ওদের কাছে। কিন্তু ওরকম একটা কুকুরের আছে। ওদের শয়তানীতে সাহায্য করার জন্যে ওরকম একটা কুকুরের ওদের ভীষণ দরকার।'

তর্কের খাতিরে রবিন বলল, 'কিন্তু ফরমুলাটার চেয়ে দামী নয়।'

'যদি শিওর হত, তাহলে। কিন্তু ওরা তো শিওরই হতে পারছে না ওটা পাবে কি পাবে না। অহেতুক ঝুঁকি নিতে যাবে না কুকুরটার ওপর। কোন না কোন ভাবে ওটাকে ফেরত নেয়ার চেষ্টা করবেই।'

আশার আলো দেখা দিল আবার টকারের চোখে। 'বেশ, না হয় কুকুরটাকে কিডন্যাপ করলামই আমরা। কিন্তু তার মালিককে খুঁজে বের করব কি করে? কি করেই বা জানাব যে স্প্যানিয়েলটাকে ধরে ফেলেছি আমরা?'

'কুকুরটার গলায় রশি বেঁধে তাকে বাড়ি যেতে বলব,' মুসা বলে উঠল। 'তারপর তার পিছু নিলেই তো হয়ে গেল...'

'না, অত সহজ হবে না,' কিশোর বলল। 'কুকুরটাকে ধরলেই চোরেরা ঘাবড়ে যাবে। ধরে নেবে ওদের ঘাঁটির খোঁজ করতে পারি আমরা। সেই জায়গা থেকে তখন সরে যাবে। কিন্তু কুকুরের মালিককে খুঁজতে যাব আমরা কোন দুঃখে? তারই গরজ বেশি। সে-ই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমরা যে ধরেছি কুকুরটাকে সেটা জানানোও খুব সোজা। খাঁচার মধ্যে ফরমুলা দেব না আমরা। দেব একটা চিঠি। জানিয়ে দেব, টারকজকে না দিলে কুকুরটা ফেরত দেয়া হবে না।'

কিশোরের প্ল্যানটা পছন্দ হলো সবারই। অবশ্য এছাড়া আর করারও কিছু নেই।

কি করে কুকুরটাকে ধরা হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা চলল এরপর।

মুসা বলল, 'ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকব। এলেই ধরব।'

'আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়ে যায় যদি?' রবিনের প্রশ্ন।

'বাতাসের বিপরীতে বসব আমরা। তাহলেই আর পাবে না,' জিনা বলল। 'কিন্তু কথা হলো, ধরব কি করে?'

'সেটাও ভেবে রেখেছি,' কিশোর বলল। 'কুকুরটা এলেই...আচ্ছা, কুকুর কুকুর না করে ওটার একটা নাম তো দিতে পারি আমরা?'

'কুরিয়ার,' সঙ্গে সঙ্গে বলল টকার। 'সব সময়ই চিঠি বয়ে নিয়ে যায় তো, তাই।'

'হুঁ, মন্দ না। ঠিক আছে, কুরিয়ারই সই। যেই আসবে সে, অমনি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে রাফি।'

'রাফিকে এতে জড়াবে?'

'কেন নয়?' বলে উঠল জিনা। 'ও তো আমাদেরই একজন। ওর কাছ থেকে সাহায্য পেলে নেব না কেন? কুকুরের বিরুদ্ধে কুকুর, খুব মানানসই হবে।'

সন্দেহ দেখা দিল মুসার চোখে। 'কুরিয়ারের চেয়ে রাফি কিছুটা বড়, গায়েও নিশ্চয় জোর বেশি। কিন্তু ওটা যদি বেশি ক্ষিপ্র হয়? যদি ধরার আগেই পালায়? এমন কিছু ভাবতে হবে আমাদের, যাতে শিওর হতে পারি, ধরা পড়বেই কুকুরটা।'

তুড়ি বাজাল রবিন, 'আমি একটা বুদ্ধি পেয়েছি! একটা সিনেমায় দেখেছিলাম কুকুর ধরতে। জাল ছুঁড়ে। জালের অসুবিধে হবে না। বুড়ো জিমের কাছে গিয়ে একটা শক্ত জাল চেয়ে আনব। আমার বিশ্বাস, দিয়ে দেবে। না দিলে ভাড়া দেব। তবে মনে হয় এমনিতেই দিয়ে দেবে। নৌকাটা ভাড়া নিয়ে ঠিকঠাক মত টাকা দিয়েছি আমরা, ওটার কোন ক্ষতি না করে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমাদের ওপর বিশ্বাস জন্মে যাওয়া স্বাভাবিক। জাল নিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব আমরা। রাফি গিয়ে কুকুরটাকে বেড় দিলেই ছুটে গিয়ে জাল ছুঁড়ে মারব। ধরা না পড়ে যাবে কোথায়।'

'ঠিক বলেছ! চমৎকার বুদ্ধি!' কিশোর বলল। 'টকার চলো, চিঠিটা লিখে ফেলা যাক। ভাল মত হুমকি দিয়ে লিখতে হবে।'

কয়েক মিনিট পর। ডেস্কে এসে বসল টকার। তার চারপাশে ঘিরে বসল সবাই। কি লিখতে হবে, বলে দিতে লাগল কিশোর, সে লিখতে লাগল।

দু-তিন বার লিখে মন মত হয়নি বলে ছিঁড়ে ফেলা হলো। শেষ পর্যন্ত একটা লেখা পছন্দ হলো। তার মধ্যে কাটাকাটি আছে। দেখে দেখে স্পষ্ট করে ওটার নকল করল টকার। ভাঁজ করে খামে ভরল।

বিষণ্নতা কেটে গেছে ওদের। আবার হাসি ফুটেছে মুখে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে আর আগের দিনের মত দেরি হলো না। নাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়ল সাইকেল নিয়ে। লিটল হোলোতে যাবে, বুড়ো জিমের কাছে, একটা জাল চেয়ে আনতে।

ওদেরকে দেখে খুশি হলো জিম। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ না সরিয়েই ফক ফক করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জানতে চাইল ওরা কি জন্যে এসেছে। তাকে জানানো হলো। জাল তো দিতে রাজি হলই বুড়ো, বোটে করে ওদেরকে মাছ ধরতে যাওয়ার দাওয়াতও দিয়ে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল মুসা। একপায়ে খাড়া। জিনাও রাজি। অন্যদেরও আপত্তি নেই। হাতে আর কোন কাজ নেই। একটা কিছু করে সময় কাটাতে পারলে বরং ভালই হয়। সোমবারের দেরি আছে।

তেরো

শনিবার, রোববার পেরিয়ে গেল। নতুন আর কিছু ঘটল না। সোমবার সকাল থেকেই উত্তেজিত হয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। কখন বিকেল হবে সেই অপেক্ষা। সময় যেন আর কাটে না। যতই আসল সময় এগিয়ে আসতে থাকল, আশা, আনন্দ, শঙ্কায় ভারি হয়ে উঠল ওদের মন।

বিকেল হলো। আরও সময় পেরোল। সকাল সকালই রাতের খাওয়া সেরে নিল। ওদের হাবভাব দেখে অবাক হলো ডোরা। কিন্তু কিছু বলল না। ছেলেমেয়েরা খুশি থাকলেই সে খুশি। মুখ গোমড়া করে রাখলে ভাল লাগে না।

খাওয়ার পর পরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। উপকূলের পথ ধরে এগোল। রাফিকে সঙ্গে নিয়েছে, কারণ তাকে নিতেই হবে। আসল কাজটা তারই। তবে নটিকে নেয়নি। ওকে বিশ্বাস নেই। দুষ্টুমি করে সব পণ্ড করে দিতে পারে।

বনে ঢুকে ঘন ঝোপের মধ্যে সাইকেলগুলো লুকিয়ে রাখল ওরা। তারপর টকারকে ওখানে রেখে নিঃশব্দে এগোল খোলা জায়গাটার দিকে।

গাছের গুঁড়ির ওপর দেখা গেল খাঁচাটা। কিডন্যাপাররা রেখে গেছে।

বাতাস কোন দিক থেকে বইছে পরীক্ষা করার জন্যে থু-থু দিয়ে আঙুলের মাথা ভিজিয়ে ওপর দিকে তুলে ধরল কিশোর। তারপর আরও শিওর হওয়ার জন্যে একমুঠো বালি তুলে ঝুরঝুর করে ছাড়ল।

আগের দিন স্প্যানিয়েলটা যেদিক দিয়ে বেরিয়েছিল সে দিকটা দেখিয়ে বলল সে, 'মনে হয় ওখান দিয়েই বেরোবে। যেদিক দিয়েই বেরোক, আমরা থাকব এই

ঝোপের মধ্যে।' কাটা গুঁড়ির কাছাকাছি আরেকটা ঝোপ দেখিয়ে বলল, 'মুসা, জাল নিয়ে তুমি ওটাতে গিয়ে বসো। রাফি কুরিয়ারকে বেড় দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জাল ছুড়বে। খবরদার, কোন ভাবেই যেন না ফসকায়। ধরা চাইই চাই। আর আমরা তো আছিই। দরকার পড়লে সাহায্য করব।'

কাজটা খুব পছন্দ হয়েছে মুসার। ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল। 'মানুষ জাল দিয়ে মাছ ধরে। আমি ধরব কুকুর। ভারি মজা।'

ফস করে বলে ফেলল রবিন, 'জাল দিয়ে শুধু মাছ নয়, পাখি, খরগোশ আর আরও অনেক কিছু ধরা হয়...'

'সুযোগ পেলেই খালি বিদ্যা ঝাড়ার তালে থাকে...'

'বিদ্যা ঝাড়লাম কোথায়? তুমি একটা ভুল কথা বললে, তাই শুধরে দিলাম...'

'ও তো একটা কথার কথা বললাম...'

'থাক,' বাধা দিল কিশোর। 'এখন তর্ক করার সময় নয়। যাও, ঝোপটার মধ্যে গিয়ে ঢোকো। আমরা রাফিকে পাঠানোর আগে কিছুতেই বেরোবে না, মনে থাকে যেন।'

দশটা নাগাদ এল টকার। চিঠিটা খাঁচায় রেখে চলে গেল।

এমনিতেই চুপচাপ ছিল গোয়েন্দারা, এখন একেবারে নিথর হয়ে গেল। রাফির কলার ধরে রেখেছে জিনা। টানটান হয়ে আছে স্নায়ু। তার এই অবস্থাটা আঁচ করে ফেলেছে রাফি। বুঝতে পেরেছে, তাকে দিয়ে জরুরী কিছু করাতে চায়। কি সেটা জানে না। তবে তৈরি আছে সে। জিনা তাকে 'যা রাফি, ধর!' বলার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ওদিকে ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে মুসা। সে-ও জিনার মতই উত্তেজিত। জালের দড়ি শক্ত করে ধরে রেখেছে। কোন ভাবেই যেন মিস না হয় সে জন্যে তৈরি।

রবিন আর কিশোর ঢুকেছে আরেকটা ঝোপের মধ্যে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে ওরা ইচ্ছে করেই। কুকুরটাকে যাতে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে পারে। এলে আর পালাতে দেয়া হবে না।

হঠাৎ কান খাড়া করে ফেলল রাফি। শক্ত হয়ে গেল জিনা।

রাফির পর পরই মুসার কানে ঢুকল শব্দটা। মট করে একটা শুকনো ডাল ভেঙেছে।

একটু পর আবার শোনা গেল শব্দটা। এবার সবাই শুনতে পেল।

ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিল স্প্যানিয়েলটার মাথা।

ঠোঁট কামড়ে ধরেছে জিনা। রাফির কলারে যেন আটকে গেছে আঙুল। টাইমিঙের ভুল করা চলবে না। সময়ের সামান্য একটু হেরফেরেই সব ভেস্তে যেতে পারে।

নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকল কুরিয়ার। সন্দেহজনক কিছুর গন্ধ পেল না। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করল গুঁড়িটার দিকে। কাছে এসে লাফিয়ে উঠল ওপরে। হাঁ করে খাঁচার আঙটা কামড়ে ধরতে যাবে, এই সময় বলে উঠল জিনা, 'যা রাফি,

যা! ধর!'

বিউগল বাজিয়ে যেন সবাইকে সতর্ক করে দিল জিনার কণ্ঠস্বর। প্রাণ ফিরে পেল সবাই। চোখের পলকে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল রাফি। কি করতে হবে তাকে পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন তার কাছে। কুকুরটার ঘাড় ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেলতে হবে।

অবাক হয়ে মাথা তুলল কালো কুকুরটা। এমন কিছু ঘটবে আশা করেনি। রাফিকে ছুটে আসতে দেখেই বিপদ আঁচ করে ফেলল। খাঁচার ওপর থেকে আগ্রহ হারাল। কেঁউ করে লাফ দিয়ে নামল গুঁড়ির ওপর থেকে। ধাক্কা লেগে কাত হয়ে গেল খাঁচাটা। সেদিকে ফিরেও তাকাল না সে। পালানোর জন্যে ঘুরে দৌড় দিল।

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। তার গায়ের ওপর এসে পড়ল রাফি।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে খাউ খাউ করে উঠল কুরিয়ার। হামলা ঠেকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু রাফি তার চেয়ে অনেক বড় আর শক্তিশালী। তার সঙ্গে পারল না সে। মাটিতে পড়ে গেল। চেপে ধরল তাকে রাফি।

মুচড়ে মুচড়ে নিজেকে বের করার চেষ্টা চালাল কুকুরটা। হয়তো বেরও করে ফেলত, রাফিকে ফাঁকি দিয়ে পালাত, যদি সময়মত দৌড়ে না আসত মুসা আর রবিন।

মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে দুটো কুকুর। তাদের ওপর জাল ছড়িয়ে দিল মুসা। টেনে টেনে পাশগুলো আরও ছড়িয়ে দিল রবিন। জালে আটকা পড়ে অবাক হয়ে গেল দুটো কুকুরই।

লড়াই থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রাফি।

দৌড়ে আসছে জিনা। চিৎকার করে বলল, 'থাম রাফি, থাম! কাজ হয়ে গেছে! আর দরকার নেই! ভয় নেই। এক্ষুণি খুলে দেয়া হবে তোকে।'

মুক্তি পাওয়ার জন্যে ছটফট করল না রাফি। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু স্প্যানিয়েলটা টানাটানি শুরু করল। জাল ছাড়াতে না পেরে *খউ! খউ!* করে চেঁচাতে লাগল। মুসা আর রবিন তাকে ধরতে যেতেই কামড়ে দিতে চাইল। জালের জন্যে পারল না।

এগিয়ে এসে তার পাশে বসে পড়ল জিনা। নরম গলায় কথা বলতে বলতে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। একটু অবাক হয়ে গেল কুকুরটা। চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

কোমল গলায় বলে চলেছে জিনা, 'ভয় নেই, কুরি। ওভাবে তাকিয়ে কি দেখছিস? আরে আমি জিনা! তোর কোন ক্ষতি করা হবে না! চুপ কর। কোন ভয় নেই।'

বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে স্প্যানিয়েলটা। কুকুর বশ করার অসাধারণ ক্ষমতা জিনার। দেখতে দেখতে শান্ত হয়ে গেল কুরিয়ার।

জাল থেকে বের করে আনা হলো তাকে। আর কামড়ানোর চেষ্টা করল না। সঙ্গে করে কলার নিয়েই এসেছে। সেটা তার গলায় পরিয়ে দিল মুসা।

কথা বন্ধ করছে না জিনা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুকুরটার নাম যে ওরা

কুরিয়ার রেখেছে এটা বুঝিয়ে ফেলল। পকেট থেকে বিস্কুট বের করে দিয়ে বলল, 'নে, খা। আরও চাইলে আরও দেব।' রাফির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'কি রে, তোর হিংসে হচ্ছে নাকি? হিংসের কিছু নেই। একটু পরই তো বন্ধু হয়ে যাবি, জানি। নে, তুইও নে।' রাফিকেও বিস্কুট দিল সে।

বিস্কুট খাচ্ছে কুরিয়ার, তার গা ঘেঁষে এল রাফি। বন্ধুত্ব করার ইচ্ছে। কিন্তু সন্দেহ গেল না স্প্যানিয়েলের। খানিক আগে যে তাকে মারতে এসেছিল এখনও ভোলেনি। ভয় যায়নি। খউ খউ করে ধমক দিয়ে সরে গেল।

কাত হয়ে পড়ে থাকা খাঁচাটা আবার সোজা করে বসিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'আর এখানে কোন কাজ নেই। চলো। অপেক্ষা করে করে যখন কিডন্যাপাররা দেখবে কুকুরটা যাচ্ছে না, কি হয়েছে নিজেরাই আসবে দেখতে।'

'প্ল্যান মত এখন সব কিছু ঠিকঠাক চললেই হয়,' রবিন বলল।

'চিঠিটা পড়ে ব্যাটাদের মুখের অবস্থাটা কেমন হয় দেখতে ইচ্ছে করছে,' মুসা বলল। 'আচ্ছা, আমরা রয়ে গেলেও তো পারি? ওরা এলে ওদের পিছু নেব।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' কিশোর বলল। 'ওদের সাড়া পেলেই চিৎকার শুরু করবে কুরিয়ার। বিপদে ফেলে দেবে। প্ল্যান যা করেছি সব যাবে গড়বড় হয়ে। চলো, যাই।'

অস্থির হয়ে ওদের অপেক্ষা করছে টকার। কুরিয়ারকে দেখে আনন্দে প্রায় লাফাতে শুরু করল। 'বাহ্, ধরা তাহলে পড়েছে। ভেরি গুড। কিন্তু এটাকে রাখব কোথায়?'

প্রশ্নটা বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা দিল সবাইকে। তাই তো? একথাটা তো ভাবেনি। বোকা হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

'খাইছে!' কানের গোড়া চুলকাল মুসা। 'কোথায় রাখব? টকারদের বাড়িতে তো নয়ই। ওখানেই প্রথম খুঁজতে যাবে কিডন্যাপাররা।'

'গেলে কিছু হত না,' টকার বলল। 'আমাদের ঘরে আটকে রাখতাম। কিছু করতে পারত না ওরা। কিন্তু পারব না ডোরার জন্যে। সন্দেহ করে বসবে সে। নানা রকম প্রশ্ন শুরু করবে। শেষে বলে দেবে আব্বাকে। আমাদের গোয়েন্দাগিরি বাদ হয়ে যাবে তখন।'

'কিন্তু বাড়ি থেকে বেশি দূরেও রাখা যাবে না,' জিনা বলল। 'ওর ওপর নজর রাখতে পারব না তাহলে। তাছাড়া খাওয়ানোরও অসুবিধে হবে। পোষা জানোয়ারকে না খাইয়ে রাখাটা খুবই খারাপ। খুব কষ্ট হয় ওদের। আমার একদম পছন্দ না।'

'দূর, আগেই ভাবা উচিত ছিল একথাটা!' নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। 'একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। কাছাকাছি পোড়ো বাড়ি তো আছে। সেগুলোর কোনটাতে রাখব কিনা ভাবছি।'

'উচিত হবে না। আটকে থাকলে চেঁচাতে পারে কুরিয়ার। পাশ দিয়ে লোক গেলে শুনে ফেলবে। ছেড়ে দেবে।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়?' টকার বলল, 'বনের মধ্যে কোথাও বেঁধে

রাখি। লোকে যেখানে কম যায়। একটা ঝুপড়ি-টুপড়ি বানিয়ে তাতে রেখে দেব। এসে এসে খাইয়ে যাব।'

'না, ওভাবে একা থাকতে পারে না কুকুর,' জিনা বলল। 'একলা থাকলে খুব কষ্ট পায়। বাঁধা থাকলে তো আরও খারাপ লাগে ওদের। এমন চেঁচানো শুরু করবে দশ মাইল দূর থেকেও শুনতে পাবে লোকে।'

মহা সমস্যায় পড়ল ওরা। কোন সমাধান বের করতে পারছে না। একেক জন একেক প্রস্তাব করছে। কোনটাই গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এত কিছু করে এখন এই রাখার সমস্যাটার জন্যেই সব কিছু গড়বড় হয়ে যাবে।

পরস্পরের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে রাফি আর কুরিয়ার। এখনও সহজ হতে পারেনি স্প্যানিয়েলটা।

আচমকা হাত তালি দিয়ে উঠল টকার। জায়গা ঠিক করে ফেলেছে। বলল, 'পেয়েছি! প্রথমেই মনে পড়ল না কেন? আশ্চর্য!'

'কোথায়! কোথায়!' প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল অন্য চারজন।

'নিরাপদ হবে তো?' মুসার প্রশ্ন।

'সব চেয়ে নিরাপদ। পালাতে পারবে না কুরিয়ার। হাজার চিৎকার করলেও তার ডাক শুনতে পাবে না কেউ। ওখানে তাকে খোঁজার কথাও মাথায় আসবে না তার মনিবদের।'

'কোথায়?' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর।

'আমাদের লাইটহাউসে।'

আলো জ্বলে উঠল কিশোরের চোখে। 'আসলে মাথাটা ইদানীং ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে আমার! আমিও ভাবলাম না কেন?'

'চলো, এক্ষুণি চলো,' তাগাদা দিল টকার।

মুসা বলল, 'টকার, জায়গাটা সত্যিই নিরাপদ তো? বড় বেশি নড়বড়ে মনে হয় দেখে। ভেঙেটেঙে পড়বে না তো?'

হেসে ফেলল টকার। 'লোকে সেই ভয়েই ওটার ধারেকাছে যায় না। দেখলে মনে হয় বাতাস এলেই ধসে পড়বে। তবে ভেতরটা খুব শক্ত, আব্বা বলেছে। সহজে পড়বে না।'

ওদেরকে আরও নিশ্চিন্ত করার জন্যে বলল সে, 'কেনার পর আব্বারও সন্দেহ হয়েছিল, তাই তার এক আর্কিটেক্ট বন্ধুকে এনে দেখিয়েছে। দেখেটেখে তিনি বলেছেন, ওটার ভিত, দেয়াল এখনও অনেক শক্ত। কিছুই হবে না।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'ঠিক জায়গাই বের করেছ। ওখানে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।'

'কিন্তু এত রাতে যাবে?' মুসার মনে ভূতের ভয় ঢুকেছে। 'শুনেছি পুরানো লাইটহাউসগুলো ভাল না। আর জায়গাটার কি নাম! ডেমনস রক! না জেনে তো নাম দেয়নি লোকে। নিশ্চয় ভূতটূত কিছু দেখেছে। এই অন্ধকারে নৌকা নিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়। আমি বলি কি, আজকের রাতটা বাড়ির কাছেই কোথাও লুকিয়ে রাখি। কাল দিনের বেলা টকারদের নৌকায় করে নিয়ে গিয়ে রেখে আসব।'

'তা নাহয় রাখা গেল,' রবিন বলল। 'কিন্তু ওরকম একটা নিরালা জায়গায় কি রাখা উচিত হবে? কষ্ট সইতে না পেরে শেষে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েই হয়তো সাঁতরে পালানোর চেষ্টা করবে।'

'একলা থাকবে না,' সমাধান করে দিল জিনা। 'রাফিকে রেখে দেব ওর সঙ্গে। মাত্র তো দুদিনের ব্যাপার। অসুবিধে হবে না।'

চোদ্দ

কুরিয়ারকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল ওরা। বাইরে কোথাও কিংবা বাগানের ছাউনিতে রাখলে কিডন্যাপাররা এসে নিয়ে যেতে পারে, তাই ওকে ঘরেই রাখার সিদ্ধান্ত নিল।

জিনা বলল, তার ঘরেই রাখবে। খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখবে। পাহারায় থাকবে রাফি। কোন ভাবেই আর পালাতে পারবে না কুরিয়ার। তবে পালানোর চেষ্টা যাতে না করে সেই ব্যবস্থাও করবে। খাওয়াতে খাওয়াতে পেট ভারি করে ফেলবে। পড়ে পড়ে তখন ঘুমাবে শুধু।

রাফির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে স্প্যানিয়েলটার। সুতরাং ওটাকে আটকে রাখতে খুব একটা অসুবিধে হবে বলে মনে হলো না জিনার।

'রাফি,' বলল সে, 'তোর ওপরই ভরসা করছি আছি। বাইরে সামান্যতম শব্দ শুনলে কিংবা কোন কারণে তোর সন্দেহ হলেই ডাকবি আমাকে।'

'হউ!' করে যেন বোঝাতে চাইল রাফি, 'আচ্ছা।'

তবু সে রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারল না জিনা। বার বার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল।

কুকুরটার ভাবনায় অন্যদেরও ঠিকমত ঘুম হলো না, বিশেষ করে টকারের।

পরদিন সকালে কুরিয়ারকে ঘর থেকে বের করে লাইটহাউসে নিয়ে যাওয়াটা একটা সমস্যা। প্রথম অসুবিধেটাই হবে ডোরাকে নিয়ে। দেখে ফেললেই ভুরু কোঁচকানো আর হাজারটা প্রশ্ন। সত্যি কথাটা বের না করে রেহাই দেবে না। টকারের আব্বাকে নিয়ে অবশ্য ভাবনা নেই। তাঁর সামনে দিয়ে তিনটে উট আর দশটা হাতি বের করে নিয়ে গেলেও খেয়াল করবেন না তিনি। আরেকটা ভয়, কিডন্যাপারদের নিয়ে। বাড়ির ওপর নজর রাখতে পারে ওরা। কুকুরটাকে দেখে ফেলতে পারে। সেটা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না।

সমাধান করে দিল রবিন।

'এক কাজ করা যায়। এমন ভান করব, যেন লাইটহাউসে আমরা পিকনিক করতে যাচ্ছি,' বলল সে। 'বড় একটা ঝুড়িতে ভরে নেব কুরিয়ারকে। টেবলক্লথ দিয়ে ঢেকে দেব। ও শব্দ না করলে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। ভাববে ঝুড়িতে করে খাবার নিচ্ছি।'

'টুঁ শব্দও করবে না,' আশ্বাস দিল জিনা। 'এমন খাওয়ান খাওয়াব, ঝুড়িতে থেকে থেকে শুধু ঘুমানো ছাড়া আর কিচ্ছু করার কথা ভাবতে পারবে না। কাল

রাতেই দেখেছি ওটা সাংঘাতিক পেটুক আর অলস।'

আধ ঘন্টা পর ঘাটে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। আজ নটিকেও নিয়েছে সঙ্গে। বড় ঝুড়িটা নিয়েছে মুসা। অন্যদের হাতও খালি নেই। দুটো ব্যাগে প্রচুর খাবার ঠেসে নিয়েছে টকার—টম্যাটো স্যাণ্ডউইচ, ডিম সেদ্ধ, ফ্রুট কেক, আর তাজা আপেল। জোরে জোরে পিকনিকের কথা বলছে ওরা, কেউ কান পেতে থাকলে শুনতে পাবে। সন্দেহ করতে পারবে না।

'আহ্, লাইটহাউসে কি মজাটাই না হবে আজ,' জিনা বলল। 'এই চলো চলো, জলদি নামো সবাই। নৌকায় উঠতে হবে।'

তাড়াহুড়ো করে বোটে উঠল সবাই। যেন লাইটহাউসে যাওয়ার জন্যে তর সইছে না। তাড়াটা আছে ঠিকই, তবে পিকনিকের জন্যে নয়, অন্য কারণে। যত জলদি সম্ভব কুরিয়ারকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলতে চায়। এখনও গোলমাল করেনি বটে, কিন্তু যদি করে বসে?

লাইটহাউসে পৌছতে বেশিক্ষণ লাগবে না। পানির নিচ থেকে উঠে আসা একটা পাথুরে টিলায় কয়েকশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল এই লাইটহাউস। এদিকের সাগরে প্রায়ই ঝড় ওঠে, অশান্ত হয়ে ওঠে সমুদ্র। পাথুরে পাড়ে আছড়ে পড়ে কিংবা চোরা টিলায় ঘষা লেগে প্রাচীন কাঠের জাহাজ ডুবে যাওয়ার ভয় ছিল। তাই ওগুলোকে সাবধান করে দেয়ার জন্যেই তৈরি হয়েছিল এই লাইটহাউস।

টকার খুব ভাল নাবিক। চমৎকার ভাবে নৌকাটাকে সামলাল। নিয়ে এল লাইটহাউসের কাছে। গোড়ায় পাথরের অভাব নেই। ওগুলোর ফাঁকে একটা জায়গা দেখাল টকার। সে আর মুসা মিলে বোটটাকে বাঁধল সেখানে।

লাফিয়ে বোট থেকে পাথুরে তীরে নামল সবাই। আগে আগে চলল টকার। পাথরের ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। অবাক হয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা আর জিনা। এখানে পা দিয়েই কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে ওদের। মনে হচ্ছে, এক লাফে যেন কয়েকশো বছর আগের পৃথিবীতে চলে এসেছে।

হাঁপ ছাড়ল সবাই। এখন নিশ্চিন্ত। ঘুম থেকে জেগে উঠে চেঁচিয়ে যদি গলা ফাটিয়েও ফেলে কুরিয়ার, আর ভয় নেই। কেউ শুনতে পাবে না তার ডাক।

ঝুড়িটা বইছে এখন রবিন আর মুসা। ওপর থেকে টেবলক্লথ সরাল জিনা। নড়ে উঠল কুরিয়ার। অলস ভঙ্গিতে চোখ মেলল। হাই তুলল। শরীর ঝাঁকাল।

কিশোর আর টকার ততক্ষণে লাইটহাউসের দরজার কাছে পৌছে গেছে। বিরাট দরজার পাল্লায় লোহার হাতল লাগানো। সেটা ঘুরিয়ে দরজা খুলতে হয়। বেশ জোর লাগে খুলতে।

টকার বলল, 'যাক, এলাম ঠিকমতই…'

কথা শেষ হলো না তার। একটা চাপা ভয়াবহ গর্জন শোনা গেল। অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে। কিশোর, রাফি, জিনা আর রবিন যেন পাথর হয়ে গেছে। আতঙ্ক ফুটেছে মুসার চেহারায়। ভূতের ভয়ে।

'কিসের শব্দ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

আবার শোনা গেল গর্জন। প্রথমবারের চেয়ে জোরাল আর ভীতিকর।

পাথরের সিঁড়িতে প্রতিধ্বনি তুলল গরগর শব্দ। রেগে যাওয়া কিংবা উত্তেজিত হয়ে ওঠা জানোয়ারের গলা থেকে যেমন বেরোয়, তেমন।

হঠাৎ বুঝে ফেলল টকার। ভয় দূর হয়ে গিয়ে চোখে দেখা দিল বিস্ময়। আনমনেই বিড়বিড় শুরু করল, 'অসম্ভব! ইমপসিবল! এ হতেই পারে না! এ তো টারকজের গলা!'

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে যেন উড়ে নেমে এল কালো আর হলুদ রঙের একটা ঝিলিক। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল ওদের পায়ের কাছে। কোন ভুল নেই, টকারের টারকজ। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে অবলীলায় সামনের দুই পা তুলে দিল বন্ধুর কাঁধে। আনন্দে গরগর করছে।

সেই ভার সামলাতে পারল না যেন টকার। ভাঁজ হয়ে এল হাঁটু। ধপ করে বসে পড়ল পাথুরে মেঝেতে।

তার গাল চেটে দিতে এল টারকজ। পারল না। মুখে মাজল পরানো।

একটানে ওটা খুলে দিল টকার। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'টারকজ, কেমন আছিস, টারকজ! কত জায়গায়ই না তোকে খুঁজেছি! অথচ বন্দি হয়ে আছিস আমারই লাইটহাউসে! কে ভাবতে পেরেছিল, বল?'

'দেখো, গলায় কত লম্বা দড়ি,' রবিন বলল। 'নিশ্চয় আমাদের সাড়া পেয়ে ছাড়া পাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। ছিঁড়ে ফেলেছে।'

'ওকে এখানে পেয়ে যাব, বিশ্বাসই করতে পারছি না আমি!' মুসা বলল।

টারকজকে পেয়ে নটি আর রাফিও খুশি। একজন গিয়ে তার পিঠে চড়ে বসেছে, আরেকজন গাল চেটে দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে জিনা বলল, 'কি যে খুশি লাগছে আমার। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? স্বাভাবিক আচরণ করছে টারকজ। তার মানে কিডন্যাপাররা তাকে রীতিমতই খাবার দিয়েছে। না খাইয়ে রাখেনি।'

সবাই খুশি, যার যার মত কথা বলছে। হঠাৎ কি মনে পড়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে বলল মুসা, 'আনন্দ পরেও করা যাবে। এখন তাড়াতাড়ি পালাতে হবে আমাদের। সোজা এসে যে বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছি সে খেয়াল আছে? দেখেছে এখানে কেউ আসেটাসে না, সে জন্যে লাইটহাউসটাকে হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে কিডন্যাপাররা। যে কোন মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারে।'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'কোন বোটটোট তো দেখলাম না।'

'দেখিনি, তার মানে তখন কাছাকাছি ছিল না। এসে পড়তে কতক্ষণ। তাছাড়া সবাই যে চলে গেছে, এমন না-ও হতে পারে। একজনকে অন্তত পাহারায় রেখে যেতে পারে।'

গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর। বলল, 'যাওয়ার আগে একবার তল্লাশি চালানো দরকার। একআধজন যদি থেকেই থাকে অত ভয়ের কিছু নেই। আমরা মানুষ কম না। তার ওপর রয়েছে টারকজ আর রাফির মত দুটো জীব। একজনের সঙ্গে পারব না এ হতেই পারে না।'

তার লাইটহাউস কতগুলো শয়তান লোক দখল করে বসে আছে এটা মোটেও মেনে নিতে পারছে না টকার। কিশোরের কথা শেষ হতেই টারকজকে

নিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হল।

ওপরে ওঠার কয়েক সেকেণ্ড পরেই লাফাতে লাফাতে নেমে এল আবার সিঁড়ি বেয়ে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

'ওরা আসছে!' গলা কাঁপছে তার। 'একটা মোটর লঞ্চে করে। কি করব এখন? ওদের আসতে দেরি হবে না। আমাদের দাঁড় টানা নৌকা নিয়ে ওদের সঙ্গে পারব না। ধরে ফেলবে।'

'তখনই বলেছিলাম,' গজগজ করতে লাগল মুসা। 'কেউ পাত্তাই দিল না আমার কথায়…এখন বোঝো মজা…'

'যা হবার তো হয়ে গেছে। এখন কি করা যায় সেটা ভাবো,' রবিন বলল।

'উপায় একটা বেরোবেই,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখেছে কিশোর। 'এত মাথা গরম করলে চলে না। শোনো, আমাদের নৌকাটা ছোট নৌকা। রেখেছি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে। ওদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। কিছু জানা না থাকলে খুঁজতেও যাবে না। তার মানে আমরা যে এসেছি এটা বুঝতে পারার কথা নয় ওদের।'

'কিন্তু এখানে ঢুকে তো আমাদের দেখে ফেলবে,' মুসা বলল। 'লুকানোর কোন জায়গা আছে বলেও তো মনে হয় না। যেখানেই থাকি, দেখে ফেলবে। আপাতত ওপর তলার কোন একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। এছাড়া আর তো কোন উপায় দেখি না।'

'চলো, সিঁড়ির মাথায় উঠে যাব।'

'সিঁড়ির মাথায়?' ওখানে গিয়ে কি লাভ বুঝতে পারল না টকার। 'ওটা শেষ হয়েছে চূড়ার বাতি রাখার ঘরে। ওখানে উঠলে আটকা পড়ে যাব। কোন দিক দিয়ে আর বেরোতে পারব না।'

'তখন আর কি করব? ওপর থেকে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ব,' মুখ গোমড়া করে আরেক দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

তার কথায় কান দিল না কিশোর। বলল, 'আটকা পড়ব যদি কিডন্যাপাররা আমাদের অনুসরণ করে ওপরে ওঠে। ওরা তো জানছেই না আমরা এসেছি। কাজেই নিচেই থাকবে। ওপরে ওঠার কোন কারণ নেই। টারকজকে দেখার জন্যেও নয়। কারণ ওরা জানে ওকে ওপরতলার ঘরে বেঁধে রেখেছে। এসো, আর দেরি কোরো না। ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দৌড়ে উঠতে শুরু করল কিশোর। আর কিছু করার নেই। বাকি সবাই পিছু নিল তার।

কুরিয়ারকে তুলে নিয়েছে মুসা। মোলায়েম গলায় তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে ওপরে উঠে যাতে ঘেউ ঘেউ না করে। কুকুরটা শান্ত স্বভাবের। গোলমাল করবে বলে মনে হয় না। ঘুমই ভাঙছে না ওটার। একবার চোখ মেলে তাকিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সিঁড়ির গোড়ায় একটা ঘর। দরজাটা খোলা। ভেতরে কিছুই নেই। খালি।

সেদিকে একবার তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল কিশোর। পেছনে

তার দলবল। কয়েক ধাপ উঠে ছোট একটা ল্যাণ্ডিঙে এসে দাঁড়াল ওরা। ডানে একটা আলমারি। হাঁ হয়ে খুলে আছে দরজা। ভেতরে কিছু দড়ি আর একটা বড় হুক রয়েছে। আলমারির ওপরে গোল একটা জানালা। তাতে লোহার মোটা মোটা শিক।

একটা শিক দেখিয়ে কিশোর বলল। 'দেখ, দড়ির ছেঁড়া অংশ। এখানেই বেঁধে রেখেছিল টারকজকে।'

নিচে সদর দরজা খোলার শব্দ হলো। চুপ হয়ে গেল সবাই। কান খাড়া।

টকারের কাঁধে হাত রেখে তাকে তার দিকে ফেরাল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'ইয়ে করো, আবার টারকজের মুখে মাজলটা পরিয়ে দাও। ডাণ্ডার সঙ্গে বেঁধে রাখো। ও যে ছুটে গিয়েছিল যাতে না বুঝতে পারে চোরেরা।'

'বাঁধার দরকার কি? ছাড়া থাকলেই তো লড়াইটা ভালমত করতে পারবে।'

'আহ্, তর্ক কোরো না! যা বলছি করো।'

অবাক হলো টকার। তবে আর কথা বাড়াল না। মাজলটা টারকজের গলাতেই ঝোলানো আছে। টেনে এনে মুখে লাগিয়ে দিল আবার। তারপর দ্রুতহাতে দড়িটা বেঁধে দিল ডাণ্ডার সঙ্গে।

'চলো এখন,' বলল কিশোর, 'যেখানে যাচ্ছিলাম যাই। টকার, নটিকে শান্ত রাখো। কোন শব্দ যেন না করে। রাফি, একদম চুপ। কোন আওয়াজ করবি না।' আনমনে বিড়বিড় করল, 'সমস্যা হবে কুরিয়ারকে নিয়ে। ও ডেকে না উঠলেই বাঁচি!'

পনেরো

ছায়ার মত নিঃশব্দে সিঁড়ির বাকি ধাপগুলো পেরিয়ে এল ওরা।

নিচে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। উঠে আসছে লোকগুলো।

কেন আসছে? ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে আসবে না তো? তাহলেই গেছি, ভাবল মুসা।

না, এল না ওরা।

'এই নে, গোশত, জংলী জানোয়ার কোথাকার,' বলল একজন। বোঝাই গেল চিতাটাকে গাল দিচ্ছে লোকটা। 'মাজল মুখে নিয়েই খেতে হবে। খুলে দিয়ে কামড় খেয়ে হাতটা খোয়াতে পারব না।'

'গেরিস, শোনো,' বলল আরেকটা কণ্ঠ, 'অনেক হয়েছে। এই জানোয়ারটাকে আটকে রাখার আর কোন অর্থ দেখি না। ওকে ওর মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের ববকে নিয়ে আসা দরকার। তারপর চলো এখান থেকে চলে যাই। ফরমুলা পাওয়ার আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল।'

'কি যে বলো না, ডিগার! জানো ওই ফরমুলাটার দাম কত?'

'না, আর জানতে চাই না। বহুবার শুনেছি। বেশি লোভ করতে গিয়ে জেলে পচে মরার ইচ্ছে নেই আমার।'

'চিতাটাকে ছেড়ে দিলে এখন জেল এড়াতে পারবে ভেবেছ? বরং যাওয়াটা

আরও ভাগিয়ে আনবে, ওই বিচ্ছু ছেলেমেয়েগুলো আমাদের রেহাই দেবে না। চিতাটাকে পেলেই ববকে ছেড়ে দেবে ওরা। তারপর ওকে অনুসরণ করে চলে আসবে। খুঁজে বের করবে আমাদের।'

মনিবের কণ্ঠস্বর শুনে একটা চোখ মেলল কুরিয়ার ওরফে বব। একটা কান নাড়ল। কিন্তু আদর করে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিল মুসা। পকেট থেকে চিনির একটা বড় টুকরো বের করে মুখে পুরে দিল জিনা। আদর আর মিষ্টি পেয়ে আবার আরামে চোখ মুদল সাংঘাতিক অলস কুকুরটা।

নিচে নেমে যেতে শুরু করল পায়ের শব্দ। কথাও অস্পষ্ট হয়ে এল ধীরে ধীরে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গোয়েন্দারা। পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে কি করে যেন বুঝে ফেলল রাফি ও নটি। রাফি লেজ নাড়তে লাগল, নটি টকারের চুল টানতে লাগল।

'যাক, গেল ব্যাটারা,' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'যায়নি, কেবল নিচে নেমেছে,' শুধরে দিল কিশোর। 'এসো, আমরাও নামি। ফরমুলাটা হাতানোর জন্যে নতুন কি যুক্তি করে শুনি।'

আগে আগে নেমে চলল কিশোর। কয়েক ধাপ নামতেই আবার কানে এল পদশব্দ। উঠে আসছে একটা চোর।

দ্রুত এদিক ওদিক তাকিয়ে আর কোন উপায় না দেখে দড়ি রাখা আলমারিটাতেই ঢুকে পড়ল কিশোর। আস্তে করে টেনে দিল দরজাটা। ঘাপটি মেরে রইল অন্ধকারে।

ওপরে প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে তার সহকারীরা। ঠিক ওই মুহূর্তে আবার চোখ মেলল বব। আরেকটু হলেই ডেকে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি আরেক টুকরো চিনি তার মুখে ভরে দিয়ে কোনমতে ঠেকানো হলো।

দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে কিশোর দেখল, একটা লোক চলে গেল তার সামনে দিয়ে। লম্বাটে মুখ। নাকে চশমা পরিয়ে দিলে রূপকথার বইয়ের শেয়াল পণ্ডিত হয়ে যেত। আলমারিতে থেকে একা একাই হাসি পেল তার। কিন্তু লোকটার শুনে ফেলার ভয়ে হাসতে পারল না।

নিচু হয়ে সিঁড়ি থেকে এক প্যাকেট সিগারেট তুলল লোকটা। পড়ে গিয়েছিল কোনভাবে, সেটা নিতেই উঠে এসেছে। নিয়ে ঘুরল আবার নেমে যাওয়ার জন্যে।

চলে গেল লোকটা।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরেও আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর বেরিয়ে কয়েক ধাপ উঠে গিয়ে সঙ্গীদের বলল, 'এসো। চলে গেছে। টকার, টারকজের মাজল আর বাঁধন খুলে দাও।'

খুব সাবধানে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল গোয়েন্দারা।

'নেমে করবটা কি?' জানতে চাইল মুসা।

'পালানোর চেষ্টা করব,' ফরমুলা চুরির প্ল্যান জানার আর আগ্রহ নেই কিশোরের।

সিঁড়ির শেষ মোড়টায় এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। সাবধানে গলা বাড়িয়ে উঁকি

দিল। নিচতলায় চলে গেছে বটে লোকগুলো, কিন্তু দরজা টেনে দিয়ে যায়নি। এতে ওদের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তবে গোয়েন্দারা বেরোতে গেলেই চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

'কারসওয়েলের বাচ্চাটা আর ওর দোস্তগুলোকে ধরতে পারলেই হয় একবার,' রাগে গোঁ গোঁ করল এক চোর, 'ঘাড় মটকে না দিয়েছি তো আমার নাম গেরিস নয়।'

'ওটাই ওদের একমাত্র শাস্তি,' বলল ডিগার। 'বাপরে বাপ! এত বিচ্ছু পোলাপান আর দেখিনি! কি চালাকিটাই না করল। চিঠিটা যখন তুমি পড়ছিলে, আমার তো ভয়ই লাগছিল হার্টফেল না করে ফেলি।'

'চালাকির মজা বুঝবে। এমন শিক্ষা দেব, একেবারে সিধে হয়ে যাবে। জীবনে আর ছোঁক ছোঁক করবে না। যত যা-ই করুক, চিতাটা আমি ফেরত দিচ্ছি না। না দিয়েও ববকে ফেরত আনব, ফরমুলাটা আদায় করব। বুদ্ধি একটা বের করে ফেলেছি। তবে এখানে আর থাকা চলবে না। দুটো কারণে। ববকে ব্যবহার করে জায়গাটা বের করে ফেলতে পারে। আর আসল কারণটা গাঁয়ে শুনে এসেছ। তরতর করে নেমে যাচ্ছে ব্যারোমিটার। ঝড় আসছে, প্রচণ্ড ঝড়। এই ভাঙা লাইটহাউস মোটেও নিরাপদ নয়। তলায় পড়ে মরতে চাই না। ডাঙায় চলে যাব। যাও, চিতাটাকে নিয়ে এসো।'

ভাবনায় পড়ে গেল গোয়েন্দারা। এবার কি করা? সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে ফিরে যাওয়ারও সময় নেই।

কিন্তু তক্ষুণি উঠে এল না ডিগার। বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন দিনের বেলায় ওটাকে নিয়ে যাব কি করে? লোকে দেখে ফেলবে না?'

'না, ফেলবে না। ওদের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ঝড়ের মধ্যে আমাদের দেখার জন্যে বসে থাকবে। সব গিয়ে ঘরে দরজা দেবে। জেলেরাও কখন নৌকা বেঁধে ঘরে ঢুকবে সেই তালে থাকবে। সবাই ব্যস্ত। আমাদের দিকে কে নজর দেবে? এখানে আসার সময়ও যে কেউ দেখল না, খেয়াল করোনি? একটা নৌকাও দেখিনি।'

'তবু, কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না। ঝুঁকি না নেয়াই ভাল।'

'এখানে থাকলে ঝুঁকি আরও বাড়বে। যা বললাম করো। তাড়াতাড়ি। সময় নেই।'

যে কোন মুহূর্তে এখন বেরিয়ে আসতে পারে ডিগার। হয়তো সঙ্গে গেরিসও বেরোবে।

'ইস্, দরজাটা যদি খালি বন্ধ রাখত,' ভাবছে কিশোর, 'তাহলে আর কোন অসুবিধে ছিল না। এতক্ষণে বেরিয়ে গিয়ে নৌকায় চেপে বসতে পারতাম। টেরই পেত না ওরা কিছু।'

খোলা দরজার সামনে দিয়ে যাওয়া এখন মোটেও নিরাপদ নয়। তাছাড়া লোকও ওরা কম নয়। দল বেঁধে পার হতে গেলে চোখে পড়ে যাবেই। ওদের কাছে অস্ত্র না থাকলে অবশ্য অতটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বলা যায় না।

পিস্তল থাকতে পারে।

কিশোরের বাহুতে হাত রাখল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'কি করা যায় বলো তো কিশোর?'

'একটা কিছু তো করতেই হবে।'

কিন্তু কি করবে নিজেই জানে না সে। বুঝতে পারছে, সময় নেই। ইতিমধ্যেই অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে জানোয়ারগুলোর। ঝড়ের গন্ধ পেয়ে গেছে। নার্ভাস হয়ে উঠছে ক্রমে। এখানে থাকলে আর বেশিক্ষণ চুপ থাকবে না। ঝুড়ির মধ্যে লেজ আরও গুটিয়ে ফেলেছে বব। পুরানো মনিবদের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে দেখাচ্ছে না একবারও। তার মানে তার সঙ্গে কখনই ভাল আচরণ করেনি ওরা।

কোনই বুদ্ধি বের করতে পারছে না কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কেটে চলেছে নিচের ঠোঁটে।

উপায়টা বের করল এই সময় টকার। 'দাঁড়াও। পেয়েছি।'

ঝট করে চার জোড়া চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। জিনার তো মনেই হতে লাগল বিপদে পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ছেলেটার। সিঁড়িতে বসে পড়ে সামনে রাখল বানরটাকে। অদ্ভুত, হাস্যকর কয়েকটা ভঙ্গি করল। বানরটাকে নকল করতে ইঙ্গিত করল।

এই নতুন খেলাটা মনে ধরল নটির। শুরু করে দিল সে।

টকার নিজের নাক ডলল। নটিও ডলল। টকার ঘাড় চুলকাল। বানরটাও চুলকাল। টকার যা করল, বানরটাও ঠিক তাই করতে লাগল।

মুসা বলল, 'পাগল হয়ে গেলে নাকি? এখন বানরের খেলা দেখানোর সময় নয়।'

ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ থাকতে ইশারা করল টকার। 'মনে হচ্ছে কাজ হবে। দেখছ না?'

কিছুই দেখল না মুসা। তবে চুপ হয়ে গেল।

বানরটাকে ওপরে নিয়ে গেল টকার। আলমারিটা দেখাল। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে আলমারির দরজা বন্ধ করল। খুলল। আবার বন্ধ করল। চাবিতে মোচড় দিয়ে তালা লাগাল। খুলল। লাগাল। খুলল।

গভীর মনোযোগে লক্ষ করছে বানরটা।

তিন গোয়েন্দা আর জিনাও তাকিয়ে আছে। টারকজ চুপ। রাফি চুপ। সবারই চোখ টকার আর নটির দিকে। কি করতে চাইছে টকার, বুঝে ফেলেছে কিশোর। আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তাই। ভাবছে, কাজ হবে তো?

দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে বানরটাকে ইশারা করল টকার।

এগিয়ে গেল নটি। আলমারির দরজাটা একবার দেখল। তারপর লাফ দিয়ে গিয়ে পাল্লা ধরে দিল এক ধাক্কা। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ওটা। বাইরে ঠিক ওই মুহূর্তে বিকট শব্দে বাজ না পড়লে তখুনি শুনে ফেলত কিডন্যাপাররা, কি হয়েছে দেখার জন্যে ছুটে চলে আসত।

দ্রুত এগিয়ে আসছে ঝড়।

আবার দরজা খুলল টকার। বন্ধ করল। সরে জায়গা করে দিল বানরটাকে।

নটিও তাকে নকল করল।
দরজা বন্ধ করে কয়েকবার তালা লাগাল টকার।
নটিও লাগাল। শিখে ফেলল চাবিতে মোচড় দিয়ে তালা লাগানোর কৌশলটা।
হাসি ছড়িয়ে পড়ল টকারের সারা মুখে। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হয় তোমাদের? কাজ হবে?'
'আমার বিশ্বাস,' মুসা বলল, 'অহেতুক সময় নষ্ট করছ। এসব না করে এতক্ষণে ওপরে চলে যেতে পারতাম আমরা। বাতি রাখার ঘরে গিয়ে বসে থাকতে পারতাম।'
'আমি কি করতে চাইছি বোঝোনি?'
'বুঝেছি। গাধা তো আর নই। নটিকে দিয়ে ডাকাতদের ঘরের সামনের দরজাটা বন্ধ করাতে চাইছে। বানরকে দিয়ে নকল করানো আর আসল কাজ করানোয় অনেক তফাৎ।'
কিন্তু তার কথায় দমল না টকার। নটির ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। বানরটাকে দরজা বন্ধ করার ট্রেনিং দিয়ে ফেলেছে। ঠিকমত যাতে করতে পারে সে জন্যে প্র্যাকটিস করাতে লাগল।
নতুন এই খেলাটা খুব পছন্দ হয়েছে নটির। লাফ দিয়ে গিয়ে দরজা লাগিয়ে চাবিতে মোচড় দিয়ে তালা লাগিয়ে দিল তৃতীয়বারের মত। সামান্যতম ভুল হলো না।
তাকে সরিয়ে দিয়ে পাল্লায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল টকার। বানরটাকে আর চাবিতে হাত দিতে দিল না।
আবার দরজা বন্ধ করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল নটি। কিন্তু কিছুতেই তাকে করতে দিল না টকার। করার জন্যে যখন কিচমিচ শুরু করে দিল নটি, তখন তাকে নিয়ে কয়েক পা সরে এল সে। আসতে কি আর চায় বানরটা। কেবলই টকারের হাত থেকে ছুটে গিয়ে আলমারির দরজার কাছে যেতে চায়।
হাত তুলে নিচের ঘরের দরজাটা তাকে দেখাল টকার। ইঙ্গিতে কিছু বোঝাল।
দম বন্ধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা আর জিনা।
ফিসফিস করে টকার বলল, 'যা, নটি যা। দরজা বন্ধ করগে। দেখি, কেমন শিখেছিস?'

ষোলো

ঘড়ি দেখল রবিন। মিনিটের কাঁটাটা যেন দৌড়ে চলেছে। নটি যদি দরজা লাগাতে পারেও, ওরা কি ডাঙায় যাওয়ার সময় পাবে? যে হারে এগিয়ে আসছে ঝড়, তাতে তো ভয়ই লাগছে। ওই ডাকাতগুলোর সঙ্গে এই লাইটহাউসে কাটাতে আর সাহস হচ্ছে না।
বুদ্ধিটা ভালই বের করেছে টকার। তবে বানরটাকে দিয়ে কাজ হবে কিনা

বোঝা যাচ্ছে না। বড় বেশি শব্দ করে ওটা। আস্তে করতে পারে না কোন কিছু। এত শব্দ করতে গিয়ে লোকগুলোর নজরে পড়ে গেলেই সব শেষ। আর কিচ্ছু করতে পারবে না। বাতাস আর বজ্রপাতের শব্দ না থাকলে এতক্ষণে অনেক আগেই শুনে ফেলত লোকগুলো।

এখনও তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে গেরিস আর ডিগার। কি করবে সে ব্যাপারে একমত হতে পারছে না। চালাক, আরও জোরেশোরে চালাক। ভাবল রবিন। তাহলে সময় পাওয়া যাবে।

এদিকের ঝড়ের স্বভাব বড় বিচিত্র। এই দেখা গেল আকাশ পরিষ্কার, একটু পরেই মেঘে ঢেকে যাবে। ধেয়ে আসবে বাতাস। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে যাবে প্রচণ্ড ঝড়।

বাইরে এখন তাই ঘটছে। বাজ পড়ছে ঘন ঘন। শোঁ শোঁ বাতাসের গর্জন। লাইটহাউসের চারপাশে আছড়ে পড়ছে উত্তাল ঢেউ। ভয় লাগছে, ওদের বোটটাকে গুঁড়িয়ে দেয়নি তো? দড়ি ছিঁড়ে টেনে নিয়ে যায়নি তো?

এক দৃষ্টিতে নটির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। মুসা আর জিনার চোখও সেদিকে। সত্যিই পারবে তো বানরটা? যা করাতে চাইছে টকার, সফল হবে?

কি করতে বলছে তার মনিব, বুঝে ফেলল হঠাৎ বানরটা। সিঁড়ির নিচের খোলা দরজাটার দিকে ছুটে গেল লাফাতে লাফাতে। কিচির মিচির করছে। চুপচাপ যেন কোন খেলাই খেলা যায় না। বড় হট্টগোল করা স্বভাব এই বানরগুলোর, বিরক্ত হয়ে ভাবল মুসা।

নিচে নেমেই পাল্লা ধরে ঠেলতে শুরু করল নটি।

উত্তেজিত হয়ে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দারা।

যদি বন্ধ করতে না পারে নটি? যদি তাকে দেখে ফেলে চোরেরা? আর পাল্লা লাগানোই আসল কথা নয়। তার পরেও কাজ আছে। তালা লাগাতে হবে। চাবিতে মোচড় দেয়ার আগেই যদি সন্দেহ করে বসে ওরা, ঠিক ছুটে আসবে দেখার জন্যে।

দরজাটা আলমারির পাল্লার মত অত হালকা নয়। ছোট্ট বানরটার শক্তিতে কুলাবে তো?

কুলাল। নড়ে উঠেছে পাল্লা। ধীরে ধীরে সরতে আরম্ভ করেছে।

আরও জোরে ঠেলতে লাগল নটি।

আচমকা দড়াম করে লেগে গেল ওটা।

চমকে গেল গোয়েন্দারা। রবিন তো চোখই বুজে ফেলল। মনে হচ্ছে, এই বুঝি শোনা গেল রাগত চিৎকার। ধেয়ে এল কিডন্যাপাররা।...কিন্তু কিছুই ঘটল না। এবারেও তাদেরকে বাঁচিয়ে দিল ঝড়। চোরেরা নিশ্চয় ভেবেছে, ঝড়ো বাতাসে ধাক্কা দিয়ে দরজা লাগিয়েছে।

চোখ মেলে বানরটার কাণ্ড দেখে হেসে ফেলল সে। তালাটা অনেক ওপরে। বার বার লাফিয়ে উঠে ওটাকে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে নটি। চেঁচিয়ে চলেছে একনাগাড়ে। তার ভঙ্গি দেখে না হেসে পারা যায় না।

ইস্, এত জঘন্য স্বভাব কেন বানরটার! চুপ থাকতে পারে না! যে হারে চিৎকার করছে, লোকগুলোর কানে যাবেই। ঝড়ের শব্দ আর বেশিক্ষণ ধোঁকা দিতে পারবে না ওদের।

হঠাৎই মনে হলো তার, বানরটা যে কাজ করতে পারছে না, সেটা ওদের কেউ করে দিলেই তো পারে? সে নিজেও তো করতে পারে?

মনস্থির করে ফেলল সে, ঝুঁকিটা নেবে। কিশোরের অনুমতির প্রয়োজন বোধ করল না। অত সময় নেই।

লাফিয়েই চলেছে নটি।

আর দ্বিধা করল না রবিন। দিল ছুট। লাফাতে লাফাতে নেমে এল নিচে।

ঠিক একই সময়ে একই ভাবনা খেলে গেছে মুসার মনেও। সে-ও দৌড় দিয়েছে। তবে দরজার কাছে আগে পৌঁছল রবিন। হাত বাড়াল।

কিচির মিচির আরও বেড়ে গেছে বানরটার।

ভেতরে শোনা গেল গেরিসের কণ্ঠ, 'কিসের শব্দ? আশ্চর্য! দেখতে হয়...'

আর শোনার অপেক্ষা করল না রবিন। চাবিটা ধরেই মোচড় দিল।

কিন্তু অনেক পুরানো তালা আর চাবি। লাগানোও হয় না বোধহয় অনেক দিন। ঘুরল না। মরচে ধরে আটকে গেছে।

উঠে আসছে গেরিস। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

আর দাঁড়িয়ে রইল না অন্যেরা। দিল সদর দরজার দিকে দৌড়। তালা লাগুক বা না লাগুক, আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তাদের সঙ্গে গেল চারটে জানোয়ার।

মরিয়া হয়ে উঠল রবিন। বেশি জোরে মোচড় দিলে চাবি ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু সে ভয় আর করল না। দিল মোচড়।

কিঁচ কিঁচ আওয়াজ উঠল।

ঘুরল চাবিটা।

লেগে গেল তালা।

ঠিক এই সময় পাল্লায় হাত দিল গেরিস। ঠেলে খুলতে পারল না। জোরে জোরে ধাক্কা দিতে শুরু করল।

আর দাঁড়াল না রবিন। বন্ধুদের পেছনে ছুটল।

লাইটহাউসের পেছনে বাঁধা রয়েছে টকারের নৌকাটা। ওটার কাছে যেতে কিডন্যাপাররা যে ঘরে বন্দি হয়েছে ওটার জানালার সামনে দিয়ে যেতে হয়।

বাইরে বেরিয়ে নৌকার দিকে দৌড় দিল কিশোর গোয়েন্দাদের বিচিত্র দলটা। সঙ্গে রয়েছে চার চারটে জানোয়ার। একটা চিতা, দুটো কুকুর, একটা বানর। ঝড়ের মধ্যে নিঃসঙ্গ ওই লাইটহাউসের গোড়ায় দৃশ্যটা হয়েছে দেখার মত। দেখার লোকও আছে...

জানালার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় চোরগুলো কি করছে দেখার কৌতূহলটা সামলাতে পারল না গোয়েন্দারা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ওরা দেখে ফেলেছে তাদেরকে। জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন।

শেয়ালমুখো লোকটা।

'এই গেরিস, দেখে যাও কাণ্ড!' সঙ্গীকে ডাক দিল সে। চোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে। এতটাই অবাক হয়েছে। 'বিচ্ছুগুলো পালাচ্ছে!...চিতাটাকে নিয়ে!'

দরজা ধাক্কানো বাদ দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল গেরিস। চোখ তারও বড় বড় হয়ে গেছে। চেঁচিয়ে বলল, 'ঢুকল কখন! আরি, ববকেও নিয়ে যাচ্ছে!'

রাগে অন্ধ হয়ে গেছে দুজনেই। কিন্তু কিছু করতে পারছে না। তাতে রাগ বাড়ছেই। আর কিছু করতে না পেরে জানালার শিক চেপে ধরে গায়ের জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল। ভেঙে ফেলতে চায়।

পুরানো শিক। কতক্ষণ টিকবে কে জানে। আরও তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন বোধ করল গোয়েন্দারা। এখন যদি শিক ভেঙে বেরিয়ে আসে চোরগুলো, ওদের এত কষ্ট সব বিফলে যাবে।

লাইটহাউসের পেছন দিকে দৌড় দিল মুসা। হারিয়ে গেল পাথরগুলোর আড়ালে। তার পেছনে ছুটেছে আর সবাই।

সাগরের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল ওদের বুক। কি বড় বড় ঢেউ। মাথায় সাদা ফেনার মুকুট। যেন টগবগ ফুটছে সাগরের জল। ফুঁসছে প্রচণ্ড রাগে।

এখনও পাথরের ঘেরের মধ্যে ঢেউয়ের জোর ততটা বাড়েনি। তবে আরেকটু উঁচু হলেই পাথরের দেয়াল ডিঙিয়ে এসে ভেতরে পড়বে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে ছোট্ট নৌকাটা। চোরগুলোর ভয় বাদ দিলেও নৌকাটাকে বাঁচানোর জন্যেই এখন আরও তাড়াতাড়ি করতে হবে ওদেরকে।

'এই ওঠো ওঠো তোমরা!' তাগাদা দিল মুসা। নৌকার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই উঠলেই খুলে দেবে।

আগে ঠেলেঠুলে জানোয়ারগুলোকে তুলে দেয়া হলো। ঝড় দেখে নৌকায় থাকতে ভয় পাচ্ছে ওগুলো। তারপর এক এক করে উঠল টকার, জিনা, রবিন ও কিশোর। মুসা উঠল সবার শেষে। অনেক যাত্রী। কোনমতে জায়গা হলো।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শাঁই শাঁই করে আঘাত হানছে বাতাস। খাবলা মেরে ঢেউয়ের মাথা থেকে পানি ছিনিয়ে নিয়ে আবার ঢেউয়ের গায়েই ছুঁড়ে মারছে। কালো মেঘের মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চিরে দিচ্ছে আকাশের এপাশ থেকে ওপাশ। গুড়ুগুড়ু শব্দ হচ্ছে মেঘের ভেতরে। থেকে থেকে বাজ পড়ছে কান ফাটা আওয়াজে।

দাঁড় তুলে নিল টকার আর জিনা।

'ভয় নেই,' বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল জিনা। এত দুর্যোগেও হাসল সে। সাগরকে একটুও ভয় পায় না। 'ঠিকই চলে যাব আমরা। খোলা সাগরের চেয়ে বরং এখানেই ভয় বেশি। লাইটহাউসের কাছ থেকে সরে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে রবিনের। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা উত্তেজনায়, কিছুটা শীতে। 'ঝড়ের ভয় নাহয় না-ই করলাম। কিন্তু চোরগুলোর? ওদের মোটর বোট

আছে। ধরে ফেলবে।'

নিচের ঠোঁটে জোরে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'জিনা, আরেকটু তাড়াতাড়ি বাও। একটা বুদ্ধি এসেছে।'

লাইটহাউসের কাছ থেকে সরাতেই বেশি কসরত করতে হলো দুই মাল্লা জিনা আর টকারকে। একপাশ থেকে বাড়ি মারার চেষ্টা করছে ঢেউ। কায়দা মত কয়েকটা বাড়ি মারতে পারলেই দেবে উল্টে। কিন্তু ঢেউকে সেই সুযোগ দিল না জিনা।

আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছে জানোয়ারগুলো। মৃদু গরগর করছে টারকজ। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে শরীর। এটা পছন্দ হচ্ছে না তার। রাফিও ভয় পেয়েছে, তবে সেটা প্রকাশ করছে না। এরকম বিপদে পড়ে অভ্যাস আছে। মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না জিনার ওপর থেকে। ওখানেই তার সব ভরসা। টকারের ঘাড়ে মুখ গুঁজে গোঙাচ্ছে নটি। চোখ তুলে তাকানোর সাহস নেই। মুসার কোলে কুঁকড়ি-বুকড়ি হয়ে আছে বব। ঝুড়ি ফেলে দিয়ে তাকে কোলে করে নৌকায় তুলে দিয়েছিল মুসা। সে এসে বসতেই আবার তার কোলে এসে চড়েছে স্প্যানিয়েলটা।

কেউ কথা বলছে না। লাইটহাউসের দিকে তাকাচ্ছে না। ভয়ে। চোরগুলো জানালার শিক ভেঙে বেরিয়ে আসছে, এ-দৃশ্য দেখতে চায় না।

প্রাণপণে দাঁড় বাইছে জিনা আর টকার।

তার নতুন বুদ্ধিটা কাজে লাগানোর জন্যে অস্থির হয়ে আছে কিশোর।

জিনা ভাবছে, ঢেউয়ের যা চাপ! দাঁড়ে সইবে তো? ভেঙে না যায়! তাহলে শেষ।

লাইটহাউসের জেটির দিকে নৌকা নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল কিশোর। দেখেশুনেই ওদিকে জেটি তৈরি করা হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতেও যাতে বোট বাঁধা যায়। ঢেউয়ের উৎপাত এখানে অনেক কম। ঢুকতেই পারছে না পাথরের দেয়াল ডিঙিয়ে।

ওখানে কেন যেতে চায় কিশোর কেউ বুঝতে পারল না। তর্ক করার সময় নেই। নীরবে সেদিকে এগোল জিনা আর টকার।

নিরাপদেই জেটিটা যে পাশে সেদিকে নৌকা নিয়ে এল দু'জনে। কোন অঘটন ঘটল না।

'জেটির কাছে নিয়ে যাও!' চিৎকার করে নির্দেশ দিল কিশোর। 'সিঁড়ির কাছে! জলদি!'

কোথায় লাইটহাউসের কাছ থেকে সরে যাবে, তা না, আরও কাছে যেতে চাইছে! এতটাই অবাক হলো টকার, দাঁড় বাওয়া থামিয়ে দিল। চোখের পলকে ধাক্কা দিয়ে নৌকাটাকে ঘুরিয়ে ফেলল ঢেউ। আরেকটু হলেই দিয়েছিল উল্টে।

চেঁচিয়ে উঠল জিনা, 'করো কি, করো কি! জোর রাখো! ও যা বলছে করো!'

আবার দাঁড়ে হাতের চাপ বাড়াল টকার। কিশোর কেন জেটির সিঁড়ির কাছে নৌকা নিয়ে যেতে চাইছে সে চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের কাজে মন দিল।

আধ মিনিট পরেই মোটর লঞ্চটার পাশে চলে এল নৌকা।

'জলদি গিয়ে লঞ্চে ওঠো সবাই,' কিশোর বলল। 'মুসা, সবাই উঠে গেলে

নৌকাটা বেঁধে ফেলবে লঞ্চের সঙ্গে।'

এতক্ষণে কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হাসল টকার। চোরগুলোকে লাইটহাউসে নির্বাসিত করে ওদেরই লঞ্চ নিয়ে পালাতে চায় গোয়েন্দাপ্রধান। একটা প্রশংসার কথা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। কিন্তু কেউ শুনতে পেল না। ঢেকে দিয়েছে বাতাসের গর্জন।

ঢেউ এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। নৌকা থেকে লঞ্চে উঠতে মোটেও অসুবিধে হলো না কারও। কেবল টারকজ খানিকটা গোলমাল করল। পানিকে তার ভীষণ ভয়। শেষে কিশোর, মুসা আর রবিন মিলে কোনমতে ঠেলেঠুলে তাকে তুলে দিল।

লঞ্চের পেছনে নৌকা বাঁধতে মুসাকে সাহায্য করল টকার।

ততক্ষণে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে জিনা। হুইলে হাত দিয়ে সবে ঘোরাতে যাবে, এই সময় লাইটহাউসের দরজার কাছ থেকে শোনা গেল একটা চিৎকার। ঘরের দরজা ভেঙেই বোধহয় বেরিয়ে চলে এসেছে দুই চোর। ছুটে আসছে।

বনবন করে হুইল ঘোরাল জিনা। চোখের পলকে নাক ঘুরিয়ে ফেলল লঞ্চের। সাগরের দিকে নাক ঘুরে যেতেই স্পীড দিল। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল লঞ্চ। একেবারে সময়মত। আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলেই ওদেরকে ধরে ফেলত চোরেরা।

এখন আর কিচ্ছু করার নেই ব্যাটাদের। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গালাগাল করছে আর ঘুসি দেখাচ্ছে গোয়েন্দাদের।

সেদিকে তাকিয়ে হাসল মুসা। ওদেরকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যে সেদিকে ফিরে স্যালুট করল। বলল, 'থাকো মিয়ারা, আটকে থাকো ওখানে। আবার আসছি আমরা। পুলিশ নিয়ে। নেহায়েত টকার ব্যথা পাবে বলেই লাইটহাউসটা ভেঙে পড়ুক এই বদদোয়াটা করলাম না।'

তার একটা বর্ণও অবশ্য শুনতে পেল না কিডন্যাপাররা। তীব্র হয়ে উঠেছে ঝড়, আরও বেড়েছে তার গর্জন।

সতেরো

টকারদের জেটিতে লঞ্চ ভেড়াতে পারল না জিনা। অত ওস্তাদ নাবিক নয় সে। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ঝড় তাকে বিপথে সরিয়ে দিল। অনেক কষ্টে এগোল একটা জেলে পাড়ার দিকে।

ঝড়ের মধ্যে লঞ্চটাকে বেসামাল অবস্থায় দেখতে পেল কয়েকজন জেলে। নিশ্চয় বিপদে পড়েছে কেউ, ভেবে ঝড় মাথায় নিয়েও সাহায্য করতে এগিয়ে এল ওরা নিজেদের বোট নিয়ে। দুদিক থেকে দড়ি ছুঁড়ে দেয়া হলো দুটো বোট থেকে। নিজেদের লঞ্চের সঙ্গে সেগুলো বেঁধে ফেলল গোয়েন্দারা।

টানতে টানতে লঞ্চটাকে তীরে এনে ভেড়ানো হলো। তাতে এসে উঠল দু'জন জেলে। লঞ্চের যাত্রীদের দেখে তো ওরা অবাক। কয়েকটা কিশোর-

কিশোরী আর চারটে জানোয়ার। তার মধ্যে আবার একটা চিতাও আছে।

কিশোর বলল, 'দুটো ডাকাতকে আটকে রেখে এসেছি ডেমনস রকের লাইটহাউসে। পুলিশে খবর দেয়া দরকার।'

শুনে চোখ আরও কপালে উঠে গেল জেলেদের। সংক্ষেপে তখন সব কথা ওদেরকে বলতেই হলো কিশোরকে।

হেসে উঠল একজন জেলে। 'অত তাড়াতাড়ি না করলেও চলবে। ওখান থেকে সাঁতরে তীরে যাওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাববে না কেউ।'

ঝড়ের মধ্যেই বিচিত্র দলটাকে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছে দিল জেলেরা।

গোয়েন্দাদের কাহিনী শুনে হাঁ হয়ে গেলেন ডিউটিরত সার্জেন্ট। সামলে নিতে সময় লাগল। হাসি ফুটল তাঁর মুখে। বললেন, 'কাজই করে এসেছ একটা। মহা শয়তান ওই চোরদুটো। অনেক কেস আছে ওদের বিরুদ্ধে। পুলিশ ওদের খুঁজছে।'

কাছের থানায় টেলিফোন করলেন তিনি।

কয়েকজন পুলিশ নিয়ে তখুনি রওনা হয়ে যাচ্ছেন একজন সুপারিনটেনডেন্ট, থানা থেকে জানানো হলো।

অনেক ধকল গেছে। তোয়ালে দিয়ে ভেজা শরীর মুছে এসে চেয়ারে বসল গোয়েন্দারা। সার্জেন্টের দেয়া গরম কোকার কাপে আরামসে চুমুক দিতে লাগল। প্রচুর মাখন ভাসছে কাপের ওপরে।

অফিসারের আসতে বেশি সময় লাগল না। গত কয়েক দিনের পুরো ঘটনাটা খুলে বলল গোয়েন্দারা।

শুনে তাদেরকে ধন্যবাদ দিলেন সুপারিনটেনডেন্ট। অনেক প্রশংসা করলেন তাদের। তারপর বললেন, 'ঝড় একটু কমলেই চলে যাব। পুলিশের বোট আছে। অসুবিধে হবে না।'

'আমাদেরকে নেবেন সঙ্গে?' অনুরোধ করল কিশোর।

হাসলেন সুপারিনটেনডেন্ট। 'তোমাদের না যাওয়াই ভাল। লোকগুলোর কাছে পিস্তল-বন্দুক থাকতে পারে। গোলাগুলি হওয়ার ভয় আছে। তোমরা বরং এখানেই থাকো...'

বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি। ছেলেমেয়েদের কালো হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাদেরকে পুরোপুরি নিরাশ করা হবে না। ফিল্ডগ্লাস দেব তোমাদের। লাইটহাউসে আমরা কি করছি এখানে থেকেই দেখতে পাবে।'

আরও আধ ঘণ্টা পর। থেমে গেল ঝড়। আবার মেঘের ফাঁকে উঁকি দিল সূর্য। দলবল নিয়ে লাইটহাউসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন সুপারিনটেনডেন্ট।

'ব্যাটারা না পালালেই হয়,' বিড়বিড় করল মুসা।

'তা পারবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দেখতে লাগল ওরা। খুব শক্তিশালী জিনিস। একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, লাইটহাউসের গোড়াতেই রয়েছে ওরা।

জেটিতে ভিড়ল পুলিশের বোট। সিঁড়িতে নামল পুলিশ। ধাপ বেয়ে উঠে

গেল।

বাধা এল না কিডন্যাপারদের তরফ থেকে। বুঝে গেছে ওরা, দিয়ে লাভ নেই। নীরবে আত্মসমর্পণ করল।

বন্দিদের নিয়ে আবার বোটে উঠল পুলিশ। জেলে পাড়ায় ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। তীরের কাছে ভিড় করছে ছেলে-বুড়ো-মেয়েরা।

তীরে এসে ভিড়ল বোট। বন্দিদের নিয়ে নামল পুলিশ।

গোয়েন্দাদের কাছে এসে সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, 'হ্যাঁ, এদেরকেই খুঁজছিল পুলিশ। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।'

হাতকড়া পরা গেরিস আর ডিগারকে সামনে দিয়ে যেতে দেখেই গর্জে উঠল টারকজ। ভয় পেয়ে গেল দুই চোর। লাফ দিয়ে সরে গেল।

টারকজের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে টকার বলল, 'হয়েছে হয়েছে, চুপ কর। শান্ত হ। আর ভয় নেই। ওরা আর কিছু করতে পারবে না তোর।'

সুপারিনটেনডেন্ট বললেন গোয়েন্দাদের, 'আমাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করছি তোমাদের। একটা স্টেটমেন্ট লেখাতে হবে। প্রেস থেকেও লোক আসবে। সাঁক্ষাৎকার দিতে অসুবিধে আছে?'

হাসিমুখে মাথা নাড়ল ছেলেমেয়েরা। পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেয়াটা তেমন পছন্দ নয় কিশোরের। কিন্তু বন্ধুদের আগ্রহ দেখে মানা করতে পারল না।

টকার বলল, 'আমাদেরও একটা অনুরোধ আছে, স্যার। এই কুকুরটা, বব, এর কোন মালিক নেই এখন। আমরা কি ওকে রাখতে পারব?'

'তা পারবে। তবে গেরিস আর ডিগার জেল থেকে বেরিয়ে যদি আবার দাবি করে, ফিরিয়ে দিতে হবে ওদেরকে।'

'করলেও আর বব ওদের কাছে যাবে না। এখনই তো যেতে চায় না।'

'ঠিক আছে, তোমরা এখন বাড়ি যাও। কাল সকাল দশটায় থানায় আসবে। আমরা রেডি থাকব।'

বাড়ি ফিরে এল ছেলেমেয়েরা। ঢুকেই সোজা রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিল টকার।

'ডোরা আন্টি, ডোরা আন্টি, কোথায় তুমি?' চেঁচাতে লাগল সে, 'আমরা এসেছি।'

দৌড়ে বেরোল ডোরা। ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল, মুখ দেখেই বোঝা যায়। 'এসেছ! কি ভয়ই না পাচ্ছিলাম। ওই হতচ্ছাড়া লাইটহাউসে কেউ যায়? ভেঙে পড়েছে, না আছে এখনও।'

'বহাল তবিয়তেই আছে,' হেসে বলল মুসা। 'ওটার কপালে মরণ নেই। আজকের ঝড়ে যখন ভাঙল না, বহু যুগ আরও টিকে যাবে।'

টকার বলল, 'জানো, কাকে নিয়ে এসেছি? এসো, দেখে যাও।'

চিতাটাকে দেখে কিছুক্ষণ বোকা হয়ে তাকিয়ে রইল ডোরা। বিশ্বাসই করতে পারছে না। আচমকা চিৎকার করে উঠল, 'আরে এ কি কাণ্ড! টারকজ! কোথায় পেলে ওকে!'

'লাইটহাউসে। কাল সন্ধ্যার পত্রিকাতেই সব দেখতে পাবে। আমাদের ছবি সহ।'

'জ্যান্তই তো দেখতে পাচ্ছি তোদের। ছবি আর দেখতে যাব কেন? এই টকার, আমাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ, বাবা? এখন বলতে পারিস না সব?'

'তা পারি। তোমাকে বলতে অসুবিধে নেই। আগে খাবার দাও। পেট ঠাণ্ডা করি। তারপর বলছি।'

'আয়। খাবার রেডি করেই রেখেছি।'

টেবিলে অনেকগুলো প্লেট সাজিয়ে দিল ডোরা। ঠাণ্ডা মুরগী, গরুর গোশতের ফ্রাই, সেই সঙ্গে প্রচুর লেটুস—টম্যাটোর চাটনি আর ঘরে তৈরি গরম গরম রুটি। আরও আছে। ইয়া বড় এক গামলা স্ট্রবেরির পাই, ওপরে পুরু হয়ে আছে মাখন। গলা ভেজানোর জন্যে রয়েছে জিঞ্জার বিয়ার।

চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মুসার। চেয়ারে বসার আগেই হাত বাড়িয়ে একটা ফ্রাই মুখে পুরে দিল। চিবাতে চিবাতে তারপর বসল।

টকারের আব্বাকে ডাকতে গেছে ডোরা।

রবিন বলল, 'কারস আংকেল এসে টারকজকে দেখে কি করেন দেখি।'

মুখে খাবার ভর্তি। জবাব দেয়ার ইচ্ছে থাকলেও দিতে পারল না। তার বদলে জিনা বলল, 'ভীষণ চমকে যাবেন।'

এই সময় আনমনে বিড়বিড় করতে করতে ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর কারসওয়েল। টারকজের ওপর চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকালেন। 'আরি, এটা এল কোত্থেকে? আফ্রিকার জন্তু আমাদের বাড়িতে কেন? হুঁ, বুঝেছি, তোর কাজ। টকার, আর কত জ্বালাবি, বল তো? জন্তু-জানোয়ার দিয়ে কি বাড়িঘর বোঝাই করে ফেলবি? নাহ্, আর পারা যায় না। ডোরা, এখানে বসে খেতে পারব না আমি। খাবারটা আমার ঘরেই দিয়ে যাও।'

বলতে বলতে ঘুরে গেলেন তিনি। আবার বিড়বিড় শুরু করলেন। বোধহয় কোন একটা হিসেব করছেন মনে মনে। ল্যাবরেটরির দিকে চলে গেলেন আবার।

'টারকজের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন,' অবাক হয়ে বলল রবিন।

'বাবা বটে একেকজন!' নিজের বাবার কথা ভেবে মুখ বাঁকাল জিনা। 'হুঁহ্!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'আছে তো, তাই বোঝো না। এত ভাল বাবা পেয়েও খুশি নও!'

*****
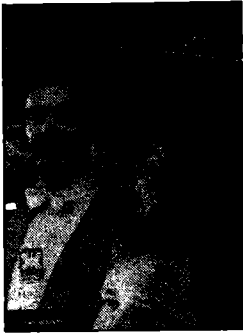
অভিনয়

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯৪

'জিনা, ওরকম আটকে রেখেছ কেন?' হাত বাড়াল রবিন, 'দেখি দাও না পেপারটা।'

কিন্তু দিল না জিনা। যেন শুনতেই পায়নি। ইচ্ছে করে এমন করছে। তিন গোয়েন্দাকে খেপানোর জন্যে। গভীর মনোযোগে পত্রিকা পড়ার ভান করল।

টান দিয়ে ওটা তার হাত থেকে কেড়ে নিল রবিন। একবার তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরি, প্রথম পৃষ্ঠার খবর হয়ে গেছি আমরা!'

'খাইছে! বিখ্যাত হয়ে গেছি!' মুসা বলল।

'বিখ্যাত আমরা অনেক আগেই হয়েছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'কি বলিস, রাফি?'

'ঘাউ' করে মাথা ঝাঁকিয়ে তার কথা সমর্থন করল রাফিয়ান।

লেখাটা পড়ার জন্যে ঝুঁকে এল রবিন আর মুসা। মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। চারটে ছেলেমেয়ে আর একটা কুকুরের গ্রুপ ফটো ছাপা হয়েছে। হেডিং দেয়া হয়েছে:

কিশোর গোয়েন্দাদের কৃতিত্ব
চোরাচালানি দল গ্রেপ্তার

এরকম কৃতিত্ব অনেক দেখিয়েছে তিন গোয়েন্দা। জিনা আর রাফিয়ানের জন্যেও নতুন নয়।

জিনাদের গ্রামের বাড়ি পারকার ভিলার বাগানে বসে আছে ওরা। শীতকাল হলেও আবহাওয়া ভাল। বড়দিনের ছুটি প্রায় শেষ। তবে এবারের ছুটিটাও বৃথা যায়নি ওদের। সংঘবদ্ধ একটা অপরাধী দলকে ধরিয়ে দিয়েছে।

দরজায় দেখা দিলেন জিনার বাবা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী তিনি, তিন গোয়েন্দাকে যারা চেনে তারা এখবর ভাল করেই জানে। সব সময় গবেষণা নিয়ে থাকেন। কঠোর ভাবে নিষেধ করে দেয়া আছে ছেলেমেয়েদেরকে যাতে হই চই না করে, শান্তিতে কাজ করতে দেয়া হয় তাঁকে। চেঁচামেচি শুনলেই রেগে যান তিনি, বেরিয়ে আসেন ধমক দেয়ার জন্যে। আজও এসেছেন। তবে রাগ নেই মুখে, তার বদলে হাসি। অবাক হলো গোয়েন্দারা।

'তোমাদের জন্যে একটা সুখবর আছে,' বললেন তিনি। 'আসছে এপ্রিলে একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে সাউথবুর্নে যাচ্ছি। তখন ইস্টার হলিডে থাকবে। ভাবছি তোমাদেরকেও নিয়ে যাব। চোরাচালানি দলটাকে ধরিয়ে দিতে পুলিশকে সাহায্য করার পুরস্কার। সাউথবুর্নের নাম নিশ্চয় শুনেছ। ইংল্যাণ্ডে।

সুন্দর সৈকত আছে। সময় কাটানোর নানা রকম ব্যবস্থা আছে। মজা পাবে খুব। তোমাদের আন্টির কাছে সব শুনে নাও। তবে একটা কথা, নেক্সট যে পরীক্ষাটা হবে তাতে ভাল রেজাল্ট করতেই হবে। খালি চোর-ডাকাত ধরবে আর পরীক্ষায় খারাপ করবে, সেটি হবে না।'

সবাইকে উত্তেজিত করে দিয়ে চলে গেলেন পারকার আংকেল।

'থ্রী চিয়ার্স ফর পারকার আংকেল!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'হিপ, হিপ, হুররে!' চিৎকার করে বলল জিনা। 'আমি জানি, আমার আব্বাটা বদমেজাজী। কথায় কথায় ধমক মারে। তারপরেও আমি তাকে ভালবাসি।'

'আর কেরিআন্টি তো একটা আন্টিই বটে!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল রবিন। 'এই আন্টি আর মেরিচাচীটা যদি না থাকত, জীবনের মজাই থাকত না আমাদের।'

'আরও তিন-তিনটে মাস অপেক্ষা করতে হবে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'এত আগে যে কেন শোনালেন আংকেল! অপেক্ষা করতে করতেই মরব। খালি ভাবব কখন আসবে এপ্রিল, কখন আসবে এপ্রিল!'

তবে যতটা দেরি হবে ভেবেছিল, এপ্রিল আসতে তত দেরি হলো না। কারণ লেখাপড়ায় ওরা ডুবে গিয়েছিল পুরোপুরি। দ্রুতই কেটেছে মাসগুলো। পরীক্ষায় খুব ভাল করেছে। যে মুসা প্রায় সব সাবজেক্টেই আলু পায়, তারও চমৎকার রেজাল্ট।

কথা রেখেছেন মিস্টার পারকার। নিজেদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও সাউথবুর্ন যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

আগেই টেলিফোনে শহরের একটা দামী হোটেলে রুম বুক করে রাখলেন তিনি। তারপর নির্দিষ্ট দিনে এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সিতে করে তাতে গিয়ে উঠলেন সবাইকে নিয়ে। সবুজের ওপর সোনালি কাজ করা ইউনিফর্ম পরা পোর্টার তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘর দেখিয়ে দিল। সাগরের দিকে ঝোলা ব্যালকনিওয়ালা ঘরগুলো খুব পছন্দ হলো ছেলেমেয়েদের। খুব খুশি ওরা।

রাফিরও পছন্দ হয়েছে। ঘরময় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। ধমক দিয়েও তাকে থামানো যাচ্ছে না।

স্যুটকেস খুলে জিনিসপত্র বের করে গোছানোর পর আন্টি বললেন ওদেরকে সৈকতের কাছে হোটেলের বাঁধানো চত্বরে গিয়ে একটু হাত-পা ছড়িয়ে আসার জন্যে। পরামর্শটা দারুণ মনে হলো ওদের কাছে। হুড়াহুড়ি করে ছুটল। আহ্, ছুটির মজাই আলাদা! আর বিদেশে যদি যাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই।

সাগর খুব পছন্দ জিনা আর মুসার। আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ওদের বাস। ওখানকার চেয়ে এখানকার সাগর অন্য রকম মনে হলো। অতটা ঝকঝকেও নয়, নীলও নয়। তবে সুন্দর সন্দেহ নেই। নানা ধরনের নৌকা আর জাহাজ ঢেউয়ে দুলছে। চমৎকার কয়েকটা ইয়ট আছে। ওগুলো কোটিপতিদের জাহাজ।

প্রচুর সী-গাল আছে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে মাথার ওপর। মাটিতে বসছে। একেবারেই পোষা মনে হয়। কাছে দিয়ে হেঁটে গেলেও ওড়ে না। রুটি আর নানা

রকম খাবারের টুকরো ফেলে লোকে, সেগুলো খাওয়ার জন্যে ভিড় জমায়। পাখিগুলোর দিকে নজর দিল রাফি। তাড়া করল। একেবারে কাছে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ওরা, যখন গায়ের ওপর এসে পড়ে কুকুরটা, তখন কর্কশ চিৎকার করে উড়ে যায়। যেন ওদেরকে বিরক্ত করার জন্যে কটু কথা বলে। খানিক দূরে গিয়ে আবার বসে। আবার তেড়ে যায় রাফি।

'এই রাফি, থাম, থাম,' হাসতে হাসতে বলল জিনা। 'লোকের নজরে পড়ে যাব তো।'

'পড়ে আমরা ইতিমধ্যেই গেছি। ওই দেখো,' মাথা নেড়ে দেখাল রবিন।

ওদের দিকে এগিয়ে এল এক তরুণ। জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা নিশ্চয় তিন গোয়েন্দা?'

'এখন পাঁচ গোয়েন্দা,' কিছুটা গম্ভীর হয়েই জবাব দিল মুসা।

'জিনা আর রাফিয়ানকে নিয়ে তো? ওই হলো। তিন গোয়েন্দা বলেই তো নিজেদের পরিচয় দাও।'

'তা দিই,' কৌতূহল হচ্ছে কিশোরের। 'তবে সংখ্যাটা প্রথমে তিন ছিল বলেই তিন গোয়েন্দা নামকরণ করেছিলাম। এখন ওটা ট্রেড মার্ক হয়ে গেছে। পাঁচজন হলেও ওই তিন গোয়েন্দাই। দশজন হলেও তা-ই থাকবে।'

'তা ঠিক। তোমাদের নাম জানলাম কি করে ভাবছ নিশ্চয়?'

'না। আমাদের নাম অনেকেই জানে। পত্রিকায় খবর বেরোলে জানবেই।'

'আমিও পত্রিকা দেখেই জেনেছি। আমেরিকায় সাংঘাতিক নাম করে ফেলেছ তোমরা। এই বয়েসে এমন সব জটিল কেসের সমাধান করে ফেললে নাম ছড়াবেই। এরকুল পোয়ারো আর শার্লক হোমসের চেয়ে কম বিখ্যাত নও তোমরা।'

'আপনি বোধহয় আমাদের কিছু বলতে চান?'

'হ্যাঁ, চাই।' কি জন্যে এসেছে জানাল লোকটা। স্থানীয় রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশনে কাজ করে। সাউথবুর্নে ওরা বেশি দিন থাকবে কিনা জানতে চাইল।

'খুব বেশি দিন না,' জিনা বলল। 'আব্বা একটা সম্মেলন এসেছে। যতদিন চলবে ততদিনই থাকব। দিন পনেরো হবে।'

চুপ হয়ে গেল লোকটা। ভাবছে। মনে মনে হিসেব করছে বোধহয়। তারপর হাসল। 'ওতেই চলবে। পত্রিকার পাতায় তো চেহারা দেখিয়েছ। টিভিতে দেখাতেও নিশ্চয় আপত্তি নেই?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। একটা সাংঘাতিক আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়। তবে আগে স্টুডিওর সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। এখানে কোথায় উঠেছ, ঠিকানাটা বলো। শীঘ্রিই আবার যোগাযোগ করব।'

হোটেলের নাম বলল রবিন। রুম নাম্বারও বলল।

আর কিছু বলার সুযোগ দিল না লোকটা। ওদেরকে অবাক করে রেখে উঠে চলে গেল।

ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থেকে মন্তব্য করল রবিন, 'পাগল নাকি!'

'কি জানি। হয়তো মজা করতে এসেছিল আমাদের সঙ্গে,' বলল মুসা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'আমার তা মনে হয় না। ফালতু কথা বলেনি। নামটা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।'

'নিজেও তো বলল না। পুরো ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত,' জিনা বলল।

তবে সেদিন সন্ধ্যায় খেতে বসার সময় হতে হতেই ঘটনাটার কথা ভুলে গেল ওরা। খাওয়া শেষ করে হলের মধ্যে দিয়ে আংকেল আর আন্টির পেছন পেছন চলেছে এই সময় সামনে এসে দাঁড়াল হোটেলের ম্যানেজার।

'একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্যার,' বলে মিস্টার পারকারের হাতে একটা কার্ড তুলে দিল সে।

কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে জোরে জোরে পড়লেন তিনি, 'হেনরি টমাস। প্রডিওসার অ্যাণ্ড ডিরেক্টর, সাউথ-ইস্ট টেলিভিশন।'

মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে তাকালেন মিস্টার পারকার। 'নাহ্, চিনি না। নামও শুনিনি। তাছাড়া টেলিভিশন দিয়ে আমি কি করব?'

কিন্তু ততক্ষণে কাছাকাছি চলে এসেছে লম্বা একজন লোক। মুখে হাসি। হ্যাঁ, সেই লোকটাই। সৈকতে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল গোয়েন্দাদের।

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল, স্যার। এদের ব্যাপারে,' ছেলেমেয়েদের দেখাল টমাস। 'গত শীতে খবরের কাগজে এদের কথা অনেক লেখালেখি হয়েছে। ছোটদের ম্যাগাজিনগুলোতে। আমার আবার ছোটদের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে খুব শখ। ওদের একটা অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে টিভির জন্যে একটা ছবি করতে চাই। আপনি ওদের গার্জিয়ান। তাই আপনার কাছেই এলাম। কয়েক মিনিট সময় হবে?'

হোটেলের লাউঞ্জে এসে বসল সবাই।

টমাস বলল, 'স্টুডিওর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি, স্যার। তারা আগ্রহ দেখিয়েছে। চোরাচালানিদের যে দলটাকে ধরিয়ে দিয়েছে ওরা সেটার কাহিনী নিয়ে ছবি করতে চায়। ভাল টাকা অফার দিয়েছে।'

'টাকার কথা ভাবছি না আমি,' মিস্টার পারকার বললেন। 'তবে এসব অভিনয়-টভিনয়...'

'আব্বা!' অনুরোধের সুরে বলল জিনা, 'ক্ষতি কি গেলে? একটা মজা হবে...'

'তাই তো,' সুর মেলাল মুসা। 'দুনিয়াতে সব জিনিসই জানা থাকা ভাল। অভিনয়েও নিশ্চয় শেখার জিনিস আছে।'

হেসে উঠলেন মিস্টার পারকার। 'আমাকে ভজাতে চাইছ, না? বেশ, আমার আপত্তি নেই...'

'আমার আছে!' বলে উঠল কিশোর। পাকা অভিনেতা সে। অনেক ছোটবেলায়ই টিভি সিরিজে অভিনয় করে নাম কামিয়েছে। তবে তার ধারণা, সেটা বদনাম। জীবনে আর ওসবে যেতে রাজি নয়।

অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল টমাস। টিভিতে অভিনয় করার অফার পেলে এই বয়েসী কোন কিশোর সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, জানা ছিল না তার। জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'ওই ক্যামেরা আর উজ্জ্বল আলোর সামনে দাঁড়াতে আমার ভাল লাগে না।'
'কিন্তু কিশোর…'
'আমি যাব না। সাফ কথা।'
'আমাদের জন্যেও না?' অনুরোধ করল জিনা।
'না।'
দমে গেল জিনা। চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মত। মুখ কালো।
মুসা আর রবিনও হতাশ হয়েছে।
সেটা দেখে কেরিআন্টি বললেন, 'এক কাজ করতে পারো। তোমার ভাল না লাগলে তুমি অভিনয় কোরো না। ক্যামেরা আর লাইটের সামনে দাঁড়িও না। কিন্তু স্টুডিওতে যেতে বাধা কোথায়?'
আন্টির দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর। এক এক করে তাকাল বন্ধুদের মুখের দিকে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। *মোটোরামের* দুঃস্বপ্ন জীবনেও ভুলতে পারবে না সে। তবে তার একার জন্যে সবার আনন্দ মাটি হয়ে যাক, এটাও চাইল না। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'বেশ, সঙ্গে যেতে রাজি আছি আমি। তবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াব না।'
আবার হাসি ফুটল সবার মুখে।
মিনমিন করে টমাস বলল, 'কিন্তু দলপতিকে বাদ দিয়ে…'
'এদের কাউকে দলপতি বানিয়ে নিন,' সহকারীদের দেখাল সে। 'একজনকে বানালেই হয়। ওটা এমন কোন ব্যাপার না। ছবিতে কেউ তো আর আসল চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাচ্ছে না কে কিশোর, কে রবিন, কে মুসা।'
'তা বটে,' খুশি হতে পারল না টমাস। কেউ রাজি হতে না চাইলে জোর করে তো আর কিছু করা যায় না। অগত্যা কিশোরকে বাদ দিয়েই ছবিটা করার সিদ্ধান্ত নিল। শেষ চেষ্টা করল, 'কিন্তু পাঁচজন দরকার আমার। তোমাদের শেষ অ্যাডভেঞ্চারটাতে পাঁচজন ছিলে।'
'আরেকজন অভিনেতা জোগাড় করে নেয়া কোন ব্যাপারই না। যদি ইচ্ছে থাকে।'
আর চাপাচাপি করল না টমাস।
'ওরা যে যাবে,' মিস্টার পারকার বললেন, 'আমি তো সঙ্গে যেতে পারছি না। কাজ আছে। দেখাশোনার দায়িত্বটা কি আপনি নেবেন?'
'নিশ্চয়।'
'ঠিক আছে। আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলুন। আমার কিছু জরুরি কাজ সারতে হবে। যাই?'
'শিওর।'
চলে গেলেন আংকেল আর আন্টি।
টমাস বলল, 'কিশোর, ক্যামেরার সামনে নাহয় না-ই দাঁড়ালে। কিন্তু ছবিটার অন্যান্য কাজে তো সাহায্য করতে পারো। বুঝতে পারছি, অভিনয়ের অভিজ্ঞতা আছে তোমার। নিশ্চয় তিক্ত অভিজ্ঞতা। যা-ই হোক, তোমার মত বুদ্ধিমান

ছেলেকে আমার দরকার আছে। বিনে পয়সায় কাজ করাব না অবশ্যই…'

'না না, পয়সা নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা নেই আমার। ঠিক, আছে অন্য কাজ করতে আমার আপত্তি নেই। বলুন, কি করতে হবে?'

টমাস জানাল, 'ছবিটার জন্যে স্ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছে। দায়িত্ব দেয়া হয়ে গেছে একজনকে। স্ক্রিপ্ট তৈরির কাজে সাহায্য করতে পারো।'

বেশির ভাগ ইনডোর সিনই নেয়া হবে সাউথ-ইস্ট টেলিভিশন স্টুডিওতে। আউটডোর সিনের জন্যে যেতে হবে লোকেশনে। তেমন জায়গার অবশ্য অভাব হবে না। গোবেল বীচের মতই সাউথবুর্নের সাগরের ধারেও অনেক পাহাড়-জঙ্গল আছে। গুহা আছে। সৈকত আছে।

আরও কিছু আলোচনা সেরে, দিন দুয়েকের মধ্যে শুটিং শুরু হবে জানিয়ে বিদায় নিল টমাস।

দুই

দুদিন পর সকালে টেলিভিশন স্টুডিও থেকে একটা গাড়ি এল ওদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে। অতি আধুনিক বিশাল একটা বাড়ির চত্বরে এসে ঢুকল গাড়ি। এটা টেলিভিশন ভবন। হেনরি টমাস নিজে বেরিয়ে এল অভিনেতাদের স্বাগত জানিয়ে নিয়ে যেতে। সুদৃশ্য অফিসগুলো দামী দামী আসবাব দিয়ে সাজানো। নানা রকম যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা আর সাউণ্ড রেকর্ডিং ইক্যুইপমেন্টের ছড়াছড়ি। একটা কাঁচের প্যানেলের ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে রবিন দেখল, অন্য পাশে একটা সেট সাজানো হয়েছে। শুটিং চলছে।

নিজের বিশাল অফিসকক্ষে ওদেরকে নিয়ে এল টমাস। কয়েকজন লোক বসে আছে সেখানে। পেশাদার অভিনেতা। এই ছবিটাতে কাজ করবে।

পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। একজন খ্যাতিমান অভিনেতা রয়েছে সেখানে। নাম রোজার মরভিস। চোরাচালানি দলের সর্দার ডাকার হিউগোর চরিত্রে অভিনয় করবে সে। আরও তিনজন অভিনেতা ডাকাতের অভিনয় করবে, তাদের নাম ডিক নরম্যান, রলি বিংহ্যাম ও বব উইলস। একজন সুন্দরী অভিনেত্রীও আছে। তার নাম জুন মরিস।

হেসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাত মেলাল জুন। রাফির সঙ্গে পা মেলাল। শুদ্ধ করে বললে বলতে হবে হাত-পা মেলাল, অর্থাৎ তার হাত আর রাফির পা।

'ছবিতে আমি হব মিসেস হিউগো,' হেসে হেসে বলল সে। 'ডাকাতের বউ। এমনিতেও রোজারের বউই হতে যাচ্ছি। এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে আমাদের।'

এটা শুনে খুব ভাল লাগল গোয়েন্দাদের। জুনকে পছন্দ হয়ে গেল। অন্য অভিনেতাদের সঙ্গেও কথা বলে কাউকে খারাপ মনে হলো না। এদের সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাবে।

বাধাধরা সময়। অহেতুক দেরি না করে কাজ শুরু করে দিতে চাইল টমাস। স্টুডিওতে যাওয়ার আগে কিশোর অভিনেতাদের বুঝিয়ে বলল, 'শোনো, তোমরা

যে ভাবে রহস্যটা ভেদ করেছ, সে ভাবেই দেখানো হবে পর্দায়। তবে শুটিং তেমন করে ধারাবাহিক ভাবে হবে না। সেটা হবে আমাদের সুবিধে মত। কোনটা আগে কোনটা পরে। শুটিং শেষে টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে আস্ত ছবিটা তৈরি হবে। ইনডোর সীনগুলো আমরা স্টুডিওতে নেব। তারপর যাব আউটডোর শুটিঙের জন্যে লোকেশনে। এতে সময়ও বাঁচবে, খরচও। আজ তোমাদেরকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হবে না। আজ শুধু অন্যদের অভিনয় দেখবে। দেখার দরকার আছে। কি ভাবে কি করতে হবে একটা ধারণা থাকা দরকার। জিনা, মুখ অমন করে রেখেছ কেন? ভয়ের কিছু নেই। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোটা কিছুই না। আর তোমরা যেহেতু ঘটনাটা ঘটিয়ে এসেছ অভিনয় করাটাও কঠিন হবে না। বাস্তবে যা যা করেছ তার নকল করলেই চলবে। তাছাড়া অ্যাকশন ছবি। অতটা পাকা অভিনেতার প্রয়োজন নেই। কিশোর, তোমার কি মতের পরিবর্তন হয়েছে? কি ঠিক করলে? অভিনয় করবেই না শেষ পর্যন্ত?'

'কেন, আরেকজন পাওয়া যায়নি?'

'যাবে। কিন্তু তুমি যদি করতে খুবই ভাল হত…'

'আপনি আরেকজন রেডি রাখুন। আমি এখনও বুঝতে পারছি না কি করব। খুব বাজে অভিজ্ঞতা আছে আমার, বুঝলেন। অভিনয়-টভিনয়গুলো অ্যালার্জি হয়ে গেছে। নইলে অমন করতাম না।'

'তোমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আমি। ঠিক আছে, মন চাইলেই কোরো। চাপাচাপি করব না। তবে আবারও বলছি, তোমাকে পেলে খুব খুশি হব। তোমার অভিনীত সিরিজগুলোর একটা আমি দেখেছি। বর্ন অ্যাকটর তুমি, নির্দ্বিধায় বলতে পারি একথা।'

'বর্ন অ্যাকটর হওয়ার চেয়ে বর্ন ডিটেকটিভ হতেই ওর বেশি পছন্দ,' হেসে বলল মুসা।

তার কথায় হাসল সবাই।

ছবির শুরুটা হলো ডাকাতদের একটা আলোচনা সভার দৃশ্য দিয়ে। সবাই মীটিঙে বসেছে।

সহজ শট। কোন অসুবিধেই হলো না। সেটা নেয়া হয়ে গেলে কিশোর অভিনেতাদের একটা ট্রায়াল শটের ব্যবস্থা হলো। ইতিমধ্যে কিশোরের ব্যাপারে অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে জুন আর রোজারের। তাকে আর কিছুতেই ছাড়তে চাইল না ওর। চাপাচাপি শুরু করল, অভিনয় করতেই হবে। সুতরাং ট্রায়ালের সময় ক্যামেরার সামনে বাধ্য হয়ে আসতে হলো গোয়েন্দাপ্রধানকে।

বিকেলে হোটেলের কাছে সৈকতে বসে দিনের ঘটনা নিয়েই আলোচনা করতে লাগল ওরা। অভিনয়ের ব্যাপারে জিনারও সমস্ত জড়তা কেটে গেছে। বুদ্ধিমতী সে। সহজেই ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা। শুটিঙের কথা থেকে ধীরে ধীরে অভিনেতাদের কথা উঠে পড়ল।

'যাই বলো, মানুষগুলো কিন্তু ভাল,' রবিন বলল।

'বেশ আন্তরিক,' জিনার মন্তব্য।

'রোজারকে আমার বেশি ভাল লেগেছে,' বলল মুসা।

তবে কিশোর কোন মন্তব্য করল না। তার ধারণা, এত সহজে মানুষ চেনা যায় না। তার সহকারীরা যখন অভিনয় নিয়ে উত্তেজিত, সে তখন প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দেখেছে খুব ভাল করে। অনেক ছোটখাট ব্যাপারও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এই যেমন, রোজারের এক গোছা চুল বার বার কপালের ওপর এসে পড়ে। হাত দিয়ে না সরিয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে সেগুলো সরায় সে। তার বাগ্দত্তা জুনের একটা মুদ্রাদোষ আছে। কথা শুরু করবে *আমি বলব* বলে। রোজারের খালাতো ভাই ডক। একটা বিশেষ ব্র্যাণ্ডের পিপারমিন্ট খুব পছন্দ তার। সারাক্ষণই চিবায়। বলে, খুব নাকি ভাল জিনিস। সবখানে নাকি পাওয়া যায় না। তবু কয়েকটা দিয়েছে ছেলেমেয়েদের।

পরদিন শুরু হলো আসল কাজ। কয়েক দিন আগে বাস্তবে যা ঘটিয়ে এসেছে সেটাই এখন অভিনয় করে দেখাতে হবে। প্রথম শটটা নেয়া হবে একটা গুহায়। কৃত্রিম গুহা তৈরি করা হয়েছে স্টুডিওর ভেতর। এই গুহায় গোয়েন্দাদেরকে আটকে রাখবে ডাকাতেরা। কিন্তু রাফি থেকে যাবে বাইরে। ওদের গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে আসবে গুহায়। জিনার বাঁধন খুলে দেবে। জিনা তখন তার বন্ধুদের মুক্ত করবে।

'এখন আমাদের শুটিং শুরু হবে,' টমাস বলল। 'তোমরা রেডি?'

হাত-পা বেঁধে গুহার ভেতরে রেখে আসা হলো গোয়েন্দাদের। অন্য কাউকে আর আনার প্রয়োজন পড়েনি। শেষ পর্যন্ত অভিনয় করতে রাজি হয়ে গেছে কিশোর। এর একটা বড় কারণ, এখানে সে দলপতি। মোটুরামের অভিনয় করতে গিয়ে যেমন হয়েছে তেমন করে অপমান কিংবা হেনস্তা হওয়ার কিছু নেই। গুহার ভেতরটা অন্ধকার রাখা হয়েছে। আবছা একধরনের অতি মৃদু সবুজ আলো ঢোকানোর ব্যবস্থা হয়েছে, আসল গুহায় যেমন থাকে। কি করতে হবে বলে দেয়া হলো জিনাকে।

শুটিং শুরু হলো। রাফিকে আসার জন্যে শিস দিল জিনা। স্টুডিওর বাইরে একটা ছোট ঘরে এতক্ষণ আটকে রাখা হয়েছিল কুকুরটাকে। একজন ক্রু গিয়ে ঘরের দরজাটা ফাঁক করে ধরল। ছাড়া পেয়েই আর কথা নেই। খোলা দরজা দিয়ে বন্দুকের গুলির মত ছুটে এসে ঢুকল স্টুডিওতে।

হো হো করে হেসে উঠল স্টুডিওর সবাই। তার অস্থিরতা দেখে নয়, চেহারা দেখে।

'কাট!' রেগে চিৎকার করে উঠল টমাস। 'এটা কি হলো, অ্যাঁ? বাস্কারভিলের হাউণ্ডের অভিনয় করতে বলা হয়েছে নাকি ওকে!'

বদ্ধ ঘরে আটকে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে পড়েছিল রাফি। শুনতে পাচ্ছিল, পাশের ঘরেই রয়েছে জিনা। তার কাছে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। মুক্তির চেষ্টা করতে গিয়ে তাক থেকে উল্টে ফেলেছে কতগুলো রঙের টিন। রঙ লেগে গেছে গায়ে। পেটের একপাশে লেপ্টে আছে সবুজ রঙ, অন্য পাশে লাল রঙের ডোরাকাটা। মাথার ওপরটা উজ্জ্বল হলুদ, লেজটা গাঢ়। এসবের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আছে তার নিজের আসল রঙ, যেন ব্রাশ দিয়ে ছোপ

ছোপ করে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। একটা ভাঁড় মনে হচ্ছে তাকে।

সবাই হেসেই অস্থির। টমাসও বেশিক্ষণ গম্ভীর থাকতে পারল না। এই অবস্থায় কুকুরটাকে দিয়ে অভিনয় করা যায় না। তারপিন দিয়ে রঙ ঘষে তুলতে অনেকটা সময় লেগে গেল। শুরুতেই একটা গোলমাল হয়ে গেল বলে জিনার মেজাজ খারাপ। প্রচুর বকাবকি করল রাফিকে। অন্যায়টা কি করেছে কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রাফি।

যাই হোক, শুরুতে গড়বড় হয়ে গেলেও এরপর চমৎকার শট নেয়া গেল। ভাল করে বুঝিয়ে দিল জিনা। রাফিকে শান্ত থাকতে বলল। বুদ্ধিমান কুকুর সে। দারুণ অভিনয় করল।

খুশি হলো টমাস। দিনের শেষে ওদেরকে বলল,'খুব ভাল কাজ দেখিয়েছ তোমরা। এতটা আশা করিনি। থ্যাংকস।'

ঠিক এই সময় গটমট করে এসে স্টুডিওতে ঢুকলেন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। সবার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, 'আমাকে আপনারা চিনবেন না। আমার নাম জনাথন এইচ বিয়াণ্ডা। জনি বিয়াণ্ডা বলেই চেনে লোকে।'

সবার চোখই বড় বড় হয়ে গেল। অভিনেতা, টেকনিশিয়ান, পরিচালক, সবার। জনি বিয়াণ্ডার নাম শুনেছে। একজন আমেরিকান কোটিপতি। প্ল্যাস্টিকের ব্যবসা করে কোটি কোটি ডলার কামিয়েছেন। কত টাকা আছে নিজেরও কোন ধারণা নেই। প্লাস্টিক কিং বলে চেনে তাঁকে লোকে। নিজের ইয়ট নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পত্রিকায় খবরটা পড়েছে কিশোর আর রবিন। সাউথবুর্নের জেটিতেই আছে এখন তাঁর জাহাজ। পুরো শহরে এখন এই কোটিপতিকে নিয়ে গুঞ্জন। পত্রিকায় পত্রিকায় ছবি ছাপা হচ্ছে।

লম্বা সুদর্শন একজন মানুষ। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ধূসর চুল। সবার দিকে তাকিয়ে আরেকবার বিমল হাসি হাসলেন।

কিশোরের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিল মুসা। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এই লোক এখানে কেন?'

যেন তার কথার জবাবেই ভ্রূকুটি করে প্লাস্টিক কিঙের দিকে তাকিয়ে বিনীত সুরে বলল টমাস, 'স্টুডিওতে শুটিং চলছে, স্যার। বাইরের লোকের ঢোকা বারণ।'

'সরি, এভাবে ঢোকা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল। আপনি নিশ্চয় মিস্টার হেনরি টমাস?'

'হ্যাঁ। আমাকে আপনার কি দরকার?'

'টেলিভিশন আমার খুব প্রিয়। এতে যারা কাজ করে তাদের প্রতি বিরাট কৌতূহল আমার, প্রচুর আগ্রহ। স্টেশনটা দেখতে ঢুকেছিলাম। একজন বলল, এখানে একটা ছবির শুটিং হচ্ছে। সত্যি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে। না এসে আর থাকতে পারলাম না। আপনাদের নামধাম সব জেনে এসেছি।'

কিছুটা নরম হলো টমাস। 'ও। কিন্তু দেরি করে ফেলেছেন। শেষ করে ফেলেছি আমরা। আরেকটু আগে এলে শুটিং দেখতে পারতেন। তবে অভিনেতারা

সবাই আছে এখনও।'

সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল টমাস। কিশোর অভিনেতাদেরও ছোট করে দেখলেন না মিস্টার বিয়াগ্গা। হেসে হাত মেলালেন। এটা ওটা জিজ্ঞেস করলেন। নিশ্চয় কৌতূহল মেটানোর জন্যেই।

'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি লাগছে,' প্লাস্টিক কিং বললেন। 'একটা অনুরোধ আছে। রাখবেন?'

সন্দেহ দেখা দিল টমাসের চোখে। এসব বড়লোকদের সে দেখতে পারে না। টাকার জোরে সব কিছুই কিনে নেয়ার চেষ্টা করে। তবে অনুরোধটা কি জানার পর সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

বিয়াগ্গা বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় আমার ইয়টে পার্টি দিচ্ছি। জাহাজটার নাম ফ্লাইং অ্যাঞ্জেল। এখানকার বন্দরেই আছে। আপনাদেরও দাওয়াত। এলে খুব খুশি হব।' ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরাও আসবে। কুকুরটাও আসতে পারে, বাধা নেই।'

একা কথা দিতে পারল না টমাস। সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হলো। কাররই অমত নেই। অনুমতির জন্যে হোটেলে বাবাকে টেলিফোন করল জিনা। প্রথমে তিনি রাজি হতে চাইলেন না। কারণ অপরিচিত জায়গায় যেতে চাইছে ওরা। কিন্তু চাপাচাপি শুরু করল সে। অগত্যা তাঁকে রাজি হতেই হলো। তবে কথা দিতে হলো, খুব সাবধানে থাকবে।

ভদ্রতার খাতিরে এরপর বিয়াগ্গাকে স্টুডিওটা ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে চলল টমাস।

পরদিনও খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ছেলেমেয়েদের। ওরা সাউথবুর্নে বেশি দিন থাকছে না। এর মধ্যেই ছবিটা শেষ করতে হবে। কাজেই প্রচুর কাজ। খুব সকালে স্টুডিওতে চলে এল ওরা। কয়েকটা দৃশ্যের শট নেয়া হলো।

পেশাদার অভিনেতাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে খাতির হয়ে গেছে ওদের। বিকেল ছয়টায় শুটিং শেষ হলে তাড়াহুড়া করে হোটেলে চলল ওরা পোশাক বদলে নেয়ার জন্যে। পরনে যা আছে তা নিয়ে পার্টিতে যাওয়া যায় না।

কাপড় বদলে তৈরি হয়ে রইল ওরা। কথামত হোটেল থেকে ওদেরকে তুলে নিল টমাস। বন্দরে যাওয়ার পথের শেষ মোড়টা ঘুরতেই ইয়টটা চোখে পড়ল। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। নানা রঙের আগুন লেগেছে যেন ওটাতে, মনে হচ্ছে জ্বলছে। গ্যাংপ্ল্যাঙ্কটাও উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। ব্যাণ্ড পার্টির বাজানো হালকা মিউজিকের শব্দ শোনা যাচ্ছে দূর থেকেও।

পার্টি দেয়া হচ্ছে বটে একটা!

তিন

চওড়া হাসি নিয়ে অতিথিদের স্বাগত জানালেন মিস্টার বিয়াগ্গা। সাউথবুর্নের অনেক সম্মানিত মেহমান ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন জাহাজে।

টমাস আর গোয়েন্দাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি, 'আরে আসুন, আসুন। কথা তাহলে রেখেছেন। খুব খুশি হলাম।'

আরও পাঁচ মিনিট পর এল রোজার ও জুন। তাদের পর পরই হাজির হলো রোজারের ভাই ডক আর অন্যান্য অভিনেতারা। জমতে শুরু করেছে পার্টি। সাদা রঙের ওপর সোনালি কাজ করা বড় বড় স্যালুনগুলোয় লোক গিজগিজ করছে।

মুসার নজর বুফে টেবিলটার ওপর। গাদা গাদা খাবার। চিকেন প্যাটিস, স্যামন স্যাণ্ডউইচ, জেলি, আইসক্রীম ও আরও নানা রকম লোভনীয় খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ওগুলোর ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে যেন আর তর সইছে না তার। রাফিকে এখানে আনা হয়নি। অনেক ধরনের লোক। কে কুকুর পছন্দ করে, কে করে না, জানা নেই। যারা করে না তাদেরকে শুধু শুধু বিরত করতে চায়নি জিনা। তাই ডেকেই রেখে এসেছে। ইয়া বড় একটা হাড় এনে দিয়েছে জাহাজের বাবুর্চি। সেটা নিয়ে মেতে আছে এখন রাফি।

সব চেয়ে বড় স্যালুনটায় কয়েক জোড়া দম্পতি নাচছে। দেখতে ভালই লাগছে ছেলেমেয়েদের। বেশ উপভোগ করছে। সময় যে কোথা দিয়ে উড়ে গেল টেরই পেল না। রাত একটার দিকে হাই তুলতে তুলতে রবিন বলল, 'কিশোর, আমার ঘুম পাচ্ছে। চলো, হোটেলে।'

'আরেকটু থাকি,' কিশোর বলল। 'টমাসের সঙ্গে একসাথেই যাই আমাদের পৌঁছে দেবে বলেছে।'

'কিন্তু ওর তো কোন দিকেই খেয়াল নেই। খুব মৌজে আছে,' জিনা বলল।

'আনন্দ করছে করুক। একটু দেরি করেই যাই আমরা। ফেলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।'

পার্টি শেষ হলো। গুডবাই জানিয়ে বিদায় নিতে শুরু করল মেহমানরা। এক এক করে সবাই চলে গেল। বাকি রইল কেবল টমাস, জুন আর গোয়েন্দারা।

'জুন, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?' টমাস জিজ্ঞেস করল।

'আমি বলব, না। আমি রোজারের জন্যে বসে আছি। হোটেলে নামিয়ে দেবে বলেছে। কিন্তু বহুক্ষণ থেকেই তাকে দেখছি না। পাত্তাই নেই। আমাকে বলে গেল, এক মিনিট, আসছি। গেল তো গেলই। চিন্তাই লাগছে আমার। ও তো এরকম করে না।'

'শরীর খারাপ লাগছিল হয়তো। মাথায় পানিটানি দিতে গেছে। দাঁড়াও, বাথরুমে দেখে আসি।'

মিস্টার বিয়াতাকে জিজ্ঞেস করে বাথরুম কোনদিকে জেনে নিল টমাস। সেদিকে এগোল।

ফিরে এল খানিক পরেই। জানাল, 'কই, নেই তো।'

উদ্বেগ আর চেপে রাখতে পারল না জুন। 'গেল কোথায়?'

সবার মনেই এই প্রশ্ন।

'জাহাজ থেকে নেমে যায়নি তো?' মিস্টার বিয়াতাকেও চিন্তিত দেখাচ্ছে। তাঁর জাহাজে কোন অঘটন চান না তিনি।

মাথা ঝাঁকাল জুন। 'আমি বলব, আমাকে না বলে সে যাবে না। একা ফেলে তো কিছুতেই নয়। বলে গেছে এক মিনিটের মধ্যেই আসবে। তাতেই বোঝা যায় নেমে যায়নি।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল টমাস।

তুড়ি বাজাল জিনা, 'ভাবনা নেই। রাফি আমাদের সাহায্য করবে। জুন, আপনার হাতে ওটা রোজারের রুমাল না? দিন, আমার হাতে।'

রুমালটা নিয়ে রাফির নাকের সামনে ধরল জিনা। নির্দেশ দিল, 'ভাল করে শোঁক। তারপর খুঁজে বের কর।'

কিন্তু স্যালুনে গন্ধের ছড়াছড়ি। নানা রকম মেকআপ আর সেন্টের তীব্র গন্ধের মধ্যে থেকে একটা বিশেষ গন্ধ আলাদা করে চিনতে পারল না সে। নিজেরাই তখন অভিনেতাকে খোঁজার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

টমাস আর জুন চলল গোয়েন্দাদের সঙ্গে। তাদেরকে সাহায্য করল জাহাজের কয়েকজন ক্রু। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না রোজারকে। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তার সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারল না। এত ভিড় আর ব্যস্ততার মধ্যে কে কোন দিকে গেছে সেটা খেয়াল রাখা সম্ভবও নয়।

জুনের মতই ঘাবড়ে গেল টমাস। তবে সেটা চেপে রেখে বলল, 'হয়তো কোন কারণে তীরে নেমেছিল। জুন যে জাহাজেই রয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে চলে গেছে।'

'এটা একেবারেই অসম্ভব।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'বাগদত্তাকে সঙ্গে নিয়ে এসে তাকে ভুলে ফেলে রেখে চলে যাবে, মাথা খারাপ না হয়ে গেলে এমন কাজ কোন পুরুষমানুষ করবে না।'

মুখ কালো হয়ে গেছে মিস্টার বিয়াণ্ডার। তাঁর জাহাজে দাওয়াতে এসে একজন মেহমানের খারাপ কিছু ঘটে গেছে ভেবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন তিনি। বিভিন্ন জায়গায় ফোন শুরু করলেন। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'নাহ্, হোটেলে যায়নি। হাসপাতালেও নেই।'

ঘাবড়ে যে গেছে সেটা আর চেপে রাখার চেষ্টা করল না টমাস। 'আর দেরি করা যায় না। পুলিশকে খবর দিতে হবে।'

সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কেউ অন্য কোন পরামর্শ দিতে পারল না।

এত রাতেও ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা মিনিট দেরি করল না পুলিশ। যত তাড়াতাড়ি পারল ইয়টে হাজির হয়ে গেল। হাজার হোক জনাবন বিয়াণ্ডার মত একজন বিদেশী মেহমান সাহায্য চেয়েছেন। খুশি হয়েই এল তারা।

পুলিশও অনেক খুঁজল। কিন্তু রোজার মরভিসকে পেল না।

কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে জুনের চেহারা। বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাকে হোটেলে নিয়ে চলল গোয়েন্দারা। জাহাজ থেকে নেমে কেঁদেই ফেলল বেচারি।

হোটেলে ফিরে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল গোয়েন্দারা।

'কালকের আগে ঠিকমত তদন্ত শুরু করবে না পুলিশ,' আনমনে বলল

কিশোর, যেন নিজেকেই শোনাল কথাটা। 'ততক্ষণে রোজারের খারাপ কিছু না হয়ে যায়!'

'কি খারাপের কথা বলছ?' জানতে চাইল মুসা।

'বুঝতে পারছি না।'

তবে একটা কথা ঠিকই বুঝতে পারছে কিশোর, আরেকটা রহস্য এসে হাজির হয়েছে। এতে ওদের নাক গলাতেই হবে। কারণ ওদের একজন বন্ধু নিখোঁজ হয়েছে।

পরদিন তদন্ত শুরু করল পুলিশ। কিন্তু ফল হলো শূন্য। কিছুই বের করতে পারল না তারা। তদন্ত কমিটির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর স্মিথের ধারণা, ইচ্ছে করেই উধাও হয়েছে রোজার। এগুলো একধরনের স্টান্টবাজি। অনেকেই করে এরকম, বিশেষ করে অভিনেতা এবং লেখকেরা। করে লোকের চোখে পড়ার জন্যে, বিখ্যাত হওয়ার জন্যে। অভিনেতারা হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যায়, কিংবা উদ্ভট কিছু করে বসে। লেখকেরা চলে যায় কোন নির্জন দ্বীপে, কিংবা পাহাড়ে। বলে শান্তিতে লেখার জন্যে গেলাম। এমন একটা ভঙ্গি, যেন ঘরের অশান্তিতে লেখা আটকে গেছে। এসব করলে তারা পত্রিকার হেডিং হয়, অভিনেতার ছবির টিকিট বিক্রি হয় বেশি, লেখকের বিক্রি হয় বই। বিখ্যাত গোয়েন্দা গল্প লেখক আগাথা ক্রিস্টিও একবার এরকম স্টান্ট করে বিজ্ঞাপন করেছিলেন। হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন একদিন। পরে আবার ফিরেও এসেছিলেন।

যাই হোক, রোজারের ব্যাপারে একথা মেনে নিতে পারল না দলের অন্যান্য অভিনেতা, টমাস এবং কিশোর গোয়েন্দারা।

'আপনি ভুল করছেন, ইন্সপেক্টর,' টমাস বলল। 'রোজার এমন কাজ করবে না।'

তার সঙ্গে সুর মেলাল জুন, 'আমি বলব, হেনরি ঠিকই বলেছে। এমনিতেই যথেষ্ট বিখ্যাত রোজার। বিজ্ঞাপনের জন্যে ওরকম কিছু করার দরকার নেই। আর করলে আমি অন্তত জানতাম। আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলত না।'

ছবির কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখন আর সেটাকে বন্ধ করা ঠিক হবে না। তাই প্রায় রোজারের মতই দেখতে আরেকজন অভিনেতা জোগাড় করে শুটিং চালিয়ে গেল টমাস। কিন্তু সাধ্যমত চেষ্টা করেও জমাতে পারল না আর কোন অভিনেতাই। গোড়ায় গলদ হয়ে গেলে যা হয় তাই হলো। তাছাড়া ছবির নায়িকাই থাকে মনমরা হয়ে। কি করে অন্যদের অভিনয় ভাল হবে?

জুনকে পরামর্শ দিল গোয়েন্দারা, সে যে হোটেল আছে সেটা ছেড়ে এসে তাদের হোটেলে উঠতে। তাহলে সব সময় কাছাকাছি থাকতে পারবে। একা একা লাগবে না আর। কথাটা পছন্দ হলো জুনের। সেদিনই সন্ধ্যায় হোটেল বদল করল।

'শুনুন,' তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল কিশোর, 'অত ভাবনার কিছু নেই। আমরা গোয়েন্দা। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া অনেককে খুঁজে বের করেছি। আরও একজনকে পারব। পুলিশ পারুক আর না পারুক, আমরা পারবই।'

তার এই আত্মবিশ্বাস দেখে অনেকটা বল পেল জুন। মলিন হাসি হেসে বলল,

'ভুলেই গিয়েছিলাম তোমরা তিন গোয়েন্দা। তোমাদের অনেক নাম শুনেছি। আমার ভাগ্য ভাল, তোমাদের সামনেই ঘটেছে ঘটনাটা।'

'আমরা আপনাকে সাহায্য করব!' কথা দিল গোয়েন্দারা।

দেখতে দেখতে একটা প্ল্যান করে ফেলল কিশোর। কি করতে চায় জানাল জুনকে। আবার যাবে ফ্লাইং অ্যাঞ্জেলে। মিস্টার বিয়াগু আর ক্রুদের ভাল করে আরেকবার জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আরও একবার তল্লাশি চালাবে ইয়টে।

প্ল্যানটা জুনেরও পছন্দ হলো। না হলেও কিছু বলত না। তিন গোয়েন্দার ওপর কথা বলত না। জিনার আব্বা-আম্মা হোটেলে নেই। বিজ্ঞানীদের একটা পার্টি দেয়া হচ্ছে, সেখানে গেছেন। কাজেই অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন পড়ল না। খাওয়া শেষ করেই জুনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল বন্দরে।

সেদিনও পার্টি চলছে জাহাজে। আরেকটা বড় পার্টি দিচ্ছেন প্লাস্টিক কিং। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের গোড়ায় ডিউটি দিচ্ছে একজন নাবিক। সে বাধা দিল। নিমন্ত্রণপত্র ছাড়া ওদেরকে ঢুকতে দিল না। মনিবের কড়া নির্দেশ আছে।

নাবিকের কাছে গিয়ে হেসে বলল জুন, 'আমরা ঢুকলে কিছু বলবেন না, মিস্টার বিয়াগু। আমার নাম জুন মরিস। ফিল্ম স্টার। আপনি একটু যোগাযোগ করুন তাঁর সঙ্গে। তাহলেই বুঝবেন।'

বিন্দুমাত্র নরম হলো না নাবিক। 'সরি, মিস, এখান থেকে না নড়ার হুকুম আছে আমার ওপর। কিছু মনে করবে না। চাকরি করি তো।'

'দেখুন,' বোঝানোর চেষ্টা করল জুন, 'আমার কথা বললে কিচ্ছু বলবেন না আপনাকে মিস্টার বিয়াগু...'

তার হাতে হাত রেখে বাধা দিল জিনা। জাহাজের ডেকে দেখতে পেয়েছে লম্বা মানুষটিকে। হাত নেড়ে জোরে জোরে ডাকতে শুরু করল, 'মিস্টার বিয়াগু, মিস্টার বিয়াগু!'

কিছু না বুঝেই তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঘউ ঘউ করে উঠল রাফি।

ব্যাণ্ড পার্টির মিউজিকের শব্দকে ছাড়িয়ে গেল সে চিৎকার। ফিরে তাকালেন বিয়াগু। এগিয়ে এসে ঝুঁকলেন রেলিঙের ওপর দিয়ে।

ততক্ষণে মহাখাপ্পা হয়ে উঠেছে নাবিক। জিনার কাঁধ চেপে ধরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে বলল। 'চুপ! চুপ! এখানে এসব গলবাজি চলবে না...'

রাফির সামনে জিনার গায়ে হাত দিয়েছে একটা বিশ্রী লোক, সে কি আর সহ্য করে। বিকট ঘাউ করে উঠে তার ওপর লাফিয়ে পড়তে গেল।

তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলল জিনা। নাবিককে শাসিয়ে বলল, 'খবরদার, আর কিছু করার চেষ্টা করবেন না। এইবার আর আটকাব না কুকুরটাকে।'

ওদিতে শার্টের হাতা গুটিয়ে ফেলেছে মুসা। মারমুখো হয়ে এগোল এককদম। তাকে ধরে ফেলল কিশোর।

রবিন তাকিয়ে আছে মিস্টার বিয়াগুর দিকে।

'হচ্ছেটা কি এখানে?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মুখ তুলে তাকাল নাবিক। সে জবাব দেয়ার আগেই জুন বলল, 'মিস্টার

বিয়াণ্ডা, আমি। জুন মরিস। কত করে বললাম আপনার কথা, তা-ও ঢুকতে দিচ্ছে না। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

বিয়াণ্ডাকে খুশি মনে হলো না। অনেক সম্মানিত মেহমান রয়েছেন জাহাজে। তাঁদেরকে ফেলে এখন কথা বলার সময় নেই তাঁর।

দ্বিধা করলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'বেশ, আসুন।'

জুনের পেছনে ছেলেমেয়েদেরও এগোতে দেখে হাত নাড়লেন, 'না না, তোমাদের আসার দরকার নেই। জায়গা নেই এখন জাহাজে। লণ্ডনের কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ীকে দাওয়াত করেছি। এটা আমাদের প্রাইভেট পার্টি। বাইরের কাউকে এলাউ করতে পারছি না।'

দ্রুত গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে উঠে গেল জুন। ফিরে তাকিয়ে একবার হাত নাড়ল গোয়েন্দাদের দিকে। তারপর চলে গেল মিস্টার বিয়াণ্ডার সঙ্গে।

অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা।

চার

'খাইছে! আজ আমাদের খাতির গেল কই? পাত্তাই তো দিল না!' মুসা বলল, 'যেন চেনেই না!'

'হ্যাঁ, সেদিনের আচরণের সঙ্গে মেলে না,' একমত হলো রবিন।

'বড়লোকি ঢঙ আরকি,' জিনার রাগ এখনও যায়নি। 'একটা খায়েশ হয়েছিল, পূরণ করেছে। আর দরকার নেই।'

কিশোর কিছু বলছে না। তাকিয়ে রয়েছে জুন যেদিকে গেছে সেদিকে। বুঝতে পারছে, জাহাজে উঠে ভাল করে আরেকবার তদন্ত করার আশা নেই আর। জুন কি কিছু করতে পারবে? নাহ্, পারবে বলে মনে হয় না। ওদেরও আর কিছু করার নেই, অপেক্ষা করা ছাড়া। নাবিকের চোখে শূন্য দৃষ্টি। তার সঙ্গে কথাই বলা যাবে না।

টেনে টেনে চলছে যেন সময়। অস্থির হয়ে উঠেছে ওরা। অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা, 'হলো কি? এতক্ষণ কি করছে জুন?'

'কথা বলছে হয়তো জাহাজের লোকের সঙ্গে,' রবিন বলল।

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'উঁহুঁ। ওই কাজ ওকে দিয়ে হবে না। আমরা যেতে পারলে...'

বাধা পড়ল কথায়। গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে নেমে আসছে আরেকজন নাবিক। এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেমেয়েদের চোখে পড়তে এগিয়ে এল।

'তোমরাই তিন গোয়েন্দা?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'কেন?'

'মিস মরিস একটা মেসেজ দিয়েছে। বলেছে, তার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। তোমরা হোটেলে চলে যাও। পরে দেখা করবে সে। এই টাকাটা দিল। তোমাদের ট্যাক্সি ভাড়া।'

কিশোরের হাতে কয়েকটা নোট ধরিয়ে দিয়ে তাড়াহুড়া করে চলে গেল

লোকটা, গোয়েন্দাদেরকে আরেকবার অবাক করে রেখে।

'বাহ্‌, চমৎকার,' তিক্ত কণ্ঠে বলল জিনা, 'আমাদেরকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে এখন ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে বিদায় দেয়। আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলো ফিরে যাই।'

'বড্ড হতাশ করল,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'মিস্টার বিয়াগুাকে বলে আমাদের নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারত।'

'হয়তো পার্টি দেখে মজে গেছে,' মেজাজ সেই যে খারাপ হয়েছে জিনার, আর ভাল হচ্ছে না। 'এধরনের মেয়েমানুষগুলোর এই তো দোষ। সহজেই সব কিছু ভুলে যায়। চাকচিক্য দেখলে আর হুঁশ থাকে না।'

'আমার মনে হয় খামোকাই দোষ দিচ্ছ,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'জুনকে কিন্তু সে রকম মেয়ে মনে হয় না। রোজার নিখোঁজ। এ সময় সে আর যাই করুক, আনন্দ করার জন্যে পার্টিতে যোগ দেবে না।'

রেগে উঠে আরেকটা জবাব দিতে যাচ্ছিল জিনা, বাধা দিল কিশোর, 'এখানে দাঁড়িয়ে নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করার কোন অর্থ হয় না। আর কিছু করার নেই এখন। চলো, হোটেলে।'

হোটেলে ফিরেও জুনের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে রইল ওরা। কখন ফেরে, কি খবর নিয়ে আসে জানার জন্যে। এমন কোন তথ্য কি দিতে পারবেন মিস্টার বিয়াগুা যাতে তদন্তের সুবিধে হয়? কোন সূত্র?

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। তারপর বাজল টেলিফোন।

লাফ দিয়ে উঠে গেল কিশোর। ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার। 'হালো?'

ওপাশ থেকে শোনা গেল হোটেলের পোর্টারের কণ্ঠ, 'কিশোর পাশাকে চাই। মিস মরিস ফোন করেছেন।'

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে সহকারীদের জানাল কিশোর, 'জুন!' হাত সরিয়ে বলল, 'জুন? আমি, কিশোর? কি ব্যাপার? এত দেরি? কিছু পেলেন?...হায় হায়, কিচ্ছু না? তাহলে এতক্ষণ...'

চুপচাপ ওপাশের কথা শুনল সে। অনেকক্ষণ পর নামিয়ে রাখল রিসিভার। চিন্তার ছাপ পড়েছে মুখে। সবাইকে জানাল, 'একটা কাফে থেকে ফোন করেছিল। বলল, আসতে আরও দেরি হবে। থানায় যাচ্ছে। জাহাজ থেকে নামতেই তার মনে হয়েছে কেউ তাকে ফলো করছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হয়েছিল। দেখে, আরেকটা ট্যাক্সিতে করে দুজন লোক পিছু নিয়েছে তার। সেটা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে একটা কাফের সামনে গাড়ি থামিয়ে ফোন করেছে আমাদের। সোজা থানায় যাবে, যাতে পুলিশকে বলে লোকগুলোকে ধরতে পারে। তার ধারণা, রোজারকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। লোকগুলো তাতে জড়িত। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলল না। হঠাৎ লাইন কেটে দিল।'

শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'খাইছে! জমে উঠছে কাহিনী।'

'হ্যাঁ। তবে জুনের কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হয়েছে আমার। বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। তার কাছে এতটা আশা করিনি।'

'এতে বাড়াবাড়ির কি দেখলে?' রবিনের প্রশ্ন। 'এরকম তো হতেই পারে। রোজারকে কিডন্যাপ করেছে। এখন জুনের পিছে লেগে টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে।'

'হ্যাঁ, হতেই পারে,' মাথা দোলাল জিনা।

ঠোঁটের কাছে একটা আঙুল নিয়ে গিয়েই সরিয়ে আনল কিশোর। 'এভাবে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না আমার। কিছু একটা করা দরকার।'

'কি করবে?'

জবাব দেয়ার অবস্থায় নেই গোয়েন্দাপ্রধান। মুহূর্তে ডুবে গেছে গভীর চিন্তায়। আপনমনেই বিড়বিড় করল, 'আমি বলব...'

'কি বলবে?' বাধা দিল রবিন, 'তোমাকেও *আমি বলব* রোগে ধরল নাকি?'

'উঁ?' আস্তে মাথা ঝাড়া দিল কিশোর। 'আপাতত তো করার কিছু দেখছি না। হলরুমে গিয়ে জুনের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া।'

নিচতলায় নেমে এল সবাই। পুরু গদিমোড়া আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসল। বসে থাকতে থাকতে কখন যে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ল বলতে পারবে না। ডেকে তুললেন পারকার আংকেল আর কেরিআন্টি। পার্টি থেকে ফিরে হলে ঢুকেই চোখ পড়েছে ছেলেমেয়েদের ওপর।

মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। পোর্টারের কাছে জানা গেল, তখনও ফেরেনি জুন। শঙ্কিত হলো কিশোর। খবরটা জানাল মিস্টার পারকারকে।

'হুঁ, চিন্তার কথা। পুলিশকে জানানো দরকার,' বলতে বলতে ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু পুলিশ কিছু জানাতে পারল না। থানায় যায়ইনি জুন। তবে কি সে-ও রোজারের মতই নিখোঁজ হয়ে গেল? নিশ্চয় তাই হয়েছে। নইলে যাবে কোথায়? কাফে থেকে বেরিয়ে থানায় যাওয়ার পথেই কোনখান থেকে উধাও হয়েছে।

'কোথাও হয়তো দেরি করছে,' পারকার বললেন।

'কেন করবে?' কিশোরের প্রশ্ন। 'কোন কারণ তো দেখি না। ওই লোকগুলোরই কাজ। তাকে ধরে নিয়ে গেছে। রোজারকেও ওরাই কিডন্যাপ করেছে।'

সে রাতে ফিরল না জুন। পরদিন সকালেও না। তার নিখোঁজ সংবাদ জানানো হলো পুলিশকে। তাদের খোঁজাখুঁজির তালিকায় আরেকটা নামই কেবল বাড়ল, কোন লাভ হলো না। বের করতে পারল না কিছু।

মুষড়ে পড়ল টমাস। একজন অভিনেতা গেছে, কোনমতে জোগাড় করেছে আরেকজন। এখন অভিনেত্রীও গায়েব। তবে এর পরেও দমল না। জেদ করেছে, যত যা-ই ঘটুক, ছবি শেষ করবেই। শুটিং চালিয়ে গেল। তবে যে যে দৃশ্যে জুনের অভিনয় করার কথা, সেগুলো বাদ দিয়ে। আরেকজন অভিনেত্রী জোগাড় করার আগে আর সেগুলো সম্ভব হবে না।

'পুলিশ ঠিকই খুঁজে বের করবে,' আশা ছাড়তে পারল না টমাস। 'দু-একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে।'

কিন্তু তার আশা নিরাশায় পরিণত হলো। কোন খোঁজই পেল না পুলিশ। যে ট্যাক্সিতে করে থানায় যাচ্ছিল জুন, সেটারও কোন হদিস বের করতে পারল না। শেষে রেডিওতে ঘোষণা করে অনুরোধ জানাল, ট্যাক্সি ড্রাইভার যেন এসে যোগাযোগ করে।

তাতেও ফল হলো না। কেউ এল না পুলিশের কাছে।

সেদিন সকাল বেলা একদফা শুটিং হয়ে গেছে। তারপর বসে আলোচনা করতে লাগল রোজার আর জুনের নিরুদ্দেশ নিয়ে। টমাসের মতই ওদেরও মন খারাপ।

'এখন আর কোন সন্দেহ নেই আমার,' কিশোর বলল, 'জুনকেও কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'কেন করল?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'আর কেন? টাকার জন্যে,' জবাব দিয়ে দিল মুসা।

'তাহলে এতদিনেও টাকা চেয়ে পাঠাল না কেন?' ভুরু নাচাল জিনা।

'আমি কি ভাবছি জানো?' চারজোড়া আগ্রহী চোখের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'রোজারকে কিডন্যাপ করার পেছনে অন্য কোন কারণ আছে। সেটা বোধহয় আঁচ করে ফেলেছিল জুন, তাই তাকেও গাপ করে দেয়া হয়েছে। তা করুক, আপত্তি নেই। মেরে না ফেললেই হলো,' রহস্যটা জমাট বাঁধছে বলে যেন মজাই পাচ্ছে কিশোর। 'এবার মনে হচ্ছে সিরিয়াসলি তদন্তে নামা উচিত আমাদের।'

পাঁচ

সেদিন বিকেলে থানায় রওনা হলো ওরা, ইন্সপেক্টর স্মিথের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। জুনের নিখোঁজের ব্যাপারে একটা বিবৃতি সই করতে হবে।

মন দিয়ে ওদের কথা শুনলেন ইন্সপেক্টর। বিবৃতি লেখা হলো। তিন গোয়েন্দার পক্ষ থেকে সই করে দিল কিশোর। ইন্সপেক্টরকে কয়েকটা প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে গেল।

'জুন খুব ভাল,' বেশ কায়দা করে কথা শুরু করল সে। 'তার খারাপ কিছু ঘটে যাবে একথা ভাবতেই পারি না। যতদূর বোঝা গেল, সব শেষে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে দুই জন লোকের। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার, আরেকজন মিস্টার জনি বিয়াণ্ডা। আচ্ছা, জাহাজ থেকে জুন যখন নেমে গেল, তখন কি এমন কিছু চোখে পড়েছে মিস্টার বিয়াণ্ডার, যেটা সন্দেহজনক? বলেছে কিছু আপনাকে?'

হাসলেন ইন্সপেক্টর। পত্রিকার কল্যাণে তিন গোয়েন্দা এবং তাদের কাজকর্মের কথা তাঁরও অজানা নয়। প্রশ্নগুলো কেন করছে কিশোর বুঝে ফেললেন। এখানেও তাদের তদন্ত চালাচ্ছে। তা চালাক, অসুবিধে নেই। পুলিশের কাজে নাক না গলালে আর নিজেদের বিপদে না ফেলে দিলেই হলো।

'তোমাদের আগেই এসে বয়ান দিয়ে গেছেন মিস্টার বিয়াণ্ডা,' জানালেন

ইন্সপেক্টর। 'ডাকতে হয়নি। নিজেই এসেছিলেন থানায়।'

কোটিপতির সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সেটা টেপে রেকর্ড করে রেখেছেন। টেপটা চালিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর।

'মিস মরিসের এমন একটা বিপদ হয়ে গেল, সত্যি খুব খারাপ লাগছে আমার,' বিয়াগুা বলছেন। 'রেডিওতে শুনলাম খবরটা। বেচারি। কাল সন্ধ্যায় দেখা করতে গিয়েছিল আমার জাহাজে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তার কয়েকজন কিশোর বন্ধুকে। তিন গোয়েন্দা। যদিও ছিল ওরা চারজন। একটা কুকুরও ছিল সঙ্গে। যাই হোক, কাল সবাইকে জাহাজে উঠতে দিতে পারিনি। বোঝাই হয়ে ছিল ইয়ট, এক তিল জায়গা ছিল না। মিস মরিস বলল আমার সঙ্গে নিরালায় কথা বলতে চায়। তাই তাকে আমার স্টাডিতে নিয়ে গেলাম। তার প্রেমিকের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করল। কোন কিছু মনে করতে পারছি কিনা জানতে চাইল। আমার জাহাজে পার্টিতে গিয়েই উধাও হয়েছিল লোকটা। তার নাম রোজার মরভিস, অভিনেতা, আপনি জানেন। ওই ঘটনাটার জন্যেও অস্বস্তি বোধ করছি আমি। আমার জাহাজে পার্টিতে গিয়েই নিখোঁজ হয়েছে লোকটা। কেউ না বললেও একটা দায়িত্ব বোধ করছি আমি। মনে হচ্ছে দাওয়াত দিয়েই অপরাধটা করেছি। মিস মরিসকে নতুন কিছুই জানাতে পারলাম না। শুধু মনে আছে স্যালুনে তার সঙ্গে কথা বলার পর পরই বেরিয়ে গিয়েছিল মরভিস। তারপর আর তাকে দেখিনি।'

'মিস মরিস অনেকক্ষণ ছিল আপনার সঙ্গে, মিস্টার বিয়াগুা?' ইন্সপেক্টরের প্রশ্ন।

'তা ছিল, ইন্সপেক্টর। সত্যি কথাই বলি, তার থাকাতে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। তার দিকে ভালমত নজর দিতে পারিনি বলে। অনেক মানুষকে দাওয়াত করেছিলাম, কি করব বলুন? মেয়েটার জন্যে আমার খারাপই লাগছিল। মনমরা হয়ে ছিল। নতুন কিছু বলতে পারিনি, কোন সাহায্য করতে পারিনি। তবে খুশি করার আন্তরিক চেষ্টা করেছি। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি, পুলিশ তার প্রেমিককে শীঘ্রিই খুঁজে বের করবে। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। না, সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েনি। হতে পারে, মেহমানদের কাছে ফিরে যাওয়ার তাড়া ছিল বলে খেয়াল করার সুযোগই পাইনি।'

মিস্টার বিয়াগুার বিবৃতি থেকে কোন তথ্যই পাওয়া গেল না।

ইন্সপেক্টরকে ধন্যবাদ জানিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। কোন কাজই হয়নি। মুখ কালো করে ফিরে চলল স্টুডিওতে। সেদিন আরও একটা দৃশ্যের কাজ বাকি। ডক নরম্যান আর রাফির একটা শট নেয়া হবে।

কাজ শেষ হলো। এখানে আর কিছু করার নেই। এত সকাল সকাল ঘরে ফিরতেও ইচ্ছে করল না। সৈকতে চলল ওরা। বসে খানিক হাত-পা ছড়িয়ে নেবে।

'কি ভাবছ, কিশোর?' আচমকা প্রশ্ন করল মুসা।

'দুটো কথা খচখচ করছে আমার মনে। এক, যে ট্যাক্সিতে করে গিয়েছিল জুন, তার ড্রাইভার পুলিশের সঙ্গে দেখা করল না কেন? রেডিওতে বার বার অনুরোধ

করা হয়েছে। তার কানে না যাওয়ার কথা নয়। সে নিশ্চয় বুঝতে পারছে তার বিবৃতি অনেকটা সাহায্য করবে পুলিশের কাজে।'

'হয়তো তাকেও কিডন্যাপ করা হয়েছে,' রবিন বলল।

'তাহলে জানা যেত। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার নিখোঁজ হয়েছে, রিপোর্ট হত থানায়। ওর এই চুপচাপ থাকাটা অস্বাভাবিক লাগছে আমার কাছে।'

'আর দ্বিতীয় কথাটা?' জানতে চাইল জিনা।

'রবিন, জুনের ফোন পাওয়ার পর তুমি আমাকে ঠাট্টা করেছিলে, আমাকেও আমি বলব রোগে ধরেছে কিনা। আসলে রোগ নয়। ওই শব্দ দুটো নিয়েই ভাবছিলাম আমি।'

হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা, 'ঠ্যালা সামলাও এখন। আরম্ভ করেছে গ্রীক ভাষা। আরে বাবা একটু সহজ করে বলো না। বুঝি না তো কিছু।'

'সহজই। পুরো ব্যাপারটা শুনলেই বুঝবে। জুনের মুদ্রাদোষ হলো কথার শুরুতে বলে *আমি বলব।* কিন্তু সেদিন ফোনে কথা বলার সময় প্রায় প্রতিটি বাক্যের শুরুতেই বলেছে আমি বলব।'

'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? সাংঘাতিক উত্তেজিত ছিল সে তখন।'

'বেশি উত্তেজিত হলে তুমি কি করো? দু-একবার *খাইছে, আল্লাহরে,* এসব বলো। তোতলাও। সেসব চলে আসে স্বাভাবিক ভাবে। ইচ্ছে করে কোন কিছু বার বার বলতে যাও না।'

কপাল কুঁচকে গেল রবিনের। 'কি বলতে চাইছ তুমি, বলো তো কিশোর?'

'সেদিন ফোনে কথা বলার সময় বার বার *আমি বলব, আমি বলব* করেছে জুন। আমার ধারণা, ইচ্ছে করেই করেছে।'

'কেন করবে?' জিনার প্রশ্ন।

'নিজেকে জুন বলে চালিয়ে দেয়ার জন্যে।'

বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল বাকি তিনজনেই।

মুসা বলল, 'বলো কি? তার মানে...'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না কিশোর, 'জুনের গলার সঙ্গে মিল আছে বটে, তবে জুনের গলা ছিল কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

দুর্জন লোক এসে বসল ওদের কাছাকাছি। এখানে আর নিরাপদে আলোচনা করা যাবে না বুঝে উঠে এসে দূরে আরেকটা নির্জন জায়গায় বসল ওরা।

আগের কথার খেই ধরে বলতে থাকল কিশোর, 'পোর্টার বলল, মিস মরিস আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ফোনে শুনতে পেলাম একটা মহিলাকণ্ঠ, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, *"হালো, আমি বলছি, আমি জুন!"* তখন মনে হলো জুনই বলছে। সন্দেহ করার কোন কারণ তখনও ঘটেনি। কিন্তু তারপর যতই ভাবার সময় পেলাম ততই শিওর হলাম ওটা জুনের গলা নয়।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ,' গলা কাঁপছে রবিনের, 'জুনের স্বর নকল করে কেউ আমাদের ফাঁকি দিতে চেয়েছে?'

'সে রকমই তো মনে হচ্ছে এখন। ওই ফোনটা করার আগেই জুনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। মিস্টার বিয়াগু যে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছেন জুনকে, সেটা

কিডন্যাপারদের গাড়ি। এভাবে ভাবলে অনেক কিছু মিলে যায়।'

ঘুরে কিশোরের মুখোমুখি হলো মুসা, 'কিডন্যাপার! কিন্তু জুনকে কেন কিডন্যাপ করল? কি কারণ?'

'হউ! হউ!' করে রাফিও যেন জিজ্ঞেস করতে চাইল, হ্যাঁ, কি কারণ?

'ঠিক, কারণ তো একটা থাকতে হবে,' জিনাও বলল। 'টাকা চেয়ে পাঠায়নি এখনও। তার মানে টাকার জন্যে করেনি।'

'কিসের জন্যে করেছে, তদন্ত করলেই সেটা বেরিয়ে পড়বে,' ওদের মত উত্তেজিত হলো না কিশোর, শান্তকণ্ঠে বলল। রোজার আর জুনকে আমরা খুঁজে বের করবই।'

'কি ভাবে?' প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করল তার দুই সহকারী।

'এখনও জানি না। সেদিন সন্ধ্যার ঘটনাটা গোড়া থেকে ভেবে দেখি আবার,' বলে এক মুহূর্ত থামল কিশোর। নাক চুলকাল। তারপর বলল, 'জুনের ওপর চোখ রেখেছিল কিডন্যাপাররা। তার সঙ্গে আমরা যখন বন্দরে গেলাম, ওরাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। আমাদের মতই ওরাও জাহাজ থেকে তার নামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। গাধার মত আমরা হোটেলে ফিরে গিয়ে ওদের কাজ সহজ করে দিলাম। তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যেতে আর কোন বাধাই পেল না ওরা। হোটেলে না গিয়ে আমরা যদি দাঁড়িয়ে থাকতাম, কোন না কোনভাবে তখন আমাদের সরানোর চেষ্টা করতই কিডন্যাপাররা। কিংবা ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করত। সন্দেহ জাগত আমাদের। হয়তো জুনের নিখোঁজ হওয়া ঠেকাতে পারতাম।'

চুপ করে আছে সবাই। কিশোরের কথা শুনছে।

আবার বলল সে, 'একটা ব্যাপারে জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে, যে ভাবেই ধরে নিয়ে যাওয়া হোক, জুন আর রোজার আছে এখন কিডন্যাপারদের খপ্পরে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু তাদেরকে উদ্ধার করছি কি ভাবে?'

'আগে জানতে হবে ওরা আছে কোথায়। সেটা জানার জন্যে দলের অন্তত একজনকে চিনতে হবে আমাদের। যাদেরকে সন্দেহ হবে তাদের ওপর নজর রাখতে হবে।'

কাদেরকে সন্দেহ করা হবে, আলোচনা করে ঠিক করার পালা এরপর। একটা তালিকা করতে হবে।

'আমাদের প্রথম সন্দেহ হবে টেলিভিশনের লোকেরা,' মুসা বলল। 'জুন আর রোজারের ব্যাপারে তাদেরই বেশি জানার কথা। গোপন কিছু জেনে ফেললে আগ্রহী হওয়ার কথা।'

'দূর,' হাত নাড়ল জিনা, 'আমার তা মনে হয় না। টেলিভিশনের কাকে সন্দেহ করব আমরা? সবার সঙ্গেই তো দেখলাম দুজনের খুব ভাব। কাউকেই শত্রু মনে হলো না। তাছাড়া ডক তো রোজারের ভাইই।'

'বাইরে থেকে ভাল মনে হলেই যে ভাল হয়ে যাবে এটা ভাবার কোন কারণ নেই,' তর্ক করে বোঝানোর চেষ্টা করল মুসা। 'কার মনে যে কি আছে কি করে

বুঝব?'

'মুসা ঠিকই বলেছে,' সমর্থন করল কিশোর। 'ভাল করে বুঝেশুনে একজন একজন করে বাদ দিতে হবে সন্দেহের তালিকা থেকে। কাল থেকেই সন্দেহভাজনদের ওপর নজর রাখতে আরম্ভ করব। সাবধান থাকতে হবে আমাদের। কিছুতেই বুঝতে দেয়া চলবে না যে ওদের সন্দেহ করছি আমরা।'

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে স্টুডিওতে এল গোয়েন্দারা। ওদের সন্দেহের তালিকায় রয়েছে হেনরি টমাস, ডক নরম্যান, রলি বিংহ্যাম ও বব উইলস। ক্যামেরাম্যান আর টেকনিশিয়ানরাও বাদ পড়েনি। তালিকার নিচে আরও দুটো নাম যোগ করা হয়েছে *জনাব ক* ও *জনাব খ* নাম দিয়ে। রহস্যময় যে দুজন লোক জুনকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে গেছে বলে ভাবা হচ্ছে তাদের নাম তো জানা নেই, তাই এভাবে নামকরণ হয়েছে।

টমাসকে শুরুতেই বাদ দিয়ে দেয়া হলো। কারণ প্রধান দু'জন অভিনেতাকে গায়েব করে দিয়ে নিজের ছবির গোড়ায় কুড়াল মারবে না সে। তাছাড়া লোকটা ভাল। অপছন্দ করার মত কোন কিছু তার মধ্যে দেখেনি ছেলেমেয়েরা। রহস্যময় কোন আচরণও করছে না।

ডক অবশ্য আজ স্বাভাবিক আচরণ করছে না। করতে পারছে না। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। মনে কোন দুশ্চিন্তা থাকলে যেমন হয়। মেজাজও ভাল নেই।

'অপরাধবোধ থেকেই হচ্ছে এরকম,' ফিসফিস করে বলল মুসা।

রলি বিংহ্যামেরও মেজাজ-মর্জি ভাল নেই। কথায় কথায় রেগে উঠছে। রোজার আর জুনের এভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটাই হয়তো তার স্নায়ুতে চাপ দেয়ার কারণ।

'বড় বেশি অস্থির,' রবিন বলল চিন্তিত ভঙ্গিতে। 'একদিনেই স্বভাবের এতটা পরিবর্তন, ভাল মনে হচ্ছে না!'

'যত যা-ই বলো তোমরা,' প্রতিবাদ করল জিনা, 'আমি এদের একজনকেও কিডন্যাপার বলতে পারব না। মানুষের মনমেজাজ খারাপ হওয়ার হাজারটা কারণ থাকে।'

'বব উইলসও কিন্তু আজ স্বাভাবিক আচরণ করছে না,' কিশোর বলল। 'রোজারের সুনামের ওপর কিছুটা জেলাস ছিল সে, আগেই লক্ষ করেছি। রোজার নিখোঁজ হওয়াতে বিন্দুমাত্র দুঃখ পাচ্ছে না বব। বরং একটা খুশি খুশি ভাব দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে।'

সারা দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সন্দেহভাজনদের ওপর কড়া নজর রাখল গোয়েন্দারা। লাভ হলো না। কোন সূত্র পাওয়া গেল না। টমাস বাদে আর কাউকে তালিকা থেকে বাদ দিতে পারল না। কারও প্রতি সন্দেহও বাড়ল না। মোট কথা, তদন্তে একটা ধাপও এগোলো না।

ছয়

সেদিন শুটিং শেষে আবার আলোচনায় বসল ছেলেমেয়েরা।

'যতই ভাবছি ব্যাপারটা নিয়ে,' কিশোর বলল, 'ততই সন্দেহ হচ্ছে, যাকে খুঁজছি আমরা সে স্টুডিওতে নেই। রোজারকে কিডন্যাপ করে এখানকার কারও কোন লাভ তো দেখতে পাচ্ছি না। কোন মোটিভ নেই, তবে জুনকে...'

থেমে গেল সে। চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে।

'চুপ করে গেলে কেন?' তাগাদা দিল মুসা। 'জুনকে কি? বলো?'

'জুনকে সহজেই কিডন্যাপ করা সহজ ছিল একজনের পক্ষে। তবে যার কথা বলছি তারও কোন মোটিভ নেই।'

'কার কথা বলছ?' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা।

'মিস্টার বিয়াগু।'

'বিয়াগু!' মুসা, রবিন, জিনা, চমকে গেল তিনজনেই।

'হ্যাঁ। তাঁর পক্ষেই সব চেয়ে সহজ। মনে করে দেখো, নিজের ইচ্ছেতেই জাহাজে উঠেছে জুন। তাকে কেবল আটকে ফেলা, আর কিছু করার দরকার নেই। তারপর মিথ্যে কথা বলে আমাদেরকে হোটেলে ফেরত পাঠানো, ব্যস...'

'কিশোর, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! স্টুডিওতে পরিচয় হওয়ার আগে রোজার আর জুনকে চিনতেনই না মিস্টার বিয়াগু।'

সরাসরি মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'পরিচয় যে ছিল না একথা কি করে জানছি? অপরিচিতের ভানও তো করে থাকতে পারেন। প্রমাণ তো আর নেই।'

'কিন্তু রোজার আর জুন যে ভান করেনি এটা ঠিক। তারা সত্যিই চিনত না।'

'তা ঠিক। আগে আমাকে শেষ করতে দাও। আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে হোটেলে পাঠানোর পর আর কোন ঝামেলা রইল না। ট্যাক্সিরও দরকার পড়েনি বিয়াগুর। জুনকে জাহাজে আটকে রেখেছেন। তারপর অন্য কোন মেয়েকে পাঠিয়েছেন আমাদের ফোন করার জন্যে। কেমন লাগছে শুনতে? মেলে?'

সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। বলল, 'কিন্তু ফোনটাই বা করার কি দরকার ছিল?'

'জাহাজে যে জুন নেই, এই সন্দেহটা দূর করার জন্যে। সবাই ভাববে, হোটেলে কিংবা অন্য কোথাও ফিরে যাচ্ছিল জুন, এই সময় দুজন লোক তার পিছু নিয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

কিশোরের কথায় যুক্তি আছে, মেনে নিতে পারছে না তবু মুসা। 'অতিকল্পনা হয়ে গেল না? একাজ কেন করতে যাবেন বিয়াগু? তাঁর টাকার অভাব নেই যে আটকে রেখে টাকা আদায়ের জন্যে কাউকে কিডন্যাপ করবেন।'

'করলে কেন করেছেন জানি না এখনও। করেছেনই, একথাও বলছি না। বলছি, তাঁর পক্ষেই করা সব চেয়ে সহজ।'

'হুঁ, বুঝলাম,' রবিন বলল। 'তো এখন কি করবে?'

'ইন্সপেক্টর স্মিথের কাছে যাব। আমার সন্দেহের কথা জানাব তাঁকে।'

চুপচাপ সব শুনলেন ইন্সপেক্টর। নীরব একটা হাসি দিয়ে মোলায়েম গলায় বললেন, 'তোমার কল্পনাটা একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার আগে কোন প্রমাণ আছে কিনা শিওর হয়ে নেয়া উচিত। কতটা বোকামি করছ, বুঝতে পারছ সেটা?'

লাল হয়ে গেল কিশোরের গাল। তার দিকে তাকাল মুসা। চোখে চোখ পড়ল। দৃষ্টি দিয়েই বুঝিয়ে দিল, আমি আগেই বলেছিলাম এভাবে হুট করে ইন্সপেক্টরের কাছে আসার দরকার নেই। তিনি ভাল লোক, সন্দেহ নেই, কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার নন যে আমরা বললেই বিশ্বাস করে ফেলবেন।

কিশোরকে কথা বলতে না দেখে আবার বললেন ইন্সপেক্টর, 'মিস্টার বিয়াঙ্কো একজন সম্মানিত মানুষ। সৎ লোক। ধনী লোক। সব সন্দেহের উর্ধ্বে। হতে পারে, কাকতালীয় ভাবে ঘটনাগুলো তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি একাজ করতেই পারেন না।' কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে নরম হলেন তিনি। 'যাই হোক, তোমার সন্দেহের কথা আমাকে জানানো এজন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আবারও বলছি, তোমার সন্দেহের কোন ভিত্তি নেই। কেন দুজন অভিনেতাকে কিডন্যাপ করবেন তিনি, তার কোন যুক্তি নেই। আমার বিশ্বাস, মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের জন্যেই দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে কেউ। ওরা নিজে থেকে এগিয়ে না এলে আপাতত কিছু করার নেই আমাদের।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। আর কিছু বলার নেই। বেরিয়ে এল থানা থেকে। বাইরে বেরিয়ে ফিরে তাকাল একবার বাড়িটার দিকে। মুহূর্তের জন্যে শক্ত হয়ে গেল ঠোঁটজোড়া। তার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝে ফেলল তার দুই সহকারী রবিন আর মুসা, রাগিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিডন্যাপারদের না ধরা পর্যন্ত আর সে ক্ষান্ত হবে না।

সময় কাটতে লাগল। মুক্তিপণ চেয়ে কোন মেসেজ এল না কিডন্যাপারদের কাছ থেকে।

অস্থির হয়ে পড়ল টমাস। ছবিটা শেষ করতে হলে জুনের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকলে আর চলবে না। অন্য একজনকে জোগাড় করে নিতে হবে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিল। যেদিন বেরোল বিজ্ঞপ্তিটা সেদিনই দেখা করতে এল একটা মেয়ে। একেবারে আনকোরা নয়, আগেও কাজ করেছে টেলিভিশনে। বয়েস আর উচ্চতা জুনেরই সমান। নাম মলি অ্যালকট।

সংক্ষিপ্ত একটা পরীক্ষা নিয়েই তাকে কাজে বহাল করে দিল টমাস। ছবিতে যারা যারা কাজ করছে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। নবাগতাকে দেখে কে কতটা খুশি হলো বোঝা গেল না, তবে অনেকেই বোধহয় তাকে মেনে নিতে পারল না। অন্তত কিশোরের সে রকমই মনে হলো। রাশি যে নিল না সেটা সঙ্গে

স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল। অদ্ভুত আচরণ শুরু করল। ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে গরগর করতে লাগল মলির দিকে তাকিয়ে।

'আশ্চর্য!' নিচু গলায় বলল জিনা। 'মানুষকে নিয়ে অহেতুক মাথাব্যথা নেই ওর। নিশ্চয় কোন কারণে সন্দেহ করেছে।'

কেন একটা অপরিচিত মেয়েকে সন্দেহ করবে রাফি, বুঝতে পারল না গোয়েন্দারা।

তবে সেটা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানোর সময়ও পেল না। নায়িকা জোগাড় হয়ে যেতেই আউটডোর শুটিঙে চলল টমাস। চলে এল শহরের বাইরে একটা শুটিং স্পটে। অনেক সময় নিয়ে একটা দৃশ্যের শট নেয়ার পর কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রামের ছুটি দিল পরিচালক।

কেউ বসল হাত-পা ছড়িয়ে। কেউ গাছতলায় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। ছেলেমেয়েরা চলল অঞ্চলটা ঘুরে দেখতে। ঘন করে পাতাবাহার লাগিয়ে বেড়া দেয়া রাস্তার ধার দিয়ে যাচ্ছে, এই সময় কানে এল পরিচিত কণ্ঠ।

পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল ওরা। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটা শক্তিশালী ইঞ্জিনওয়ালা স্পোর্টস কার। ড্রাইভিং হুইলে বসা এক তরুণের সঙ্গে কথা বলছে মলি।

'নিশ্চয় চেনা লোক,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'না হলে কি আর বলছে,' জিনা বলল। 'যাচ্ছিল হয়তো এপথেই। একজন আরেকজনকে দেখে থেমেছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' দুজনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর। 'চেনে তো বটেই। কিন্তু হঠাৎ করে পথে দেখা হয়ে যায়নি। জানে, কোথায় দেখা করতে হবে।'

'তাতেই বা সন্দেহের কি আছে?' মুসার প্রশ্ন।

'হয়তো প্রেমিক-প্রেমিকা। রোজার আর জুনের মত। মলিকে অভিনয় করতে দিতে রাজি নয়, সেটা নিয়েই কথা কাটাকাটি করছে,' অনুমান করল জিনা।

তার কথাটা উড়িয়ে দেয়া গেল না। কথা বলতে বলতে সত্যিই রেগে উঠল লোকটা। তবে কি বলছে স্পষ্ট করে শোনার জন্যে আরেকটু সরে এল কিশোর। পেছনে এল তার সহকারীরা।

লোকটা বলছে, 'কাজটা করা তোমার একেবারেই উচিত হয়নি। কি দরকার ছিল বিজ্ঞাপনে সাড়া দেয়ার? তখনও বলেছি ঠিক হয়নি, এখনও বলছি। তোমার গলা চিনে ফেলতে পারে ছেলেমেয়েগুলো। তারপর পড়বে বিপদে। বস্ শুনলে ভীষণ রেগে যাবেন।'

'পিটার, তোমাকে কতবার বলব, আমি অভিনয় ভালবাসি। বড় অভিনেত্রী হতে চাই। সুযোগ বার বার আসে না। এল যখন ছাড়ব কেন? তোমার বস্ কেন রেগে যাবেন আমি বুঝতে পারছি না।'

'পারছ না, না?'

'না, সত্যিই পারছি না। আসলে তুমিই জেলাস হয়ে উঠেছ। একটা কথা

স্পষ্ট বলে দিতে চাই, বস্ ছাড়া আর কারও ধমক সহ্য করব না আমি। তোমারও না।'

সাংঘাতিক রেগে গেল লোকটা। বোঝা গেল তার গাড়ির লাফ দেয়া দেখেই। প্রচণ্ড এক ঝটকা দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি, তারপর ছুটতে শুরু করল। মোড়ের কাছে গিয়েও গতি কমাল না। টায়ারের প্রতিবাদ তুলে ঘুরল। অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশে।

'যাক,' হাসিমুখে বলল কিশোর, 'পরিস্থিতি বদলাতে আরম্ভ করেছে। জল গড়াচ্ছে অবশেষে।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'মানে কিছু প্রশ্নের জবাব মিলে গেল।'

'কি প্রশ্ন?'

'সব কথা ভেঙে না বললে কিচ্ছু বোঝো না। অনেক কিছুই তো জেনে গেলাম। মলি আর পিটার একটা অপরাধী দলের সদস্য। কোন একটা পরিকল্পনা করেছে আমাদের ছবিটার বিরুদ্ধে। হয়তো ভণ্ডুল করতে চাইছে সব কিছু। সে জন্যেই তুলে নিয়ে গেছে রোজার আর জুনকে। পিটারের ভয়, মলির গলার স্বর আমরা চিনে ফেলতে পারি। তারমানে সে জানে, ওই গলা আমরা শুনেছি। কোথায়, বুঝতে পারছ না?'

'সেই মেয়েটা,' বলে উঠল রবিন। 'যে জুন সেজে সেদিন ফোন করেছিল তোমাকে!'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু,' জিনা বলল, 'বসটা কে আমরা এখনও জানি না। বিয়াণ্ডার নাম কিন্তু বলা হয়নি।'

'না বলুক। একটা মূল্যবান সূত্র তো পেলাম। মলির ওপর নজর রাখব। সে-ই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার বসের কাছে।'

সাত

রোজার আর জুন নিরুদ্দেশ হয়ে টমাসের পরিকল্পনায় অনেকখানি গড়বড় করে দিয়েছে। বেশ কয়েকটা দৃশ্যের আবার নতুন করে শট নিতে হবে। যেদিন পিটার আর মলির রহস্যময় কথাবার্তা শুনল গোয়েন্দারা, তার পরদিন আবার গুহায় শট নেয়ার জন্যে সেট সাজাল টমাস। প্লাইউড, কার্ডবোর্ড আর পলিসটাইরিনে তৈরি কৃত্রিম গুহাটা দেখতে একেবারে আসলের মতই লাগে। ওপরে প্রায় আলগা হয়ে ঝুলে রয়েছে বড় বড় পাথর। দেখতে অবিকল পাথরের মত, কিন্তু কাঠের তৈরি ওগুলো।

কি কি করতে হবে অভিনেতাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছে টমাস। গুহার মধ্যে আলোচনায় বসবে ডাকাতেরা। কথায় বনবে না বলে রেগেমেগে বেরিয়ে আসবে এক ডাকাত। এই অভিনয়টার ভার পড়ল ডকের ওপর।

ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে শুটিং দেখছে গোয়েন্দারা। তাদের পালা আসার অপেক্ষায় রয়েছে। রাফিও শান্ত হয়ে আছে। একবার গায়ে রঙ মেখেই যথেষ্ট শিক্ষা

হয়েছে তার।

'বুঝলে তো?' ডককে বলছে টমাস, 'খুব রাগ দেখাবে। তারপর হাত মুঠো করে ঝটকা দিয়ে ঘুরে গটমট করে বেরিয়ে আসবে গুহা থেকে। যাও, বসো।'

শুটিং শুরু হলো। চমৎকার অভিনয় করল ডক। এমন করে বেরোতে গেল গুহা থেকে, যেন সত্যি সত্যি রেগে গেছে। ধীরে ধীরে পেছনে সরানো হচ্ছে ক্যামেরা।

হঠাৎ করেই ঘটল ঘটনাটা। চমকে দিল সবাইকে। গুহামুখে সবে বেরিয়েছে ডক এমন সময় ওপর থেকে বিরাট একটা কৃত্রিম পাথর খসে পড়ল তার কাঁধে।

ব্যথায় চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল সে। গোঙাতে লাগল।

সবার আগে দৌড়ে গেল টমাস। ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই ডক, ডক, বেশি ব্যথা!'

'কাঁধে লেগেছে…উফ্!'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। তার কাছে ঝুঁকে বসল জিনা। 'দাঁড়ান, নড়বেন না। জ্যাকেটটা খুলে দিই।'

কিন্তু সামান্য নাড়াচাড়া করলেই ব্যথায় গুঙিয়ে ওঠে ডক।

'ডাক্তার ডাকা ছাড়া পথ নেই।' একজন সহকারীকে বলল টমাস, 'কুইক!'

ফোনের দিকে দৌড় দিল টেকনিশিয়ান। ডাক্তার আসতে দেরি হলো না। আহত লোকটার কাঁধের হাড় পরীক্ষা করে বললেন, 'জোড়া থেকে সরে গেছে। তেমন খারাপ কিছু নয়, তবে সারতে সময় লাগবে। হাড় ভেঙেছে বলে মনে হয় না। এক্স-রে না করলে শিওর হতে পারব না। দেখি, অ্যামবুলেন্সের জন্যে খবর দিই।'

ব্যথায় ককাচ্ছে, তারপরেও ছবিটার কথা ভেবে আকুল হচ্ছে বেচারা ডক। দোষারোপ করছে নিজেকে। 'পড়ার আর সময় পেল না! একের পর এক অঘটন…টমাস, কি করে সামলাবে সব?'

'সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল টমাস। 'ব্যবস্থা একটা হবেই। তুমি চুপ করে থাকো। কথা বললে কষ্ট হবে।'

ওরা কথা বলতে বলতেই হাজির হয়ে গেল অ্যামবুলেন্স। খুব সাবধানে তাতে ডককে তুলে নেয়া হলো।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কেউ আসব আপনার সঙ্গে?'

কিন্তু ডককে জবাব দেয়ার সুযোগই দিল না টমাস, 'না না, তোমাদেরকে আসতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। এক্স-রের রেজাল্ট না দেখে আসব না। জানতে হবে অবস্থা কতটা খারাপ। বেশি খারাপ না হলেই বাঁচি। তোমরা ততক্ষণে পাঠ মুখস্থ করে ফেলো।'

অ্যামবুলেন্সে উঠে বসল সে। স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি। বেরিয়ে গেল ড্রাইভওয়ে ধরে।

প্রায় বারোটা বাজে। গোয়েন্দাদেরকে লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে হোটেলে চলে যেতে বলল অন্যান্য অভিনেতারা।

'খেয়ে বেশি দেরি কোরো না,' রলি বিংহ্যাম বলল। 'ডকের কি অবস্থা ততক্ষণে জেনে যাব আমরা। ভাগ্যিস আজ বিকেলের শটটাতে তার ভূমিকা নেই।'

হোটেলে ফিরে দ্রুত লাঞ্চ সেরে নিতে লাগল ছেলেমেয়েরা।

পারকার আংকেল জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি আবার এখন স্টুডিওতে যাবে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জিনা। 'ডকের অবস্থা কতটা খারাপ জানা দরকার।'

খেয়েই বেরিয়ে পড়ল ওরা। চলে এল স্টুডিওতে। মলি, রলি আর অন্য অভিনেতা-টেকনিশিয়ানরা আগেই এসে বসে আছে।

'কোন খবর পেলেন?' রলিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কি বলল হাসপাতাল থেকে?'

'কোন খবরই নেই। হেনরিও আসেনি।'

'ফোনও না?' মুসা জানতে চাইল।

'না। এত তাড়াহুড়া করে গেল, অথচ···'

'অবাক কাণ্ড!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে গিয়েও কাটল না কিশোর। 'হাসপাতালে আপনারা একটা ফোন করলেও তো পারতেন?'

রলি বিংহ্যামের গোলগাল মুখটা লাল হয়ে গেল। 'তাই তো, এই কথাটা মনে পড়েনি এতক্ষণ! দাঁড়াও, এখুনি করছি।'

তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে এল সবাই। ডকের খবর জানতে চায়। কিন্তু ওপাশের কথা শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে গেল রলির। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'কি বললেন? কিন্তু আমার চোখের সামনে অ্যামবুলেন্স এসে ডককে তুলে নিয়ে গেল! শুধু আমি একা না, আরও অনেকে দেখেছে।'

আবার চুপ করে ওপাশের কথা শুনতে লাগল সে। তারপর বলল, 'টিভিতে অভিনয় করে ও। তার সঙ্গে গেছে ডিরেক্টর হেনরি টমাস। সবাই তো চেনে ওকে।···হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্লীজ! আরেকবার চেক করে দেখুন। আমরা সবাই অস্থির হয়ে আছি।'

আবার নীরবতা।

উত্তেজনায় ফেটে যাবে যেন কিশোর।

শুনতে শুনতে মরার মুখের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল রলির মুখ। আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল। মাথা নেড়ে বলল, 'ডক নরম্যান নামে কাউকেই নাকি নেয়া হয়নি আজ হাসপাতালে। অদ্ভুত ব্যাপার! সেই কখন গেল, এখনও পৌছেনি! এ হতে পারে না···'

বেজে উঠল আবার টেলিফোন। সবার আগে ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। ফোন বাজতেই তার মনে হচ্ছিল, তাকেই করা হয়েছে। ঠিকই। ফোন করেছেন ইন্সপেক্টর স্মিথ, 'হালো, ওখানে কিশোর পাশা আছে?'

'আমিই বলছি, স্যার।'

'কিশোর, শোনো, একটা খারাপ খবর আছে। তোমাদের ডিরেক্টর টমাসকে পাওয়া গেছে একটা নির্জন গলির মধ্যে। বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।'

'সর্বনাশ! এখন কোথায়?'

'তার বন্ধুর একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করল। বাড়ি মেরে বেহুঁশ করা হয়েছে। তেমন জখম হয়নি। তোমাদেরকে চিন্তা না করতে বলেছে। কাল সকালের মধ্যেই ফিরে আসবে।'

ইলেকট্রিক শক খেয়েছে যেন কিশোর। 'কি হয়েছিল বলেছে কিছু?'

'বেশি কিছু বলতে পারেনি। তার এই অবস্থায় আমরাও বেশি চাপাচাপি করিনি। বলল, তার সহকারী ডক নরম্যানকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিল। হঠাৎ সামনে থেকে এসে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়াল একটা কালো গাড়ি। দুজন লোক নেমে এসে পিস্তল দেখিয়ে টমাসকে নামাল অ্যামবুলেন্স থেকে। প্রথমেই পিটিয়ে বেহুঁশ করল তাকে। আর কিছু বলতে পারে না সে। অ্যামবুলেন্সটার কোন খোঁজ নেই। মনে হয় ডাকাতেরা নিয়ে গেছে।'

'ডকের কি খবর?'

'পাওয়া যায়নি। মনে হয় তাকেও কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'আমারও তাই ধারণা। ওকে কিডন্যাপ করার জন্যেই জোর করে থামানো হয়েছে অ্যামবুলেন্স।'

'কিন্তু আমরা এখনও শিওর না। তদন্ত চালাচ্ছি। দেখা যাক, কি হয়।'

লাইন কেটে দিলেন ইন্সপেক্টর।

কি হয়েছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

ইন্সপেক্টর যা যা বলেছেন, জানাল কিশোর।

গম্ভীর হয়ে গেল টিভির পেশাদার অভিনেতারা। যে রকম মনে হচ্ছে, এক এক করে সবাইকেই বোধহয় কিডন্যাপ করা হবে। ভাবছে, এরপর কার পালা?

কথাটা জিজ্ঞেসই করে ফেলল মলি।

চট করে তার দিকে একবার তাকিয়ে আরেক দিকে চোখ সরিয়ে নিল কিশোর। মনে করার চেষ্টা করছে, পাথরটা পড়ার সময় সে কোথায় ছিল? সে-ই ঠেলে ফেলেনি তো?

কথা রাখল টমাস। পরদিন সকালেই স্টুডিওতে ফিরে এল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ চেহারা রক্তশূন্য। চোখের কোণে কালি। উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। তবে শারীরিক ক্ষতি খুব একটা হয়নি। সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শুটিং চালিয়ে যাবে। ডক নেই। অন্য কাউকে দিয়ে সে জায়গাটা পুরণ করে নেবে।

'এমন ঘটনা ঘটবে কল্পনাই করিনি,' বলল সে। 'রাস্তার মাঝখানে এসে অ্যামবুলেন্সের ওপর হামলা চালায়, ভাবতে পারো? এক্কেবারে যেন ফিল্মের অবস্থা। আমাকে পিটিয়ে বেহুঁশ করে রেখে একজন আহত লোককে নিয়ে চলে গেল। ডক বেচারার জন্যে খুব খারাপ লাগছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে কষ্টটা যা পাবে না! কিন্তু কারা এমন করছে? রোজারকে নিল, জুনকে নিল, এখন ডককেও!'

'তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে একমত হলেন,' কিশোর বলল। 'তিনটে

ঘটনারই একটার সঙ্গে আরেকটার যোগাযোগ আছে।'

'তা তো আছেই। এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমার তো কোন শত্রু নেই। অথচ ক্ষতিটা করছে আমারই। ছবিটাকে স্যাবটাজ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।' চোখে উৎকণ্ঠা নিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল। 'এখন তো ভয়ই লাগছে তোমাদের না কিছু করে বসে।'

তবে তেমন ভয়ের কিছু দেখল না কিশোর। আগের দিন এটা নিয়ে আলোচনা করেছে সহকারীদের সঙ্গে। ওদের জন্যে এখনও বিপজ্জনক হয়ে ওঠেনি পরিস্থিতি। হওয়ার কোন কারণ নেই। তার ধারণা, টমাস কিংবা তার ছবির সঙ্গে এই নিখোঁজ রহস্যের সম্পর্ক নেই।

কিন্তু সে কথা এখন টমাসকে বলল না। বললে বিশ্বাস করতেও পারে, না-ও পারে। অহেতুক কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। তার চেয়ে কেসটার সমাধানের দিকেই বেশি নজর দেয়া উচিত। সমাধান হলে সবাই জানতে পারবে আসল ব্যাপারটা কি।

আট

অপেক্ষা করাই সার হলো গোয়েন্দাদের, তদন্ত করার মত কোন সূত্র আর মিলল না।

দুপুরবেলা দুজন পুলিশ এল টমাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে। তেমন কিছু বলার নেই তার। যা বলার আগেই বলেছে ইন্সপেক্টরকে। নতুন আর কিছুই বলার নেই।

তবে পুলিশের কাছে একটা খবর আছে। পাওয়া গেছে অ্যামবুলেন্সটা।

'সাগরের ধারে একটা রাস্তার পাশে পড়ে ছিল,' বলল একজন পুলিশম্যান। 'সৈকত থেকে খেলতে খেলতে ঝোপে ঢুকে পড়ে একটা ছেলে। সেখানেই লুকানো ছিল গাড়িটা। ওর বাবা পুলিশকে খবর দেয়।'

'ডকের খবর কি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'গাড়িতে কেউই ছিল না।'

পুলিশ চলে গেলে খাবারের প্যাকেট খুলে লাঞ্চ করতে বসল অভিনেতা আর কর্মীরা। টমাস বলল তার খিদে নেই।

'সামান্য কিছু খান,' জিনা সাধল তাকে। সঙ্গে করে অনেক খাবার নিয়ে এসেছে ওরা। পনির, ডিম ও টমেটো দিয়ে তৈরি স্যাণ্ডউইচ, বিশাল এক ফ্রুট কেকের অর্ধেকটা, আর কোকাকোলা। 'দুশ্চিন্তা তো হবেই। কিন্তু না খেলে শরীর টিকবে কি করে।'

রাফিও জুলজুল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যেন জিনার মতই অনুরোধ করছে, 'খান না, খান, একটু খান।'

হাসল টমাস। এই অনুরোধ এড়াতে পারল না। তাকে খুশি করার জন্যেই যেন হাত বাড়িয়ে ঝুড়ি থেকে একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে নিল।

সবাই কথা বলছে খেতে খেতে। কেবল কিশোর চুপ। খাবার চিবুচ্ছে আর ভাবছে। তিন তিনটে কিডন্যাপিং হয়ে গেল, অথচ কিছুই করতে পারছে না ওরা।

'তিনজনেরই একটা ব্যাপার কমন,' যেন নিজেকেই বোঝাল সে, 'তিনজনেই অভিনেতা। এছাড়া আর কোন যোগসূত্র আছে কি?'

'না নেই,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল টমাস।

'আছে,' রবিন মনে করিয়ে দিল। 'রোজার আর ডক কাজিন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম,' কিশোর বলল।

'নামের তো কোন মিল নেই,' জিনা বলল। 'আসল নামটা দুই জনের দুই রকম।'

'তাতে কি কাজিন হতে পারে না? চাচাত ভাই হলে মিল থাকত। হয়তো খালাত ভাই।'

মাথা ঝাঁকাল টমাস।

গোটা ছয়েক স্যাণ্ডউইচ খেয়ে আরেকটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। তার বদলে কেকের বড় একটা টুকরো তুলে নিল, সেই সঙ্গে কোকাকোলার ক্যান। কামড় বসানোর আগে কিশোরের দিকে তাকাল। 'মনে হচ্ছে কাজিনের মধ্যে কিছু একটা সূত্র পেয়ে গেছ তুমি?'

'অ্যাঁ!...এতক্ষণ পাইনি। তুমি বলাতে পেলাম।' উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। 'তিনজনের মধ্যেই যোগাযোগ পেয়ে গেছি। ভাবতে হবে এটা নিয়ে।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'আহা, এমন ভঙ্গিতে বলছ যেন এইমাত্র ভাবনা শুরু হলো, এতদিন কিছুই ভাবা হয়নি। থাকো তোমার ভাবনা নিয়ে। আমি খাই।' বলেই হাতের কেকের টুকরোটার অর্ধেকটা কামড়ে কেটে নিয়ে চিবাতে শুরু করল। তারপর ঠোঁটে ক্যান লাগিয়ে এক চুমকেই সাবাড় করে দিল অর্ধেকের বেশি।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'গোয়েন্দাগিরির কাজটাই হলো ভাবার কাজ। ভাবতে হবে, প্রচুর ভাবতে হবে। কোন সূত্রকেই ফেলনা মনে করে অবহেলা করা চলবে না। এক এক করে ভেবে বের করতে হবে কোনটা প্রয়োজনীয়। সেগুলো রেখে বাকিগুলো বাদ। তারপর সেগুলো নিয়ে আবার ভাবনা...'

'দোহাই তোমার, রক্ষা করো,' হাত তুলল মুসা। 'তোমার যত ইচ্ছে ভাব। কেবল দয়া করে লেকচারটা থামাও,' বলেই আবার ক্যান লাগাল ঠোঁটে। এইবার শেষ না করে আর ছাড়বে না।

'কিন্তু প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো বের করা সহজ কাজ নয়,' মুসার কথায় কান দিল না রবিন।

'হউ,' করে যেন রবিনের সঙ্গে একমত হলো রাফি। আসলে অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কেউ কথা বলেনি তো, তাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল জিনা।

কিশোর বলল, 'সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে আরেকবার আলোচনা করা যাক।

যে তিনজনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে তাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোন না কোনভাবে সম্পর্ক আছেই। রোজার আর ডক ভাই ভাই। রোজারের সঙ্গে জুনের বিয়ে হতে যাচ্ছে। এগুলো জরুরি সূত্র। ভুললে চলবে না।'

সেদিন খুব খেটেপিটে কাজ করল সবাই। কিন্তু কারও মনেই শান্তি নেই, ফলে উৎসাহও নেই। ডকের নিখোঁজ হওয়াটা ভারি হয়ে চেপে আছে সবার মনে। সন্ধ্যার আগে লণ্ডন থেকে একটা ফোন এল টমাসের কাছে। করেছে ডকের স্ত্রী রিচা। স্বামীর কিডন্যাপের খবর শুনে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বলল, আগামী দিনই সাউথবুর্নে আসছে। তার স্বামীকে উদ্ধারের ব্যাপারে কি করছে পুলিশ, সামনে থেকে দেখতে চায়। তার ধারণা, সে থাকলে অনেক সুবিধে হবে।

কিন্তু কিশোরের সে রকম মনে হলো না। তার ধারণা, এসে আরও ঝামেলা বাড়াবে।

আগামী দিন স্টেশনে যাবে টমাস, রিচাকে এগিয়ে আনার জন্যে। গোয়েন্দারাও তার সঙ্গে যেতে চাইল।

অমত করল না টমাস। ওদেরকেও নিয়ে গেল।

প্রথম দেখায়ই রিচাকে ভাল লেগে গেল ওদের। হালকা-পাতলা শরীর, কালো চুল। বেশ সুন্দরী। ঠোঁটের কোণে মন খারাপ করে দেয়া বিষণ্ন হাসি।

গোয়েন্দাদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল টমাস।

'আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ তোমরা, খুব খুশি হলাম,' রিচা বলল। 'তোমাদের চেহারাই বলছে, ভাল খবর নেই। তার কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি এখনও, না? পুলিশ কি করছে?' চোখের পানি রাখতে পারল না আর সে।

তার মন ভাল করার জন্যে কথা দিল গোয়েন্দারা, যে ভাবেই হোক তার স্বামীকে খুঁজে বের করবেই। রাফি তার হাত চেটে দিল। লেজ নাড়তে লাগল।

পুলিশের সঙ্গে কথা বলেই সারাটা সকাল কেটে গেল তার। তারপর স্টুডিওতে এসে স্টুডিওর ছোট কাফেটাতে লাঞ্চ খেতে বসল। টমাসের ছবিতে যে সব লোক কাজ করছে সবাই বসেছে সেখানে।

যে যেভাবে পারল রিচাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল। এমন ভাবে কথা বলতে লাগল গোয়েন্দারা, যেন মহিলা তাদের অনেক দিনের পরিচিত।

সূত্রের আশায় একের পর এক প্রশ্ন করে চলল তাকে কিশোর। কিন্তু তেমন কিছুই জানাতে পারল না রিচা, যাতে তদন্তের সুবিধে হয়।

কোন শত্রু আছে কিনা জিজ্ঞেস করল।

'না না, শত্রু আসবে কোত্থেকে? আমার স্বামীর একজন শত্রুও নেই কোথাও। রোজারেরও একই ব্যাপার। খুব ভাল মানুষ দুজনেই। সবাই ওদেরকে পছন্দ করে।'

দেখতে দেখতে রিচারও বন্ধু হয়ে গেল সবাই।

ডককে না পাওয়া পর্যন্ত সাউথবুর্নে থাকার সিদ্ধান্ত নিল সে। পুলিশ সাধ্যমত চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারছে না। কোন হদিসই নেই তিনজন

নিখোঁজ মানুষের।

তিন গোয়েন্দাও কিছুই করতে পারেনি এখনও। একটুও এগোতে পারেনি।

রিচার বিষণ্ণতা কাটানোর জন্যে এক বুদ্ধি করল টমাস। ছবিতে তাকে ছোট একটা রোল দেয়ার প্রস্তাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিল রিচা। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে দুশ্চিন্তা কমে না, বাড়ে। কাজটা করলে ডকের কথাও মোটামুটি ভুলে থাকা যাবে, কিছু টাকাও উপার্জন হবে।

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে রিচা বলল, 'আমাকে খুশি করার জন্যে সবাই অস্থির। খুব ভাল লাগছে আমার। বল পাচ্ছি এখন।'

'আশাও ছাড়বেন না,' মুসা বলল। 'আমরা তো আছি। ডক আমাদেরও বন্ধু। তাকে উদ্ধার না করে ক্ষান্ত হচ্ছি না আমরা।'

ভারি কোন আলোচনা চলছে কি করে যেন বুঝে ফেলল রাফি। উঠে গিয়ে রিচার দিকে একটা পা বাড়িয়ে দিল লেগশেকের ভঙ্গিতে। যেন নীরবে সে-ও ভরসা দিতে চাইছে মহিলাকে।

অবাক হলো মহিলা। তারপর হাসল। রাফির পা-টা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল।

খুশি হয়ে ফিরে এসে আগের জায়গায় বসল রাফি।

হেসে বলল জিনা, 'দেখলেন তো, রাফিও আপনাকে সাহায্য করতে চায়।'

রবিন বলল, 'আপনার স্বামীর বিপদটা বোধহয় তেমন সিরিয়াস নয়। আমি বলতে চাইছি, প্রাণের ওপর ঝুঁকি আসবে না। আজ হোক কাল হোক, ফিরে আসবেই ওরা।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রিচা। মলিন হেসে বলল, 'সেই *কালটা* যে কবে হবে তাই বুঝতে পারছি না। বেশি দেরি না হলেই বাঁচি!'

রিচাকে খুশি করার জন্যে যা যা সম্ভব সবই করা হচ্ছে। গোয়েন্দারা তো ছায়ার মত লেগে রয়েছে তার সঙ্গে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই তাকে নিয়ে সৈকতে সাঁতার কাটতে যাচ্ছে। কখনও দাঁড়টানা নৌকা ভাড়া করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে সাগরে। এমন ভাবে লেগে থাকে ছেলেমেয়েগুলো, হারানো স্বামীর কথা ভাবারই অবকাশ পায় না সে।

এক বিকেলে আউটডোর শুটিঙের জন্যে করমোরেন্ট কেপ নামে একটা জায়গায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল টমাস। প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর ওখানকার। প্রচুর পাথর আছে। গোয়েন্দারা বলল, অন্যদের মত বাই রোডে যাবে না ওরা। নৌকা নিয়ে রিচাকে সঙ্গে করে জলপথে যাবে।

টমাসের কোন আপত্তি নেই। নির্দিষ্ট সময়ে অভিনেতারা জায়গামত হাজির থাকলেই হলো।

রিচাও খুশি হলো। জলপথে করমোরেন্ট কেপ-এ যাওয়ার মজাই আলাদা। কাজও হবে, ভাল একটা আউটিংও হবে।

সাউথবুর্ন বন্দর থেকে একটা নৌকা ভাড়া নেয়া হলো। মাল্লা নেয়ার দরকার নেই। মুসা আর জিনা দুজনেই খুব ভাল মাল্লা। প্রয়োজনে কিশোর আর রবিনও দাঁড় বাইতে পারবে।

রওনা হয়ে গেল দলটা। নিরাপদেই পৌঁছল করমোরেন্ট কেপ-এ, যেখানে ওদেরকে দেখা করতে বলেছে টমাস।

'গুড,' খুশি হয়ে বলল পরিচালক, 'ঠিক সময়েই হাজির হয়ে গেছ। এসো, ক্যামেরার সামনে দাঁড়াও। সব রেডি।' নিচু গলায় বলল, 'তবে পুরোপুরি ঝামেলা এড়াতে পারলাম না।' বুড়ো আঙুল দিয়ে কয়েকজন মানুষকে দেখাল। ছুটি কাটাতে এসেছে এখানে। শুটিং হচ্ছে দেখে কাছে এসে জটলা করছে দেখার জন্যে। 'হ্যাঁ, শুরু করা যাক।'

কড়া রোদের জন্যে এখানে কাজ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ল। ঘেমে সারা হচ্ছে সবাই। রেহাই দিল না টমাস। খাটিয়ে মারল কর্মীদের। একটানা চলল কাজ। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, খাওয়ার সময়ও দেবে না।

কিন্তু দিল অবশেষে। বলল, 'পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় দিলাম। তারপর আবার শুরু হবে। এখানকার কাজ আজকের মধ্যেই শেষ করব।'

হাঁপ ছাড়ল সবাই। দম ফেলার ফুরসত পেল।

মুসা বলল, 'জানে বাঁচলাম। উফ, বাবারে, কি সাংঘাতিক খাটনি! অভিনয়ও যে এত কঠিন জানতাম না। চলো, পানিতে নামি। না হলে শরীর ঠাণ্ডা হবে না।'

তার প্রস্তাবে কেউই অমত করল না। এরকম সুযোগ পাওয়া যেতে পারে ভেবে বাদিং স্যুট নিয়েই আসা হয়েছে। জিনা তো লাফিয়ে উঠল, 'এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বললে। চলো, নৌকা নিয়ে সরে যাই। একজন বলল, ওদিকটায় একটা জায়গা আছে, তিন দিকেই পানি। দ্বীপই বলা চলে। ওখানে গিয়ে সাঁতরাব। এখানে ভিড় বেশি।'

নৌকা নিয়ে চলে এল ওরা। জায়গাটা নির্জন। একজন মানুষও চোখে পড়ল না। কোনমতে নৌকার নোঙরটা কেবল ফেলল মুসা, তারপরই ঝপাস। জিনা আগেই নেমে পড়েছে। রবিন নামল। কিশোর নামল। রাফি তো নামলই। সে-ও ভাল সাঁতারু। জিনার সঙ্গে থেকে থেকে সাঁতার কাটতে, বিশেষ করে দাপাদাপি করতে তারও খারাপ লাগে না। তবে সব সময় নয়।

রিচাও নেমে পড়ল। দেখা গেল, ভাল সাঁতার জানে সে-ও। পাল্লা দিয়ে সাঁতরাতে লাগল মুসা আর জিনার সঙ্গে। হাসছে জোরে জোরে। মনের ভার অনেকটাই হালকা হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে সময়টা যেন উড়ে চলে গেল। ফেরার সময় হলো।

'আসছি। এক মিনিট।' কাপড় বদলানোর জন্যে বড় একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল রিচা।

জিনা চলে গেল আরেকটা পাথরের আড়ালে। বালিতেই হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ছেলেরা। ওরা স্যুট পরেনি। খালি গায়েই নেমেছিল। কাপড় বদলানোর ঝামেলা নেই। পানি যা লেগেছে গায়ে, রোদে শুকিয়ে নেবে। ঝকঝকে উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকানো যায় না। চোখ বুজে ফেলল ওরা।

'এই, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?' জিনার ডাকে চোখ মেলল সবাই।

কিন্তু উঠল না কেউ। শুয়েই রইল।

রাফিকে পাশে বসিয়ে আদর করতে লাগল জিনা। সী-গালের মাছ ধরা দেখতে লাগল।

একসময় উঠে বসল মুসা। মুচকি হাসল। 'সব মেয়েমানুষেরই এক অবস্থা। কাপড় পরতে গেলে আর হুঁশ থাকে না। বলে গেল এক মিনিট। আমার তো মনে হচ্ছে দশ মিনিট হয়ে গেছে।'

'দেখো,' রেগে উঠল জিনা, 'সব মেয়েমানুষকে এক করবে না। আমার কতক্ষণ লেগেছে?'

'তুমি কি আর মেয়ে নাকি?' রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠল মুসার সাদা দাঁত। 'নিজেকে তো ছেলেই ভাব। তোমার কথা বাদ...'

কিশোরও উঠে বসেছে। 'আসলেই দেরি হয়ে যাচ্ছে। বকা খেতে হবে আজকে।'

'এই, রিচারও কিছু হয়ে গেল না তো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল রবিন। 'এতটা দেরি তো করার কথা নয়।'

'আরে দূর। এখানে কি হবে? দাঁড়াও, ডাকি,' মুখের কাছে হাত জড়ো করে চিৎকার করে রিচার নাম ধরে ডাকল মুসা।

জবাব নেই।

আরও জোরে ডাকল সে।

এবারও সাড়া মিলল না। কি করছে এতক্ষণ?

চিৎকার করে কিশোর বলল, 'রিচা, তাড়াতাড়ি করুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না পাথরের ওপাশ থেকে। বিশাল পাথরে বাড়ি খেয়ে শুধু প্রতিধ্বনি তুলল তার কণ্ঠস্বর।

মুসা ডাকল আরও একবার।

'দেখো,' রবিন বলল, 'সত্যিই কিছু হয়েছে। আমার ভাল্লাগছে না ব্যাপারটা।'

'শরীর খারাপ হয়ে গেল না তো?' জিনা বলল, 'যা রোদের রোদ। এত দাপাদাপি সহ্য করতে পারেনি হয়তো। বেহুঁশ-টেহুঁশ হয়ে গেছে...'

উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'চলো তো দেখি?'

বিরাট পাথরটার দিকে পা বাড়াল সে। অন্যেরা পিছু নিল তার।

পাথরটা ঘুরে অন্য পাশে এসে থমকে দাঁড়াল গোয়েন্দাপ্রধান। চোখ মাটির দিকে। দলা পাকিয়ে পড়ে আছে জিনিসটা।

রিচার বাদিং স্যুট। কিন্তু রিচা নেই। কোথাও দেখা গেল না তাকে। রোজার, জুন আর ডকের মতই গায়েব।

নয়

'অসম্ভব! এ হতে পারে না!' তোতলাতে শুরু করল কিশোর। 'কয়েক মিনিট আগেও ছিল এখানে। ধরতে গেলে আমাদের চোখের সামনে থেকেই উধাও হয়ে গেল।'

নিজেকেই দোষী ভাবতে আরম্ভ করল সে। কারণ দলটার দলপতি সে। অবচেতন ভাবেই রিচার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিল নিজের কাঁধে। মনে হতে লাগল দায়িত্বটা ঠিকমত পালন করতে পারেনি সে।

'প্রথমে গেল রোজার, তারপর জুন, তারপর ডক, এখন গেল রিচা,' বিড়বিড় করল রবিন। 'হচ্ছেটা কি বলো তো?'

'কিন্তু এরকম একটা জায়গা থেকে যায় কি করে?' অন্য তিনজনের মতই মুসাও হতবাক হয়ে গেছে।

কিন্তু চুপ করে বসে রইল না ওরা। খুঁজতে শুরু করল। ছোট্ট সৈকত আর ওখানকার সমস্ত পাথরের আড়াল, গলিঘুপচি কিছুই বাদ দিল না। রাফিকে দিয়ে গন্ধ শুঁকিয়ে শুঁকিয়েও খোঁজাল। কিন্তু কোন চিহ্নই পেল না রিচার। বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন।

এই খবর শুনে প্রায় অসুস্থই হয়ে পড়ল টমাস। স্তব্ধ হয়ে গেল রলি বিংহ্যাম।

কিন্তু তাদেরকে স্তব্ধ হয়ে থাকার সুযোগ বেশিক্ষণ দিল না কিশোর। টমাসকে অনুরোধ করল তাড়াতাড়ি ইন্সপেক্টর স্মিথকে ফোন করার জন্যে।

খবর পেয়ে বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না ইন্সপেক্টর। ছুটতে ছুটতে এলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন সেই জায়গাটায়, যেখান থেকে নিখোঁজ হয়েছে রিচা। গত কয়দিনে চার চারজন লোক নিখোঁজ হয়েছে তাঁর এলাকা থেকে, অথচ তিনি কিছুই করতে পারছেন না, ব্যাপারটা পীড়া দিতে লাগল তাঁকে। মনে হতে লাগল, সব তাঁর অক্ষমতা। তাঁর নাকের ডগা থেকে তাঁকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লোকগুলোকে তুলে নিয়ে গেল কিডন্যাপাররা, কিছু করতে পারলেন না তিনি, ভেবে নিজের ওপরই রাগ হতে লাগল।

একই ভাবে কিশোরেরও রাগ হচ্ছে নিজের ওপর।

সঙ্গে করে আরও লোক নিয়ে এসেছেন ইন্সপেক্টর। সামান্যতম সূত্রের খোঁজে ছোট্ট সৈকতটা চষে ফেলতে শুরু করল ওরা। এই সুযোগে ছেলেমেয়েদের মুখে পুরো ঘটনাটা আরেকবার শুনতে বসলেন তিনি।

'কি আর বলব!' কিশোর বলল, 'ভাবতেই পারিনি এমন কিছু ঘটে যাবে। সাঁতার কেটে উঠে রিচা ওই পাথরটার আড়ালে চলে গেল কাপড় বদলাতে। জিনা গেল ওদিকটায়। আমি, মুসা আর রবিন শুয়ে পড়লাম। অনেক পরিশ্রম করেছিলাম তো, মনে হয় তন্দ্রাই এসে গিয়েছিল। নইলে জানলাম না কেন কিছু? কি করে উধাও হলো আন্দাজই করতে পারছি না।'

আন্দাজ কেউই করতে পারল না। পুলিশেরাও খুঁজে খুঁজে হয়রান। কিছু বের করতে পারল না।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'ব্যাটারা জানল কি করে এই সময় এই নির্জন সৈকতে সাঁতার কাটতে আসবে তোমরা?'

কেউ জবাব দিতে পারল না।

সেদিন বিকেলে হোটেলের ঘরে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চালাল ওরা। বেলকনির দিকের দরজাটা খোলা। সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। আবহাওয়া গরম।

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জিনা, 'কিছু একটা করা উচিত আমাদের। আর সহ্য হচ্ছে না।'

'কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলব,' মুসাও রেগে গেল। 'ওরা কিডন্যাপ করছে, আমরাও করব। ধরে নিয়ে আসব মলিকে। আটকে রেখে কথা বলতে বাধ্য করব।'

'গাধার মত কথা বোলো না,' কিশোর বলল। 'কোথায় আটকে রাখবে? কথাই বা বলাবে কি করে? টর্চার করতে পারবে? বেরিয়ে গিয়ে পুলিশকে বলে দিলে আমাদেরকেই ধরে নিয়ে গিয়ে তখন গারদে ভরবে পুলিশ, কিডন্যাপিঙের দায়ে। ওভাবে হবে না। সূত্র দরকার আমাদের। এমন কিছু, যা দিয়ে কিডন্যাপারদের পিছু নিতে পারি।'

'কিন্তু সূত্র পাব কোথায়?' হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন। 'খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে গেলাম। পুলিশও কি কম চেষ্টা করছে? কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কিছু দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস যে করব, তারও উপায় নেই। কেউ ছিল না সৈকতে।'

'কি করে জানছ? কেউ না এলে রিচাকে নিল কিভাবে? নিশ্চয় এসে ঘাপটি মেরে বসে ছিল পাথরের আড়ালে। সুযোগ পাওয়া মাত্র ধরে নিয়ে গেছে।'

'রিচা চিৎকার করল না কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'চিৎকার করার উপায় রাখেনি, তাই। পেছন থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েই মুখ চেপে ধরেছে। তারপর মুখে রুমাল-টুমাল কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে। সিনেমায় দেখোনি কিভাবে কিডন্যাপ করে?'

কি যেন ভাবছে জিনা। মুখ তুলে বলল, 'শোনো, একটা কথা তোমাদের আগেই বলা উচিত ছিল। হট্টগোলে তখন ভুলে গিয়েছিলাম। একটা সূত্র আমি দিতে পারি। ভুল দেখেছি বলে আবার হেসে উড়িয়ে দিয়ো না…'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল কিশোর। 'আহা, অত ভণিতা না করে বলই না কি পেয়েছ? হাসব কেন?'

কি সূত্র পেয়েছে শোনার জন্যে আগ্রহে সামনে গলা বাড়িয়ে দিল রবিন আর মুসা।

'রিচার কিডন্যাপিঙের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না,' জিনা বলল। 'সাঁতরাতে সাঁতরাতে একটা বড় পাথরের ওপাশে চলে গিয়েছিলাম, মনে আছে?'

'আছে। অত সাক্ষি-প্রমাণ লাগবে না। কি দেখেছ বলে ফেলো।'

'জনি বিয়াণ্ডার ইয়ট ফ্লাইং অ্যাঞ্জেল। খুব আস্তে আস্তে চলছিল জাহাজটা।'

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা।

পিঠ সোজা হয়ে গেছে কিশোরের। চোখ চকচক করছে। 'সত্যি বলছ? আমি তো কিচ্ছু দেখিনি! অবশ্য যাইওনি ওদিকটায়…'

'তুমি তো তীর থেকেই সরোনি,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'পাথরের অন্যপাশ দিয়ে জাহাজটা গেলে তোমার দেখার কথাও নয়। আমিও ছিলাম তোমার সঙ্গে তুমি দেখলে আমিও দেখতাম।'

তুড়ি বাজাল মুসা। 'মনে হয় আমিও দেখেছি! ভাল করে খেয়াল করিনি, নইলে

চিনতে পারতাম। তবে একটা জাহাজের পেছনটা দেখেছি, মনে পড়ছে এখন।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। ভাবছে। তাহলে এই ব্যাপার। ওরা যখন পানিতে দাপাদাপি করছে ওই সময় আমেরিকান জাহাজটা চলছিল উপকূল ধরে। বিয়াগুা নিজে অথবা তার কোন লোক চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছিল ওদেরকে। তারপর এসে···

জনি বিয়াগুার ওপর কিশোরের সন্দেহ জোরাল হলো আরও। ইন্সপেক্টরকে কথাটা জানানো উচিত, কিন্তু জানাতে ইচ্ছে করল না। আবারও মুখের ওপর হাসবেন তিনি। হেসে উড়িয়ে দেবেন। নাহ্, আর তাঁকে বলতে যাবে না। যা করার নিজেরাই করবে।

'শোনো,' বলল সে, 'রিচা নিখোঁজ হওয়ার একটু আগে ইয়ট দেখা যাওয়াটা একটা সাংঘাতিক সূত্র। আরও জোর দিয়ে বলতে পারছি এখন, কিডন্যাপিংগুলোর পেছনে বিয়াগুার হাত আছে।'

'কিন্তু কেন করেছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'সেটা জানলে তো রহস্যটা আর রহস্য থাকত না। তবে অন্ধকারে আলোর সূক্ষ্ম একটা রেখা চোখে পড়ছে আবছাভাবে।'

'কিন্তু মুক্তিপণের টাকা চেয়ে একটা মেসেজও তো এল না এখনও,' রবিন বলল।

'আসেনি, তার কারণ বিয়াগুার টাকার দরকার নেই। অন্য কোন কারণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কি কারণ, সেটাই এখন আমাদের জানা দরকার।'

'কি ভাবে?'

'আমি বলি,' হাত তুলল জিনা। 'আজ রাতে আবার যাব তার জাহাজে।'

'গেলেই উঠতে দিল আরকি, হাঁহ্,' মুসা মাথা ঝাঁকাল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে।

'বলেকয়ে উঠতে গেলে কি আর উঠতে দেবে। চুরি করে উঠব। কিডন্যাপিঙে বিয়াগুার হাত যদি থাকেই হয়তো লোকগুলোকে নিয়ে গিয়ে তার জাহাজেই আটকে রেখেছে। আমি বলি কি, রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি গিয়ে জাহাজে উঠে পড়ব। জাহাজটা দূরে না থেকে ঘাটে নোঙর করা থাকলে সাঁতরে গিয়ে উঠতেও কোন অসুবিধে নেই। তারপর পুরো জাহাজে তল্লাশি চালিয়ে দেখে আসব হারানো মানুষগুলো আছে কিনা। একজনও যদি থেকে থাকে, তাহলেই হয়ে গেল। গিয়ে বলব ইন্সপেক্টরকে।'

'পাগল আরকি। খুঁজে দেখবে। যেন জাহাজে লোক নেই। এমনিতেই অত বড় জাহাজে লোকের ছড়াছড়ি থাকে। আর বিয়াগুা যদি অপরাধী হয়ে থাকে তাহলে তো কথাই নেই। কড়া পাহারার ব্যবস্থা করবে।'

চুপ হয়ে গেল জিনা। রেগে গেল মুসার ওপর। ভাবল, কাজটা আমি করেই ছাড়ব। ভাল গোয়েন্দা বলে খুব অহঙ্কার তোমাদের। বেশ, আমিও কি করতে পারি দেখিয়ে দেব। মনে মনেই রাখল ইচ্ছেটা, প্রকাশ করল না।

কিশোর বলল, 'জাহাজটায় উঠে খুঁজতে পারলে খুবই ভাল হত। কিন্তু ওভাবে চুরি করে উঠতে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। ভাবতে হবে। আর কোন উপায় বের

করতে পারি ভাল। না পারলে চুরি করেই উঠতে হবে। তবে আজকে না। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দেখি, ইতিমধ্যে মুক্তিপণের খবর আসে কিনা।'

কিন্তু আগামী দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয় জিনা। মুসা তাকে রাগিয়ে না দিলে হয়তো কিশোরের কথা শুনত। এখন ঠিক করেছে, শুনবে না। রাতের অপেক্ষায় রইল।

অযাচিত ভাবেই একটা সুবিধে পেয়ে গেল সে। হঠাৎ করে সেদিনই সন্ধ্যায় তার আব্বা-আম্মা লণ্ডনে চলে গেলেন। ওখানে আরেকটা বিশেষ সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছে। কয়েক দিন থাকবেন তাঁরা। ছেলেমেয়েদেরকে সাউথবুর্নেই রেখে গেলেন। ফলে আর কোন ভয়ই রইল না জিনার। বাধা দেয়ার কেউ নেই। রাতবিরেতে কোথায় গেল না গেল তার জন্যেও কৈফিয়ত দিতে হবে না।

রাত হলো। সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে। কাজেই বেশিক্ষণ জেগে রইল না গোয়েন্দারা, কেবল জিনা ছাড়া। তিন গোয়েন্দা ঘুমিয়ে পড়ার পরেও আরও আধঘন্টা নিজের ঘরে অন্ধকারে শুয়ে রইল সে। তারপর উঠল। রাফিকে নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে। মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে চলল. বিয়াণ্ডার জাহাজটা যেন ঘাটেই বাঁধা থাকে।

প্রথমবার যেখানে ছিল তার চেয়ে খানিক দূরে নোঙর করা আছে জাহাজটা। কাছাকাছি আর কোন জাহাজ বা বোট নেই। ভালই হলো, ভাবল সে। সাঁতরে যাওয়ার সময় কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় কম।

জেটির কাছ থেকে খানিকটা দূরে চলে এল জিনা। পানিকে তার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। এখান থেকে সাঁতরে চলে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই না। চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে লাগছে ইয়টটার আবছা অবয়ব। পার্টির সময় যেমন আলোয় আলোয় ঝলমল করছিল তেমন নয়। অন্ধকার করে রাখা হয়েছে। এটাও ভাল হয়েছে তার জন্যে। আলো থাকলে নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকত।

বাদিং স্যুট পরেই এসেছে সে। তার ওপর চাপিয়েছে টি-শার্ট আর প্যান্ট। অন্ধকার মত একটা জায়গায় এসে শার্ট-প্যান্ট খুলে রাখল। রাফিকে সেগুলো পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে, তার না ফেরা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকতে বলে এগোল পানির দিকে। নিঃশব্দে নেমে পড়ল কালো পানিতে।

দশ

সাগর শান্ত। ঢেউ নেই। সাঁতরে জাহাজের কাছে পৌঁছতে অসুবিধে হলো না জিনার। তবে কঠিন কাজটা হবে ওপরে ওঠা। কি করে উঠবে? আগেই ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু ভাবেনি যখন কি আর করা। অন্য কোন ভাবে চেষ্টা করে দেখতে হবে। অনেক সময় রেলিং থেকে দড়ি ঝুলে থাকে। ওরকম কিছু একটা পেয়ে গেলে বেয়ে উঠতে অসুবিধে হবে না।

দড়ির আশায় নিঃশব্দে জাহাজ ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল সে। দড়ি পেল না, তবে পেছন দিকে নিচু হয়ে থাকা খোলের এক জায়গায় খাঁজ দেখতে পেল, যেখান

দিয়ে ওঠা সম্ভব হতে পারে।

কাজটা মোটেও সহজ নয়। অনেক কষ্টে হাত-পায়ের আঙুল বাধিয়ে বাধিয়ে ওপরে উঠতে পারল অবশেষে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। ওখানেই ডেকের ওপর বসে পড়ল জিরিয়ে নেয়ার জন্যে।

নিথর হয়ে বসে আছে সে। কান পেতে রেখেছে। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। জাহাজের সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। জিরানো হয়ে গেলে উঠে পড়ল সে। পা টিপে টিপে এগোল। নির্জন ডেক। একজন প্রহরীও চোখে পড়ল না। না না, আছে। ওই তো গলুইয়ের দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি।

আড়াল নেয়ার জন্যে এদিক ওদিক তাকাল জিনা। তেমন কোন জায়গা নেই। আর কোন উপায় না দেখে একটা মই বেয়ে নেমে এল নিচে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে চলল প্যাসেজ ধরে। প্রতিটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল ভেতরে কেউ জেগে আছে কিনা। ঠিক কি খুঁজতে এসেছে জানে না। তবে তার অনুভূতি বলছে, মূল্যবান কোন না কোন সূত্র পেয়ে যাবেই এখানে।

পার্টিতে যেদিন এসেছিল, সেদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছিল জাহাজটা। সেই অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগল এখন। কোথায় কি আছে না আছে না জানা থাকলে এভাবে শত্রু এলাকায় ঘোরার সাহস পেত না।

বিয়াগুার স্টাডির কাছে চলে এল। তার ধারণা এখানে কিছু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই তো? কান পাতল দরজার গায়ে। কোন শব্দ নেই। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে সামান্য ফাঁক করল পাল্লা। আবছা অন্ধকার ঘর। মৃদু একটা আলো জ্বলছে। একবার দ্বিধা করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঢুকতে না ঢুকতেই বাইরের প্যাসেজে কথা শোনা গেল। দুজন মানুষ আসছে এদিকেই।

হার্টবীট দ্রুত হয়ে গেল তার। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। লুকানোর জায়গা খুঁজছে। বড় একট সোফা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। অগত্যা ওটার পেছনেই গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

এগিয়ে আসছে কণ্ঠস্বর। কেবিনের দরজা খুলল। আবার বন্ধ হলো। দুই জোড়া পা চোখে পড়ল জিনার। একজোড়া পুরুষের, একজোড়া মহিলার। লোকটা বিয়াগুা। আর মহিলার কণ্ঠ মলির মত লাগল। আশ্চর্য! এত রাতে আমেরিকান কোটিপতির ইয়টে কি করছে সে? ভাগ্যটা ভালই মনে হচ্ছে জিনার। এতদিন পর মনে হয় রহস্যের জট খুলতে চলেছে নিতান্ত কাকতালীয়ভাবেই।

'গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।' দুটো গেলাসে তরল কিছু ঢালল বিয়াগুা। একটা গেলাস মলিকে দিয়ে বলল, 'নাও, আরাম করে বসো।' মলির পাশে নিজেও সোফায় বসে বলল, 'তারপর, আমার লেটেস্ট কাজের খবর শুনেছ তো?'

'শুনেছি। কিন্তু বেশি রিস্ক নিয়ে ফেলেছিলে। অল্পের জন্যে পার পেয়েছ।'

বিয়াগুাকে তুমি তুমি করে বলতে শুনে আরও অবাক হলো জিনা।

'তা ঠিকই বলেছ,' হাসল লোকটা। 'শুনলাম ডকের বৌ সাউথবুর্নে এসেছে। এক ফাঁকে গিয়ে লুকিয়ে দেখে তাকে চিনেও এলাম। কি করে তার কাছাকাছি

হওয়া যায় ভাবতে লাগলাম। সুযোগটা এসে গেল আপনাআপনি। সাগরের তীরে জাহাজ নিয়ে ঘুরছিলাম। দূরবীন দিয়ে দেখতে দেখতে চলেছি। হঠাৎ দেখি, পানিতে দাপাদাপি করছে ওই বিচ্ছু ছেলেমেয়েগুলো।'

প্রায় দম বন্ধ করে শুনছে জিনা। যাক, ভাগ্য এতদিনে প্রসন্ন হতে চলেছে। দুভাবে লাভবান হতে যাচ্ছে সে। এক, এই নিখোঁজ রহস্যের সমাধান। দুই, তিন গোয়েন্দার ওপর টেক্কা দেয়া। অবশ্যই যদি ধরা না পড়ে নিরাপদে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

বিয়াগুা বলছে, 'ওদের সঙ্গে ডকের বৌকেও দেখলাম। মনে হলো এইই সুযোগ। নৌকায় করে পিটারকে পাঠিয়ে দিলাম তীরে। কয়েকটা পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইল সে। সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। সুযোগ পেয়ে আর দেরি করল না। ছেলেমেয়েগুলোর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পাথরের আড়ালে কাপড় বদলাতে যেই গেল ডকের বৌ, পা টিপে টিপে পেছন থেকে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরল পিটার। সহজেই সারা হয়ে গেল কাজ। টুঁ শব্দ করতে পারল না বেটি। ওর মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে এসে নৌকায় তুলল পিটার।'

জিনা ভাবছে, কিশোরের সন্দেহই তাহলে ঠিক। ভদ্রলোকবেশী কোটিপতি বিয়াগুাই তাহলে এই কিডন্যাপিঙ রহস্যের হোতা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

'অল্পের জন্যে বেঁচেছ,' মলি বলল। 'এই রিস্ক নেয়া উচিত হয়নি। মেয়েটা চিৎকার করে উঠতে পারত। একা ওকে সামলাতে না-ও পারত পিটার। ছেলেমেয়েগুলোর কেউ চলে আসতে পারত। অনেক কিছুই ঘটতে পারত।'

'ঘটেনি যখন আর কি। তবে ঠিকই বলেছ, কাজটা করা উচিত হয়নি। রোজার আর জুনের ব্যাপারটা ছিল আলাদা। হেঁটে এসে ঢুকে পড়েছিল আমার গুহায়...'

'তাহলে এখন তো আর কোন বাধা নিশ্চয় নেই,' জুন বলল। 'সব কটাকেই আটকালে। পুরো সম্পত্তিই তোমার হয়ে যাচ্ছে।' একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল মলি। 'তো, আমাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে?'

হাসল বিয়াগুা। 'খুব শীঘ্রি। দলিল আমার নামে হয়ে গেলেই, ব্যস। আর কোন বাধা নেই।'

এই তাহলে ব্যাপার! মলির বস্ তাহলে এই বিয়াগুাই। তার নির্দেশেই সমস্ত কাজ করেছে মলি আর পিটার।

মদ খাওয়া শেষ হলো দুজনের। গেলাস দুটো নিয়ে গিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখল বিয়াগুা। আরও কয়েক মিনিট কথা বলল ওরা। তারপর উঠে বেরিয়ে গেল।

জিনা বুঝল, মদ খাওয়ার জন্যেই এখানে ঢুকেছিল দুজনে। ওরা বেরোনোর আগে নিজেদের আলোচনা থেকেই আরেকটা তথ্য জানিয়ে দিয়ে গেল, ডকের ওপর কাঠের পাথরটা ফেলেছিল মলি। সবার অলক্ষে সে-ই ঠেলে দিয়েছিল ওটা।

মলি আর বিয়াগুা বেরিয়ে যাওয়ার পর আরও মিনিট পাঁচেক একই ভাবে পড়ে রইল জিনা। তারপর বেরোল সোফার পেছন থেকে। ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর ধরে

এগোল পা টিপে টিপে। পথে কারও সামনে আর পড়তে হলো না। নিরাপদেই চলে এল জাহাজের পেছন দিকে, যেখান দিয়ে উঠেছিল। প্রায় নিঃশব্দে নেমে পড়ল পানিতে। উঠতে কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নামাটা সহজ।

ডেকে কেউ নেই। কারও চোখে পড়ারও সম্ভাবনা নেই। দ্রুত সাঁতরে চলল।

তার জন্যে উদগ্রীব হয়ে বসে আছে রাফি। সাড়া পেয়েই ছুটে এল। মাথা চাপড়ে তাকে আদর করল জিনা। ভেজা বাদিং স্যুটের ওপরই চাপাল শার্ট আর প্যান্ট।

হোটেলে ফিরে কাপড় বদলে নিল জিনা। তারপর এসে দাঁড়াল ছেলেদের ঘরের সামনে। দরজায় থাবা দিয়ে বলল, 'অ্যাই, জলদি ওঠো।'

'কি হলো, কি হলো,' বলে ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'জরুরী খবর আছে। জলদি দরজা খোলো।'

দরজা খুলে দিল মুসা। কিশোর আর রবিনও জেগে গেছে।

রাফিকে নিয়ে ঘরে ঢুকল জিনা। সব কথা খুলে বলল।

'কাজটা ঠিক করোনি, জিনা,' গম্ভীর হয়ে বলল রবিন। 'ধরা পড়লে কি হত ভেবেছ?'

মুসা বলল, 'আমাকে অন্তত নিয়ে যেতে পারতে।'

'তা পারতাম। তবে বিপদে তো আর পড়িনি। একটা কাজের কাজও করে এসেছি সেটাও নিশ্চয় স্বীকার করবে?'

'করেছ, তবে অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে,' কিশোর বলল। 'যাকগে, যা হবার হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন কিছু আর করতে যেও না।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'বিয়াগার ওপর আগেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। এখন শিওর হওয়া গেল। কিডন্যাপারকে তো চিনলাম, এখন জানতে হবে কেন একাজ করল সে।'

'সম্পত্তির কথা বলেছিল…'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কি সম্পত্তি, কার সম্পত্তি, এখন সেটাই জানতে হবে।'

'জানাটা কঠিন হবে না,' মুসা বলল। 'পুলিশে ধরে ভালমত চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়বে।'

'কিন্তু পুলিশকে আমরা বললে বিশ্বাস করবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'না করাটাই স্বাভাবিক,' কিশোর বলল। 'আবার করতেও পারে।'

'আমার মনে হয় বড় মানুষ কাউকে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'কাকে?' ভুরু নাচাল মুসা। 'আংকেলও তো নেই…'

'টমাসকে গিয়ে বলতে পারি আমরা। সে বিশ্বাস করলে ইন্সপেক্টরকে বিশ্বাস করাতে পারবে।'

'চলো তাহলে এক্ষুণি,' তর সইছে না আর মুসার।

'এতরাতে যাওয়ার দরকার নেই। কাল সকালে গেলেও চলবে।'

দশ

পরদিন সকাল সকালই স্টুডিওতে চলে এল গোয়েন্দারা। কিন্তু ভীষণ ব্যস্ত টমাস। লোকজনের সামনে তাকে কিছু বলা গেল না। সুযোগের অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল ওরা। সেটা লক্ষ করল পরিচালক। কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করল। তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল কিশোর।

সব শুনে তো টমাস থ। বিশ্বাসই করতে পারছে না। ওদের কথা অবিশ্বাসও করতে পারল না। কারণ ওদেরই একটা অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী নিয়ে ছবি তৈরি করছে। বিমূঢ় কণ্ঠে বলল, 'জনি বিয়াণ্ডা এই কাণ্ড করল? কিন্তু কেন? টাকার তো তার অভাব নেই? যাই হোক, আমাকে বলে ভাল করেছ। আমার মস্ত ক্ষতি করেছে সে। তাকে আমি ছাড়ব না। চার-চারজন লোককে নিয়ে আটকে রেখেছে। চলো, এখনি যাব ইন্সপেক্টরের কাছে।'

শুটিং তখনকার মত বন্ধ রেখে গোয়েন্দাদের নিয়ে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই থানার দিকে ছুটল তার শক্তিশালী ইঞ্জিনওয়ালা গাড়ি। দল বেঁধে ওরা থানায় ঢোকার সময় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

কিন্তু অফিসে ঢুকে জানা গেল, হঠাৎ করে ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ইন্সপেক্টর স্মিথ। তাঁর জায়গায় কাজ চালাচ্ছে একজন জুনিয়র অফিসার। অতিমাত্রায় ব্যস্ত। তাছাড়া কিডন্যাপিঙের মত নাজুক ব্যাপারে নাক গলাতেও সে রাজি নয়।

শুনেটুনে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বলল, 'কয়েকটা ছেলেমেয়ের কথায় কান দিয়ে লাফানোর সময় আমার নেই।'

জিনার গাল লাল হয়ে গেল। টমাসও বিরক্ত হলো। অফিসারকে বোঝানোর চেষ্টা করল, এর আগেও এধরনের কাজ ওরা করেছে। অনেক পুলিশ অফিসারেরই বিশ্বাস আছে ওদের ওপর। ওদের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু লাভ হলো না। একে তো কিডন্যাপিঙ, তার ওপর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে সে সাধারণ লোক নয়। অনেক বড় ধনী। তায় আবার বিদেশী।

'সবই বুঝলাম, মিস্টার টমাস,' বলল সে। 'কিন্তু আপনি নিজেকে আমার জায়গায় বসিয়ে একবার ভাবুন। আমি ইন্সপেক্টর স্মিথের জায়গায় কাজ করছি কয়েকদিনের জন্যে। এই থানার ইনচার্জ আমি নই। এই অবস্থায় আমার ক্ষমতা কতখানি বুঝতেই পারছেন। ভুল করলে মাপ করা হবে না আমাকে। তা-ও যদি সাধারণ লোকটোক হত এক কথা ছিল। ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু হয়ে যাবে এটা। সরি, শুধু একটা মেয়ের মুখের কথার ভরসায় জনি বিয়াণ্ডার মত লোকের বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারব না।'

রেগেমেগে মুখ খুলতে যাচ্ছিল জিনা, তার আগেই ফেটে পড়ল মুসা, 'দেখুন, স্যার, আর যাই করি, থানায় মিথ্যে কথা বলতে আসব না! মিথ্যুক নই আমরা! আপনি কার পক্ষে সাফাই গাইছেন? একটা কিডন্যাপারের। যে চারজন মানুষকে

তুলে নিয়ে গেছে। তাদেরকে ছাড়িয়ে আনা আপনার দায়িত্ব।'

'দেখো ছেলে,' অফিসারও রেগে গেল, 'আমাকে দায়িত্ব শেখাতে এসো না। তোমার যা বয়েস, আমার চাকরির সেই বয়েস। যাও এখন। আমাকে কাজ করতে দাও।'

আর কিছু করার নেই। লোকটাকে বোঝানো যাবে না। গোয়েন্দাদের নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল টমাস।

ওদেরই মত যেন হতাশ হয়েছে রাফিও। কান ঝুলে পড়েছে, লেজ ঢুকে গেছে দু-পায়ের ফাঁকে। অন্য সময় হলে সবাই হাসাহাসি করত তার এই ভঙ্গি দেখে। কিন্তু এখন হাসার মেজাজ নেই কারও।

থানা থেকে বেরিয়েই ফেটে পড়ল জিনা, 'ওরকম হাঁদা বলেই প্রমোশন হয় না ব্যাটার। আবার বলে কিনা তোমার যা বয়েস আমার চাকরির সেই বয়েস। হুঁহ্!' মুখ ভেঙচে বলল, 'শুধু একটা মেয়ের কথায় কিছু করতে পারব না! কার কথায় পারবি, ব্যাটা বেকুব কোথাকার!'

'থাক জিনা,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'গালাগাল করার দরকার কি? কথাটা তো ঠিকই বলেছে। তার জায়গায় আমাদের যে কেউ হলেও এইই করতাম। জনি বিয়াওার মত একজন লোককে ঘাঁটাতে হলে আঁটঘাট না বেঁধে সম্ভব নয়।'

'ইন্সপেক্টর স্মিথ থাকলে অবশ্য এ-ব্যাপারটা ঘটত না,' মুসা বলল। 'তিনি কিছু করার চেষ্টা করতেন।'

'নেই যখন কি আর করা,' রবিন বলল।

সবাই রেগে রেগে কথা বলছে। রাফির মনে হলো গরম হয়ে তারও কিছু বলা উচিত। বলল 'হউ! হউ!'

'এই চুপ থাক!' ধমক লাগাল জিনা। মেজাজ ভাল নেই। এখন এসব রসিকতা পছন্দ হচ্ছে না।

লজ্জা পেয়েই যেন কাঁচুমাচু হয়ে গেল বেচারি রাফি।

'শোনো,' কিশোরের কথারই প্রতিধ্বনি করল টমাস, 'অফিসার একেবারে ভুল বলেনি। প্রমাণ ছাড়া পুলিশও কিছু করতে পারে না। তবু, ইন্সপেক্টর আসুন, বলে দেখি। তিনি হয়তো কিছু করতে পারবেন।'

কিন্তু অত সময় চুপচাপ অপেক্ষা করার ধৈর্য গোয়েন্দাদের নেই। স্টুডিওতে ফিরে বিশ্রামের সময় আলোচনায় বসল ওরা। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল কিশোর, পুলিশের সাহায্য ছাড়াই কিডন্যাপ হওয়া মানুষগুলোকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে ওরা। রাতের বেলা অভিযান চালাবে ফ্লাইং অ্যাঞ্জেলে।

সেদিন শুটিঙের পর সোজা বন্দরে চলে এল ওরা। আংকেল-আন্টি নেই, কৈফিয়তেরই ঝামেলা নেই, তাই হোটেলে যাওয়া লাগল না। বন্দরে এসে ছোট একটা দাঁড়টানা নৌকা ভাড়া করল।

'মাঝরাতের আগে যাওয়াটা উচিত হবে না,' কিশোর বলল।

'এখনও তো অনেক দেরি,' মুসা বলল। 'এতক্ষণ কি করব তাহলে?'

'চলো ঘুরি। আর তো কিছু করার দেখি না।'

'তার চেয়ে চলো, হোটেলে গিয়ে জিরিয়ে নিই,' জিনা বলল। 'নৌকা তো

হলোই। সময়মত এসে নিয়ে যাব।'

'তা মন্দ বলোনি।' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ঠিক আছে। চলো।'

রাত এগারোটায় আবার বন্দরে ফিরে এল ওরা। নৌকাটা খুলে নিয়ে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলল। কিশোর আর মুসা দাঁড় বাইছে। জিনা ধরেছে হাল। অন্ধকার রাত। তবে তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ফ্লাইং অ্যাঞ্জেলের আবছা অবয়ব।

কালো বিরাট ছায়াটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে নৌকা।

জাহাজের কাছে এসে কোন জায়গায় নৌকা বাঁধতে হবে দেখিয়ে দিল জিনা। পেছনের সেই জায়গাটায় চলে এল, যেখান দিয়ে আগের দিন ইয়টে উঠেছিল।

'রবিন,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর, 'তুমি আর রাফি থাকো। পাহারা দাও। সন্দেহজনক কিছু দেখলে শিস দেবে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। যদিও সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু এসব অভিযানে দলপতির আদেশ মানতে হয়, নইলে বিপদ বাড়ে।

কোনখান দিয়ে উঠতে হবে দেখিয়ে দিল জিনা। পানি থেকে উঠতে খুব কষ্ট হয়েছিল তার। নৌকা থেকে উঠতে অতটা হলো না। একের পর এক ডেকে উঠে এল ওরা। পথ দেখাল জিনা।

জুতো খুলে নৌকায় রেখে খালিপায়ে এসেছে। ফলে হাঁটার সময় একটুও শব্দ হলো না।

নৌকায় বসে কড়া নজর রাখছে রবিন। টান টান হয়ে আছে স্নায়ু। রাফির কানে কানে বলল, 'দেখ, একটা শব্দও করবি না। যা-ই ঘটে ঘটুক, আমি না বললে তুই কিছু করতে যাবি না। খবরদার বলে দিলাম।'

কি বুঝল রাফি সে-ই জানে, তবে চুপ করে রইল। শব্দ করল না। কিন্তু শব্দটা এল অন্য জায়গা থেকে। বিচিত্র একটা ফড়ফড় শব্দ। চমকে গেল রবিন। টের পেল শক্ত হয়ে গেছে রাফি।

আবার হলো শব্দটা। কোনখান থেকে আসছে বুঝতে পারল না রবিন। অন্ধকার সাগরের দিকে তাকাল। কিছুই চোখে পড়ল না।

তৃতীয়বার শব্দ হলো। এবার একটু অন্যরকম। নখের আঁচড়ের শব্দের মত। ঝট করে ওপর দিকে মাথা তুলল রবিন। অন্ধকারে নড়ে উঠল কি যেন। বুঝে ফেলল সে। পোর্টহোলে বসে আছে একটা সী-গাল। জেগে গেছে পাখিটা। কোন কিছু বিরক্ত করেছে ওকে। কিশোররাই হবে হয়তো।

'চুপ, রাফি! ডাকাডাকি করবি না। বেশি পা সুড়সুড় করলে কাল দিনের বেলা সৈকতে যত খুশি সী-গাল তাড়াস। এখন চুপ।'

চুপই রইল রাফি। শব্দ করল না।

এগারো

কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। কিন্তু জিনা জানে প্রহরী একজন আছে গলুইয়ের

কাছটায়। সেকথা বলল মুসা আর কিশোরকে। এমনিতেই সাবধান ছিল, আরও সাবধান হলো ওরা।

হঠাৎ সুড়সুড় করতে লাগল মুসার নাকের ভেতর। হাঁচি আসছে। আল্লারে, মরেছি, ভাবল সে। এই হাঁচি আসিস না, আসিস না! এই নীরবতার মধ্যে হাঁচি দিলে কামানের আওয়াজের মত ফাটবে।

দুই আঙুলে নাকের ফুটো টিপে ধরল সে। লাভ হলো না। হাঁচিটা বেরিয়েই গেল। এবং আস্তে বেরোল না। বিকট শব্দ।

তবে ভাগ্যটা ভাল ওর। ঠিক ওই মুহূর্তে ওদের কাছেই খুব জোরে একটা দরজা লাগানোর শব্দ হলো। তাতে ঢাকা পড়ে গেল হাঁচির শব্দ।

ডেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। তেরপলের একটা বড় বাণ্ডিলের মধ্যে ডাইভ দিয়ে পড়ল তিনজনেই। চোখে অন্ধকার সয়ে এসেছে। জনি বিয়াণ্ডাকে চিনতে পারল।

রেলিঙের কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল বিয়াণ্ডা। সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখও তুলছে না, অন্য কোনদিকেও তাকাচ্ছে না। এই সুযোগে তেরপলের ভেতর থেকে বেরিয়ে ছায়ায় গা ঢেকে চলে এল আবার জাহাজের পেছনে।

সিগারেট ধরাল লোকটা। এখনও চোখ ফেরাচ্ছে না সাগরের দিক থেকে। একমনে সিগারেট টানতে লাগল। অন্ধকারে ভয়ঙ্কর এক দৈত্যের চোখের মত লাগছে সিগারেটের আগুন।

কিছুক্ষণ টেনে পোড়া সিগারেটটা পানিতে ছুঁড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়াল সে। হাঁটতে শুরু করল।

ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'আমি ওর পিছু নিচ্ছি। তোমরা ভালমত খোঁজো। জাহাজে থাকলে ওদেরকে বের করা চাই।'

মই বেয়ে নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল বিয়াণ্ডা। পেছনে নামল কিশোর। এগিয়ে চলল একটা করিডোর ধরে।

জাহাজের বেশির ভাগ আলোই নিভানো। যা জ্বলছে তা-ও অতি সামান্য।

ভালই হলো, ভাবছে সে। বেশি আলো থাকলে ধরা পড়ে যেতাম।

এত রাতে নাবিকেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। কিন্তু বিয়াণ্ডা ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? তদারক করছে? নাকি ঘুম আসছে না? অনিদ্রায় ভুগছে?

আহ, বন্দিদের কাছে যদি যেত এখন ভাল হত। কিন্তু অতটা আশা করা বোধহয় উচিত হচ্ছে না। যাই হোক, বিয়াণ্ডার পিছ ছাড়ল না সে।

একটা মোড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল লোকটা।

মোড়ের কাছে প্রায় দৌড়ে এল কিশোর। দেখল, একটা কেবিনের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক দিয়ে ভেতরে বিছানা চোখে পড়ল তার। বিয়াণ্ডার শোবার ঘর। দূর, হলো না। শুতে গেল লোকটা। সারা রাতে আর মনে হয় বেরোবে না। তাদেরকেই এখন খুঁজে বের করতে হবে বন্দিদের। আরেকটা প্যাসেজ ধরে এগোল সে।

কিশোরকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল মুসা আর জিনা। চিন্তাই লাগল। এভাবে লোকটার পিছু নেয়া কি ঠিক হলো কিশোরের? যদি ধরা পড়ে যায়? অবশ্য যা

হবার হয়ে গেছে। এখন আর ভেবে লাভ নেই। ফেরাতে পারবে না কিশোরকে।

'এসো, পুরো ডেকটায় ঘুরে দেখি,' মুসার কানে কানে বলল জিনা। 'চেনা থাকা ভাল। পরে কাজে লাগতে পারে।'

'তুমি দেখো। আমি কিশোরের পেছনে যাই। বিপদে পড়লে সাহায্য করতে পারব।'

'আমিও আসব নাকি?'

'না, তুমি এখানেই থাকো। বেশি লোক যাওয়ার দরকার নেই।'

আপত্তি করল না জিনা।

নিঃশব্দে মইয়ের দিকে এগোল মুসা, যেটা দিয়ে নেমে গেছে কিশোর।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে যাওয়ার সময় দিল জিনা। তারপর এগোল। খুব সতর্ক রইল যাতে প্রহরীর চোখে না পড়ে। সামনের দিকে গলুইয়ের কাছাকাছি গেল না।

কয়েক মিনিটেই পুরো ডেকটায় ঘোরা হয়ে গেল তার। তেমন কিছু দেখল না যেটা কাজে লাগতে পারে। কেবল কয়েকটা লাইফবোট আর হ্যাচওয়ে দেখে এল।

যেখান থেকে শুরু করেছিল আবার সেখানে ফিরে এসে ভাবল অহেতুক দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে নিচে নেমে যাবে। কিশোররা গেছে পেছনে, সে যাবে সামনে। কিন্তু সেটা করতে হলে প্রহরীর অনেক কাছ দিয়ে যেতে হবে। ঝুঁকি হয়ে যাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতেও ইচ্ছে করছে না। ঝুঁকিটা নেয়াই স্থির করল সে।

পা টিপে টিপে এগোল জিনা। কিন্তু এইবার আর আগের মত সহজে কাজ সারতে পারল না। বসে থাকতে থাকতে বোধহয় বিরক্ত হয়েই উঠে পড়ল লোকটা। শরীরটা একটু খেলিয়ে নেয়ার জন্যে হাঁটতে শুরু করল। এদিকেই আসছে।

মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল জিনা। আর কোন উপায় না দেখে একটা লাইফবোট ঢাকা তেরপলের তলায় ঢুকে পড়ল।

ঠিক তার পাশেই এসে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। সিগারেট ধরাল।

আটকা পড়ল জিনা। এই বেকায়দা অবস্থায় কতক্ষণ থাকতে হবে জানে না। লোকটা যতক্ষণ থাকবে এখান থেকে বেরোতে পারবে না সে।

মই বেয়ে ওদিকে একটা প্যাসেজে নামল মুসা। এমাথা ওমাথায় তাকাল। নির্জন। কিশোরও নেই, কেউ নেই।

'গেল কোথায়?' আনমনেই বিড়বিড় করল সে।

ম্লান আলোয় কয়েকটা দরজা চোখে পড়ল কেবল। সব বন্ধ। কোন শব্দ নেই কোথাও। এতটাই নীরব, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে সে। কি করবে এখন? কেন এসেছে সেটা ভাবল। বন্দিদের খুঁজতে এসেছে, সুতরাং সেটাই করবে। এগিয়ে চলল একদিকে।

কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। ভারি কার্পেট তার পদশব্দ যেমন ঢেকে দিচ্ছে, অন্য আরেকটা পায়ের শব্দও ঢেকে দিচ্ছে। তাই টের পেল না কিছু।

এক জায়গায় আরেকটা পথ চলে গেছে তার পথটাকে ক্রস করে। কোনটা

দিয়ে এগোবে ভাবার অবকাশও পেল না সে। মুখোমুখি হলো জনি বিয়াণ্ডার।

ভীষণ চমকে গেল সে। দৌড় দেয়ার কথাও মনে রইল না। অবশ্য এখন আর দিয়েও লাভ নেই। দেরি হয়ে গেছে।

চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই পুরোদমে চালু হয়ে গেল তার মগজ। ভাবতে আরম্ভ করল কি করা যায়। সে তো ধরা পড়েছেই, আর কেউ যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু একটা করে দলের অন্যদের পালানোর সুযোগ করে দেবে।

ভয় যে পেয়েছে সেটা বুঝতে দেয়া চলবে না। তাই লজ্জিত হাসি হাসল সে। তার কাঁধ যখন চেপে ধরল বিয়াণ্ডা তখনও চুপ করে রইল। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল না।

'অ্যাই ছেলে, এখানে কি করছ?' ধমক দিয়ে বলল বিয়াণ্ডা। 'এতরাতে জাহাজে কি?'

'স্যার, যদি শান্ত হয়ে শোনেন আমার কথা, সব বলি।'

'কি বলবে?'

'জাহাজে এভাবে ওঠার জন্যে প্রথমেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি। সরি। চুরি করে উঠেছি সত্যি, তবে চুরি করার জন্যে উঠিনি।'

'কিসের জন্যে উঠেছ তাহলে?' আরও জোরে ধমক দিল বিয়াণ্ডা।

চেহারা শান্ত রাখার চেষ্টা করল মুসা। সময় নষ্ট করতে চাইছে। যত বেশি সময় যাবে কিশোররা পালানোর সুযোগ তত বেশি পাবে। তাছাড়া কথা বলে বলে বিয়াণ্ডার মুখ থেকে কথা বের করারও চেষ্টা চালাতে হবে। জানতে হবে বন্দিদেরকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

টানতে টানতে তাকে একটা স্যালুনের কাছে নিয়ে এল বিয়াণ্ডা। ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও ঢুকল। তারপর তার হাত ছেড়ে দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলো তোমার কি বলার আছে?'

'আশা করি আমার ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারবেন, স্যার,' চেহারাটাকে যতটা সম্ভব নিরীহ করে তুলতে চাইল সে। এসব ভান-ভণিতাগুলো কিশোর ভাল পারে। অভিনয় সে কতটা ঠিকমত করতে পারছে জানে না। তবু হাল ছাড়ল না। 'বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম।'

'বাজি?'

'হ্যাঁ, স্যার। আপনার জাহাজে উঠে সারারাত থাকব। কারও চোখে পড়ব না। কিন্তু আমি হেরে গেলাম। ধরা পড়ে গেলাম। খুব খারাপ হলো আমার জন্যে। অত সাধের ক্যামেরাটা আর পাব না। ওরা বলেছিল, যদি আমি জিতে যাই, তাহলে ভাল একটা ক্যামেরা কিনে দেবে।'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল বিয়াণ্ডা। বিশ্বাস করবে কিনা ভাবছে বোধহয়।

মুসা যখন বিয়াণ্ডাকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিশোর তখন একটা আবিষ্কার করে বসেছে। ভাগ্যক্রমেই চকচকে জিনিসটা চোখে পড়ল তার। প্যাসেজের কার্পেটের ধারের সরু ফাঁকে দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে। একটুকরো

সেলোফেন। কিভাবে যেন ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের আকর্ষণ এড়িয়ে গেছে।

নিচু হয়ে সেটা তুলে নিল সে। দেখেই চিনেছিল, শুঁকে আরও নিশ্চিত হলো। ডক যে পিপারমেন্ট চিবাতে পছন্দ করে তার মোড়কের কাগজ।

তার মানে এখানে আনা হয়েছিল ডককে। হয়তো এখনও আছে।

নতুন উদ্যমে খোঁজা শুরু করল সে। প্রতিটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল ভেতর থেকে সন্দেহজনক শব্দ আসে কিনা। সামনে পেছনেও নজর রেখেছে। কেউ আসছে কিনা দেখছে। ধরা পড়লে চলবে না।

আরেকটা করিডোরে ঢুকল সে। আগেরগুলোর চেয়ে এটা অন্ধকার। লম্বা করিডোরের ছাতে একটা মাত্র আলো। অল্প পাওয়ারের বাল্ব। পথের শেষ মাথায় দরজা।

সেটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। বেরোতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে। যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিকে। আর পথ নেই। দরজার ওপাশে পথ আছে ভেবে নবে হাত রাখল সে। তাড়াহুড়ো না করে আস্তে মোচড় দিল। কিন্তু ঘুরল না ওটা। তালা দেয়া।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওপাশে কি আছে ভাবতে লাগল সে। খোলা তো গেল না। ফিরে যাবে কিনা ভাবছে এই সময় শোনা গেল গোঙানি। পরক্ষণেই একটা চাপা কণ্ঠ।

হার্টবীট দ্রুত হয়ে গেল কিশোরের। আনন্দে দুলে উঠল মন।

কণ্ঠটা চিনতে পেরেছে। ডক নরম্যানের।

এখানেই তাহলে আছে। বন্দিকে ওই কেবিনেই তাহলে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাকি তিনজন কোথায়?

শোনা গেল আরও একটা কণ্ঠ। মহিলার গলা। 'খুব কষ্ট হচ্ছে? দাঁড়াও, একটা বালিশ দিয়ে দিই নিচে। কষ্ট কম হবে।'

আর দেরি করল না কিশোর। তর্জনীর নখ দিয়ে আস্তে আস্তে আঁচড় কাটতে শুরু করল দরজায়। কয়েকটা আঁচড় দিয়ে চাবির ফুটোতে ঠোঁট রেখে চাপা গলায় বলল, 'রিচা! ডক! আমি এসেছি! আমি কিশোর!'

বারো

কথা বন্ধ হয়ে গেল। দরজার ওপাশ থেকেও আঁচড়ের শব্দ হলো। রিচা জবাব দিল, 'কিশোর! এসেছ! বের করতে পারবে আমাদের?'

'মনে হয় না,' কণ্ঠস্বর নামিয়ে রেখে যতটা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব বলল কিশোর, 'আমরা কেবল খুঁজতে এসেছি। জানেন কোথায় রয়েছেন? জনি বিয়াণ্ডার জাহাজে।'

'আমাদের কিডন্যাপ করেছে তাহলে! কেন?'

'পরে বলব।'

'আমাদের আগে বের করার চেষ্টা করো। ডকের অবস্থা ভাল না। সাংঘাতিক ব্যথা।'

এখানে বেশিক্ষণ থাকলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। কিশোর বলল,

'থাকুন। ঘাবড়াবেন না। যত তাড়াতাড়ি পারি পুলিশ নিয়ে চলে আসব। রোজার আর জুনও আছে আপনাদের সঙ্গে?'

'না। ওরা কোথায় জানি না।'

আপাতত আর কিছু জানার নেই। পিছিয়ে এল কিশোর। আরও দুটো প্যাসেজ দেখেছে, যেগুলোতে যায়নি। গিয়ে দেখবে নাকি? কোন কেবিনে পেয়েও যেতে পারে বাকি দুজনকে।

এসেছে যখন দেখেই যাওয়া উচিত। পেলে ওদেরকেও আশ্বাস দিতে পারবে।

ওই প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটা প্যাসেজে ঢুকল সে। প্রতিটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান পাতল। নব ধরে মোচড় দিয়ে দেখল। নবের তালার ফুটোয় চোখ রেখে ভেতরে উঁকি দিল। এভাবে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে এসব করতে গিয়ে মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছে। যে কেউ চলে আসতে পারে। লুকানোর জায়গা পাবে না তখন। ধরা পড়ে যাবে।

কিন্তু এত ঝুঁকি নিয়েও লাভ হলো না। পেল না বাকি দুজনকে।

নিশ্চয় অন্য কোথাও রেখেছে, ভাবল সে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। বন্দরে নোঙর করে আছে জাহাজ। ওরকম পরিচিত দুজন মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে এখানে আটকে রাখাটা বিপজ্জনক। যে কোন সময় পুলিশ এসে হানা দিতে পারে। খুঁজতে পারে। ডককেও বাইরেই রাখত। কিন্তু সে অসুস্থ। তাই জাহাজে রেখে ডাক্তার দেখিয়েছে প্রথমে। তারপর রিচাকে ধরে এনেছে তার স্বামীর সেবা-যত্ন করতে। বুদ্ধিটা ভালই করেছে বিয়াণ্ডা।

পা টিপে টিপে এগোল কিশোর। ভাবনা চলেছে।

বিয়াণ্ডা নিশ্চয় ভেবেছিল, ডক একটু সুস্থ হলেই তাকেও জাহাজ থেকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু সরানোর মত ভাল হয়নি বোধহয় ডক। না সরানোর আরও একটা কারণ থাকতে পারে। রিচা। তাকে খোঁজাখুঁজি করে যখন হাল ছেড়ে দেবে পুলিশ তখন সরানো হবে জাহাজ থেকে। রোজার আর জুনকে যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে।

থেমে গেল সে। সামনে একটা ট্র্যাপডোর। নিচে নামার পথ। নিচে নামা গেলে ওখানেও খোঁজা যাবে রোজার আর জুনকে।

কিন্তু নিচে নেমে ওদের কাউকেই পেল না কিশোর। ধুলো জমে থাকা একটা ঘর। ম্লান আলো। দড়ির বাণ্ডিল, ইয়ট পরিষ্কার রাখার নানা রকম সরঞ্জাম, ইঞ্জিন মেরামতের যন্ত্রপাতি, খাবারের বাক্স, বস্তা, টিনে বোঝাই। জাল ছড়িয়ে রেখেছে মাকড়সা।

মই বেয়ে আবার ওপরে উঠে আসতে যাবে এই সময় নেমে আসার শব্দ কানে এল তার।

চমকে গেল সে, তবে মাথা গরম করল না। লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল। বড় একটা মলাটের বাক্স উল্টে থাকতে দেখে তার ভেতরই গিয়ে সেঁধোল। তারপর বাক্সের একটা কোণ সামান্য একটু তুলে দেখতে লাগল। নাবিকের জুতো পরা একজোড়া পা চোখে পড়ল একেবারে তার কাছেই। সরে গেল সেটা। কোণটা আরেকটু উঁচু করল কিশোর। দড়ির বাণ্ডিল আর খাবারের বাক্সের কাছে গিয়ে

দাঁড়াল লোকটা।

'ইস্, আরেকটু সরে গেলেই হত,' ভাবল সে। 'একদৌড়ে তাহলে উঠে যেতে পারতাম মই বেয়ে। আমাকে দেখত না।'

কিন্তু তাকে হতাশ করে দিয়ে লোকটা গেল তো না-ই, বরং তার বাক্সের কাছাকাছিই আরেকটা কাঠের বাক্সে কি যেন খুঁজতে শুরু করল।

কি খুঁজছে?

জানা গেল শিগগিরই। একটা বোতল বের করে নিল লোকটা। বুঝতে পারল কিশোর, মনিবের দামী মদ চুরি করতে এসেছে সে। বোতলের ছিপি খুলে ঢকঢক করে গলায় ঢালতে লাগল।

'বোতলটা নিয়ে সরে গেলেই তো পারো মিয়া,' মনে মনে তাগাদা দিল কিশোর। 'যা পাওয়ার তো পেয়েই গেছ। নিয়ে কেটে পড়ো। তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি। এখানে ধরা পড়লে তোমারও বিপদ, আমারও।'

কিন্তু যাওয়ার কোন লক্ষণই নেই লোকটার। মনে হচ্ছে এখানেই নিরাপদ। বাইরে গেলে তার হাতে এই বোতল কেউ দেখে ফেললে নিশ্চয় চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে। সুতরাং এখানে বসেই শেষ করে যাওয়ার জন্যে কয়েকটা খালি বস্তার ওপর বসে পড়ল সে। আয়েশ করে চুমুক দিতে লাগল বোতলে।

বাক্সের নিচে বেকায়দা অবস্থায় থেকে খিঁচ ধরতে আরম্ভ করল কিশোরের ডান পায়ের পেশীতে। বিপদ আরও আছে। তার দেরি দেখে অস্থির হয়ে উঠবে মুসারা। তাকে খুঁজতে চলে আসতে পারে। এখানে এসে ঢুকলে মুশকিল হবে।

রহস্যটার কিনারা হতে চলেছে। এসময়ে ধরা পড়া চলবে না। তীরে এসে তরী ডোবানো হয়ে যাবে তাহলে।

তাকে টেনশনে রাখার জন্যেই যেন অনেক সময় নিয়ে মদ গিলতে লাগল লোকটা। শেষ আর করতে চায় না।

কিশোরের মনে হচ্ছে সময় এখানে আটকে গেছে।

আরও প্রায় দশ মিনিট পর যাওয়ার জন্যে উঠল লোকটা। বাক্স নামিয়ে ফেলেছিল কিশোর, লোকটার ওঠার শব্দ পেয়ে আস্তে উঁচু করল আবার কোণাটা। বোতলের মুখে আবার ছিপি লাগিয়ে দিয়েছে লোকটা। পুরোটা শেষ করতে পারেনি। আবার কোন সময় এসে খাবে। আপাতত লুকিয়ে রাখার ভাল একটা জায়গা খুঁজছে।

কিশোরের বাক্সটাই যেন পছন্দ হলো তারও। এগিয়ে এল। ধুকধুক করছে কিশোরের বুক। বাক্স পুরোটা টান দিয়ে তুলে ফেললেই সর্বনাশ।

কিন্তু তুলল না। বাক্সের একটা ধার তুলে বোতলটা প্রায় কিশোরের পা ঘেঁষে রেখে দিয়ে চলে গেল। মই বেয়ে ওঠার পর ট্র্যাপডোর বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। আর একটা মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে এল বাক্সের নিচ থেকে। নিঃশব্দে মই বেয়ে উঠে এসে সাবধানে ট্র্যাপডোর খুলে উঁকি দিল।

কেউ নেই।

প্যাসেজে বেরিয়ে খুব সতর্ক হয়ে এগোল। আর কেউ না থাকলেও এইমাত্র যে লোকটা বেরিয়ে এল সে থাকতে পারে।

কিন্তু কারও সামনেই পড়তে হলো না তাকে। নিরাপদে বেরিয়ে এল ডেকে।

ছায়ার মত নিঃশব্দে ডেক পেরিয়ে এসে রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল।

নৌকায় বসে আছে রবিন আর রাফি। জিনাও ফিরেছে। জাহাজের গায়েই বাঁধা আছে নৌকাটা।

আস্তে করে নৌকায় নেমে এল সে-ও।

'ফিরলে তাহলে,' ফিসফিস করে বলল জিনা। 'অনেক সময় লাগালে। মুসা কোথায়?'

জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর, 'কিছু পেলে?'

'না। আমাকে আটকে দিয়েছিল। পাহারা দিচ্ছে যে লোকটা সে এমন ভাবে কাছে চলে এল, আর কোন উপায় না দেখে একটা লাইফবোটের মধ্যে ঢুকলাম। অনেকক্ষণ পর সরল লোকটা। যেতে আর সাহস হলো না। ফিরে এলাম।'

'আমাকেও আটকে দিয়েছিল,' কিশোর বলল। 'তাই দেরি হলো। চুরি করে মদ খেতে ঢুকেছিল এক নাবিক। একটা বাক্সের নিচে গিয়ে লুকাতে হলো আমাকে। যাই হোক, আমি পেয়ে গেছি...'

'কি?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করল রবিন আর জিনা। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'সূত্র?'

'সূত্রের চেয়ে বেশি। ডক আর রিচাকেই পেয়ে গেছি আমি। একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে ওদের। ওদের সঙ্গে কথাও বলে এসেছি।'

'কাজই করেছ একটা!' জিনা বলল।

উত্তেজিত কণ্ঠে রবিন জানতে চাইল, 'বের করে নিয়ে এলে না কেন?'

'পুলিশের কাছে যাব। তারাই এসে করবে। মুসা এত দেরি করছে কেন?'

ঠাণ্ডা পড়ছে বেশ। খোলা নৌকায় বসে বসে সাগরের বাতাসে কাঁপ ধরে গেল গোয়েন্দাদের। মুসা আসছে না এখনও। উদ্বেগ বাড়ছে। দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

'কিছু হলো না তো?' রবিন বলল, 'গিয়ে দেখা দরকার।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল জিনা। 'দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি...'

'থামো!' হাত তুলল কিশোর। 'ওই দেখো, আলো।'

রবিন আর জিনাও দেখল। সাগরের শান্ত পানিতে আলো এসে পড়েছে। নিশ্চয় কোন পোর্টহোল দিয়ে।

'জিনা, নৌকার দড়িটা আরেকটু ঢিল করো তো,' কিশোর বলল।

খুলে দড়ি আরেকটু লম্বা করে দিল জিনা। জাহাজের কাছ থেকে আরও খানিকটা সরল নৌকা। যে পোর্টহোল দিয়ে আলো আসছে সেটা এখন চোখে পড়ল ওদের।

'ওটা মেইন স্যালুন,' আন্দাজ করল কিশোর। 'আগে কিন্তু আলোটা দেখিনি। এত রাতে কে জ্বালল? মনে হয় মুসার কিছু হয়েছে। দেখা দরকার...'

'কি করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আবার যেতে হবে আরকি।'

'আমি যাব?'

'না। আমি গেলেই সুবিধে। জাহাজের ভেতরে বাইরে ভালমত চিনে এসেছি আমি। আমার পক্ষেই যাওয়া সহজ।'

আবার ডেকে উঠে এল কিশোর। বুদ্ধি বের করে ফেলেছে। রেলিঙে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল নিচে। সেই দড়ি বেয়ে নেমে চলে এল আলোকিত জানালাটার কাছে। ভেতরে উঁকি দিল।

তার অনুমান ঠিক। মুসা রয়েছে ভেতরে। তবে একা নয়। তার সঙ্গে রয়েছে জনি বিয়াণ্ডা।

তেরো

দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক। সাংঘাতিক মুশকিলে পড়েছে। বিয়াণ্ডার হাতে পড়েছে মুসা। নিশ্চয় তার মুখ থেকে কথা আদায় করে নেবে লোকটা। জেনে যাবে ইয়টে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে ওরা।

দড়িতে ঝুলে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। হাতের পেশীতে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। কোন কিছুতে পা ঠেকিয়ে হাতের ওপর শরীরের ভার কিছুটা কমাতে না পারলে বেশিক্ষণ আর থাকতে পারবে না এখানে।

পা দিয়ে খুঁজতে শুরু করল কিশোর। পোর্টহোলটা বেশ বড়। কার্নিসটা ছড়ানো। তাতে পা রেখে দড়ি ধরে কোনমতে বসতে পারল সে। কান পেতে শুনল ভেতরের কথা।

'তাহলে,' বিয়াণ্ডার শুকনো কণ্ঠ শোনা গেল, 'তুমি বলতে চাইছ, বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে ইয়টে উঠেছ? কিন্তু আমি যে তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার কেমন জানি লাগছে।'

'লাগলে আর কি করব,' মুসা বলল নিরাশ ভঙ্গিতে। 'আমি যা বলার বললাম। বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে।'

'তুমি চুরি করতে ঢুকেছ। বাজিটাজি সব ফালতু কথা। সত্যি কথা বলো, ছেড়ে দেব। নয়তো পুলিশের কাছে যেতে হবে। কোনটা চাও?'

যা দেখার দেখেছে কিশোর। আর এখানে থেকে লাভ নেই। দড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল আবার। তাড়াতাড়ি ফিরে এল নৌকায়।

'কুইক! নৌকা ছাড়ো। সাবধান, একটু শব্দও যেন না হয়,' বলতে বলতে নিজেই নৌকার বাঁধন খুলে দিতে লাগল।

দাঁড় তুলে নিল জিনা। 'মুসাকে দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'কি করছে?'

'পরে। সব পরে বলব। এখন কথা বোলো না। জাহাজের কাছ থেকে সরে যাও তাড়াতাড়ি।'

কিশোরও দাঁড় তুলে নিল।

দ্রুত জাহাজের কাছ থেকে নৌকা সরিয়ে আনল কিশোর। তারপরেও চুপ রইল সে। তীরে না ভেড়া পর্যন্ত কথা বলল না।

তীরে নেমে মুসার কি হয়েছে জানাল সে।

মুষড়ে পড়ল রবিন, 'তাহলে এখন কি করা? বিয়াগুা ব্যাটা মুসাকে না মারপিট করে! লোকটা ভীষণ পাজি। ওকে দিয়ে সব সম্ভব।'

'মুসাকে ছাড়িয়ে তো আনার চেষ্টা করতে পারি?' জিনা বলল।

'না। গেলে আমাদেরও আটকে দেবে,' কিশোর বলল।

'একটা কাজ কিন্তু করতে পারি,' তুড়ি বাজাল রবিন। 'মুসা জাহাজে উঠে গায়েব হয়েছে, একথা গিয়ে পুলিশকে বলতে পারি। এখানে এসে তাকে খোঁজার জন্যে চাপাচাপি করতে পারি ওদেরকে।'

'তা পারি। এক ঢিলে তিন পাখি মারা হয়ে যাবে তাহলে। পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করবে। ডক আর রিচাকে পাবে কেবিনে। বিয়াগুাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তখন আর কোন অসুবিধে হবে না তাদের। রোজার আর জুনকে কোথায় রেখেছে তা-ও জেনে নিতে পারবে।'

'চলো এক্ষুণি থানায়,' তর সইছে না আর জিনার।

আরেকবার থানায় রওনা হলো ওরা। আশা করছে, এবার ওদের কথা বিশ্বাস করাতে পারবে পুলিশকে।

কিন্তু আবারও নিরাশ হতে হলো ওদেরকে। ইন্সপেক্টর স্মিথ আসেননি। ডিউটি অফিসার ওদের কথা বিশ্বাস করল না। বরং আবার ওরা তাকে বিরক্ত করতে এসেছে ভেবে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিল।

নাহ্, এভাবে হবে না। মাথামোটা লোকটাকে বোঝানো কঠিন। রেগেমেগে থানা থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। হোটেলে গেল না। কাছাকাছি একটা ওষুধের দোকানে এসে অ্যাটেনডেন্টের কাছে ফোন করার অনুমতি চাইল।

মাথা নেড়ে সেটটা তার দিকে ঠেলে দিল লোকটা।

ডিরেক্টরি ওল্টাল কিশোর। ইন্সপেক্টর স্মিথের বাসার নম্বর খুঁজতে লাগল।

রবিন বলল, 'তিনি খুব অসুস্থ বোঝাই যায়। নইলে অফিসে চলে আসতেন। কিছু কি করতে পারবেন এখন?'

'কথা বলেই দেখি।'

নম্বরটা পাওয়া গেল। তবে ইন্সপেক্টরকে রিসিভারের কাছে আনতে অনেক বেগ পেতে হলো কিশোরকে। ফোন ধরলেন মিসেস স্মিথ। তিনি কিছুতেই লাইন দিতে চাইলেন না। বিরক্ত করতে চাইলেন না অসুস্থ মানুষটাকে। কিন্তু কথার ওস্তাদ কিশোর অনেক অনুরোধটোধ করে শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পারল মহিলাকে।

শোনা গেল ইন্সপেক্টরের খসখসে কণ্ঠ, 'কিশোর? এত রাতে?'

'স্যার, সাংঘাতিক জরুরি খবর আছে। নইলে এত রাতে ডিসটার্ব করতাম না আপনাকে।'

'বলে ফেলো।'

দ্রুত এবং অল্প কথায় সব জানাল কিশোর।

বাধা না দিয়ে চুপচাপ শুনলেন ইন্সপেক্টর। সব কথা আরেকবার বলতে বললেন কিশোরকে। কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন, 'বেশ, এখুনি থানায় ফোন করে আমার ডেপুটিকে বলে দিচ্ছি। আমিও যাচ্ছি। ওখানেই দেখা হবে

তোমাদের সঙ্গে।'

রিসিভার রেখে অ্যাটেনডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সঙ্গীদেরকে জানাল সুখবর।

থানার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি নিয়ে পৌঁছলেন ইন্সপেক্টর। তাঁর গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। তাদেরকে নিয়ে অফিসে ঢুকলেন তিনি।

বদলে গেছে ডিউটি অফিসারের ভাবভঙ্গি। ওদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে তাতে লজ্জা পাচ্ছে বোঝাই যায়।

ওরা ভেবেছিল, অফিসে এসেই বিরাট পুলিশ ফোর্স নিয়ে ইয়টে তল্লাশি চালাতে রওনা হয়ে যাবেন ইন্সপেক্টর স্মিথ। কিন্তু তা না করে ওদেরকে টেবিলের সামনে বসিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে চললেন।

রাত পোহাল। সূর্য উঠল। তারপরেও বেরোলেন না তিনি।

'সার্চ ওয়ারেন্টের জন্যে বসে আছি,' অবশেষে বললেন ইন্সপেক্টর। 'পেলেই রওনা হব। তোমাদেরকে আর দরকার নেই। হোটেলে চলে যাও। ঘুমিয়ে নাওগে।'

কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না গোয়েন্দাদের। তাদেরকেও সঙ্গে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল ইন্সপেক্টরকে।

কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।

কিছুতেই যখন হোটেলে যেতে চাইল না ওরা, তখন বললেন, 'বেশ, হোটেলে না যাও এখানেই থাকো। ইজি চেয়ার আছে, ঘুমাতেও পারো। আমরা যখন যাব, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জেটি পর্যন্ত যেতে পারো। ব্যস। এর বেশি না।'

একেবারেই না যেতে পারার চেয়ে এটা ভাল। আর কথা বলল না ওরা। ইজি চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এত টেনশনের মধ্যে ঘুম ভাল হলো না। এরকম অবস্থায় হওয়ার কথাও নয়। অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতে লাগল। বেশির ভাগই দুঃস্বপ্ন। ভেঙে গেল ঘুম। দেখে শরীর শক্ত হয়ে গেছে।

নাস্তার ব্যবস্থা করলেন ইন্সপেক্টর।

রুটি, মাখন আর ডিমভাজা পেট পুরে খেয়ে কড়া করে এককাপ চা খাওয়ার পর রাতজাগার ক্লান্তি অনেকটাই দূর হলো গোয়েন্দাদের।

ওয়ারেন্ট এল। দলবল নিয়ে রওনা হলেন ইন্সপেক্টর। গোয়েন্দারাও চলল সঙ্গে।

জেটিতে অপেক্ষা করছে পুলিশের বোট।

গোয়েন্দাদেরকে বললেন ইন্সপেক্টর, 'তোমরা থাকো এখানে। মুসা আর অন্য দুজনকে পেলে নিয়ে এখানেই আসব। দেখতে পাবে।'

ছেড়ে দিল বোট। তীব্র গতিতে ছুটল।

সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল কিশোর, 'মুসা আর অন্য দুজনকে পেলে···যদি না পায়?' ঝট করে সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। 'এই, আমাদের ভাড়া করা নৌকাটা এখনও আছে। জাহাজের কাছে চলে গেলেও তো পারি?'

রবিন আর জিনাও রাজি। কিছু না বুঝেই রাফি বলল, 'হাউ!'

পুলিশের বোট রওনা হওয়ার কয়েক মিনিট পরেই গোয়েন্দাদের নৌকাও এগোল ফ্লাইং অ্যাঞ্জেলের দিকে।

দূর থেকেই দেখল ওরা, ইয়টের গায়ে ভিড়ে আছে পুলিশের বোট। আরেক দিক দিয়ে ঘুরে ওরাও চলে এল জাহাজের কাছে। পেছন দিকে এনে ঠেকাল।

আসার সময়ই ঠিক করেছে কিশোর, ওরাও উঠবে জাহাজে। কেন যেন মনে হতে লাগল ওর, মুসাকে উদ্ধার করতে ওদের সাহায্য দরকার হবে পুলিশের। বিয়াগুা আর নাবিকেরা ব্যস্ত থাকবে এখন অন্য দিকে। পুলিশ থাকবে ওদের সঙ্গে। কাজেই পেছন দিক দিয়ে জাহাজীদের অলক্ষ্যে উঠে পড়াটা কঠিন হবে না।

তার ধারণাই ঠিক। রাতে যেখানে নৌকা বেঁধেছিল, সেখানেই এখনও বাঁধল। রাফিকে চুপ করে নৌকায় বসে থাকার নির্দেশ দিয়ে রবিন আর জিনাকে নিয়ে ডেকে উঠে এল।

চোদ্দ

ইয়টের ভেতরে যেন মৌচাকের গুঞ্জন। ইন্সপেক্টর স্মিথের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশ অফিসারেরা, কেবিনে কেবিনে খুঁজছে। পাথরের মত মুখ করে মেইন স্যালুনে বসে আছে বিয়াগুা আর মলি অ্যালকট। পুলিশ হানা দেয়াতে যেন সাংঘাতিক অপমানিত বোধ করছে।

হঠাৎ ছেলেমেয়েদের ওপর চোখ পড়ল ইন্সপেক্টরের। ভুরু কুঁচকে প্রায় চিৎকার করে বললেন তিনি, 'এ কি! তোমাদের না জেটিতে থাকতে বলেছিলাম?'

কেঁদে ফেলল জিনা। 'মুসার জন্যে ভীষণ খারাপ লাগছে আমাদের, স্যার।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'ওকে জলদি খুঁজে বের করুন। ইস্, কি জানি কষ্ট হচ্ছে ওর।'

জিনার এই ব্যবহারে কিশোর আর রবিন তো থ। অনেক চেষ্টায় মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখল। আড়চোখে তাকাতে লাগল পরস্পরের দিকে।

জিনার এই অভিনয় বুঝতে পারলেন না ইন্সপেক্টর। নরম হয়ে বললেন, 'থাক, থাক, কেঁদো না। এসেই যখন পড়েছ, থাকো। দেখি, কোথায় আছে মুসা।'

এসব কথা বিয়াগুার কানেও গেল। বুঝতে পারল, তার জাহাজে তল্লাশির জন্যে এই ছেলেমেয়েগুলোই কোন ভাবে দায়ী। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ওদের দিকে। বলল, 'ও, তোমরাই তাহলে গিয়ে বানিয়ে বলেছ। ইন্সপেক্টর, কয়েকটা বাচ্চার কথায় আপনি আমার জাহাজে সার্চ করতে চলে এলেন?'

জবাব দিলেন না ইন্সপেক্টর।

রেগে উঠে কিছু বলতে-যাচ্ছিল জিনা, হাত তুলে তাকে থামালেন তিনি।

পুলিশের কাজ পুলিশ চালিয়ে গেল। কিন্তু বন্দিদের কাউকে পাওয়া গেল না। পুরো জাহাজে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মুসা, ডক বা রিচার কোন চিহ্ন পেল না। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে তিনজনে।

ডক আর রিচাকে যে কেবিনটাতে রাখা হয়েছিল সেটায় ঢুকে মনে হলো, এখানে বহু বছর কোন মানুষ বাস করেনি।

‘এঘরেই ছিল?’ কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর। ‘তুমি শিওর? ভুলটুল করোনি তো?’

‘না,’ জোর গলায় জবাব দিল কিশোর। ‘দরজার ফাঁক দিয়ে কথাও বলেছি ওদের সঙ্গে।’

‘কেউ হয়তো চালাকি করেছে তোমার সঙ্গে?’

‘না। ডক আর রিচাই ছিল। সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওদেরকে। নাহয় ধরলাম, ওদের ব্যাপারে ভুল করেছি আমি। কিন্তু মুসা? নিজের চোখে তাকে দেখেছি মেইন স্যালুনে মিস্টার বিয়াগুার সঙ্গে কথা বলতে। বিয়াগুা বলেছে তার কথার জবাব না দিলে মুসাকে আটকে রাখবে।’

ইন্সপেক্টর কিশোরের কথা অবিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো না, কিন্তু তাঁর অফিসারেরা কেউই করল না মুখ দেখেই বোঝা গেল। বিরক্ত চোখে কিশোরের দিকে তাকাল ওরা।

কি করবে বুঝতে পারছে না কিশোর। এটা কি ঘটল? এমন হবে ভাবেনি সে। তবে ভাবা উচিত ছিল। কাউকে মুক্ত তো করতে পারলই না, সবার হাসির পাত্র হলো। মাঝখান থেকে পুরো ব্যাপারটা চলে গেল বিয়াগুার পক্ষে। নিরীহ একটা ভঙ্গি করে রেখেছে সে।

মরিয়া হয়ে বলল কিশোর, ‘স্যার, বিশ্বাস করুন, প্লীজ! ডক আর রিচাকে এই জাহাজেই বন্দি করে রাখা হয়েছিল। নিশ্চয় মুসা ধরা পড়ার পর সন্দেহ হয়েছিল বিয়াগুার। তাড়াতাড়ি করে তিনজনকেই সরিয়ে দিয়েছে জাহাজ থেকে। নিশ্চয় বুঝে ফেলেছিল এইবার এখানে তল্লাশি হবেই।’

কিন্তু কথার সপক্ষে কোন প্রমাণই দিতে পারল না সে। পুলিশ অফিসারেরাও দ্বিধায় পড়ে গেছে। কি করবে ঠিক করতে পারছে না। বন্দিদের পায়নি বলে ওরাও হতাশ। গেল কিশোরের ওপর রেগে।

এরকম কিছুই চাইছিল বিয়াগুা। রাগ দেখিয়ে ইন্সপেক্টরকে বলল, ‘কাজটা ঠিক করেননি আপনি ইন্সপেক্টর। উঁচু মহলে লোক আছে আমার। এর জন্যে পস্তাতে হবে আপনাকে।’

কোন জবাব দিতে পারলেন না ইন্সপেক্টর। দলবল নিয়ে থানায় ফিরে এলেন।

সে যে কিছুই ভুল দেখেনি, একথা আরেকবার তাঁকে বলতে গেল কিশোর, কিন্তু অন্য মনস্ক হয়ে আছেন ইন্সপেক্টর। একে শরীর খারাপ। তার ওপর এভাবে অপদস্থ হয়ে এসে মেজাজও খারাপ। ভারি গলায় বললেন, ‘পুরো ব্যাপারটাই কেমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল!’

অন্য অফিসারেরা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনি কি বলেন শুনতে চাইছে। সবাই বুঝতে পারছে পুলিশের এ বোকামির খবর পত্রিকায় বড় হেডিঙে ছাপা হবে। লজ্জার সীমা থাকবে না। একজন বলল, ‘এমনিতেই তো যত দোষ পুলিশের। এবার দূর দূর করবে লোকে।’

মুখ কালো করে থানা থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। হোটেলে ফিরে গোসল সেরে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। ঘুম থেকে উঠে খেয়ে নিল পেট ভরে। অনেকটা ভাল বোধ করছে এখন। আবার কাজে মনোযোগ দিতে পারবে।

কিশোর বলল, 'বসে বসে আঙুল চুষলে হবে না আমাদের। মুসাকে উদ্ধার করার জন্যে কিছু করতেই হবে।'

'আব্বা-আম্মারও চলে আসার সময় হয়েছে,' জিনা বলল। 'এসে পড়লে আর কিছু করতে পারব না। করতে দেবে না।'

'তাহলে যা করার তার আগেই করতে হবে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

জিনাও বলল, 'ঠিক।'

রাফি ভাবল তারও কিছু বলা দরকার। সে বলল, 'হাউ!'

'এক কাজ করতে পারি,' পরামর্শ দিল রবিন, 'দলে বড় কাউকে নিতে পারি আমরা। ছোট বলে পুলিশ তো আমাদের কথা ঝেড়ে ফেলে দেয়। বড় কেউ সাক্ষি দিলে আর উড়িয়ে দিতে পারবে না।'

নিচের ঠোঁটে দুবার চিমটি কাটল কিশোর। ভাবছে। কথাটা রবিন ঠিকই বলেছে। আবার যদি কিছু করতে যায় ওরা, হয়তো কিছু করতে পারবেও, কিন্তু পুলিশকে বললে আবার অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

'বেশ,' বলল সে, 'বড় একজনকে নেয়া যায়। কিন্তু কাকে নেব?'

'হেনরি টমাসকে। চলো, তাকে গিয়ে বলি।'

'আমিও তার কথাই ভাবছিলাম। চলো।'

বাসায়ই পাওয়া গেল পরিচালককে। রোববার। ছুটি। কাজে বেরোয়নি। হাতে কফির কাপ। খবরের কাগজ পড়ছে। গোয়েন্দাদের দেখে অবাক হলো।

'আরে, তোমরা? কি ব্যাপার? মুসা কোথায়? অসুখ-টসুখ করেনি তো?'

রাতের আর সকালের সব কথা খুলে বলল ওরা।

ওদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টমাস, 'আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। বিয়াগুই তাহলে আটকে রেখেছে। মহাপাজি লোক তো। দুঃখ আছে। কপালে দুঃখ আছে ওর।'

উত্তেজিত হয়ে পড়েছে টমাস। বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে শান্ত করল ওরা। তারপর শুরু হলো আলোচনা। কি ভাবে কি করবে তার প্ল্যান। সবাই একমত হলো, রাফির ঘ্রাণশক্তির ওপরই নির্ভর করতে হবে। তাকে দিয়ে গন্ধ শুঁকিয়ে বের করতে হবে বন্দিদেরকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে। টমাস বলল, তার ছবির অভিনেতা ও টেকনিশিয়ানদেরও সাহায্য নেয়া হবে। বললেই সাহায্য করতে রাজি হয়ে যাবে ওরা।

একের পর এক টেলিফোন করে চলল টমাস। ঠিকই বলেছে। সাহায্য করতে কেউ অরাজি হলো না।

সবার আগে এল রলি বিংহ্যাম ও বব উইলস। রলির গাড়িতে করে। তারপর এক এক করে অন্য অভিনেতা ও টেকনিশিয়ানদের গাড়ি এসে থামতে লাগল টমাসের ফ্ল্যাটের সামনে।

সবাই এলে নিজের পরিকল্পনার কথা খুলে বলল কিশোর।

তর্কবিতর্ক হলো। কি করে করলে ভাল হয় একটা সিদ্ধান্তে এল সবাই।

দল বেঁধে নিচে নামল ওরা।

একটা পুরানো সাইকেল এনে নিজের ভ্যানে তুলতে তুলতে টমাস বলল, 'নিয়ে নিলাম সঙ্গে। কাজে লেগে যেতে পারে। হয়তো এমন জায়গায় চলে গেলাম যেখানে গাড়ি চলল না। তখন লাগবে।'

সাইকেলটা দেখে খুশি হলো কিশোর। কিছু বলল না। সাংঘাতিক খেপা খেপেছে জনি বিয়াগুর ওপর। মনে মনে বলল, 'আসছি আমরা, দাঁড়াও। তোমাকে একটা শিক্ষা না দিয়েছি তো আমার নাম কিশোর পাশা নয়।'

পনেরো

জাহাজঘাটায় চলে এল ওরা। কোনখানে বন্দিদের নামাতে পারে আন্দাজ করে নেয়ার জন্যে। ফ্লাইং অ্যাঞ্জেলের ডিঙিটা কোথায় বাঁধা থাকে জানে গোয়েন্দারা। গভীর পানিতে নোঙর করা থাকে জাহাজ। সেটা থেকে ডিঙিতে করেই সাধারণত যাতায়াত করে যাত্রীরা।

জায়গামতই আছে ডিঙিটা। মুসার একটা শার্ট বের করে রাফির নাকের কাছে ধরল কিশোর। বলল, 'ভাল করে শোঁক। তারপর খুঁজে বের কর।'

শার্টটা শুঁকল রাফি। আশেপাশে কয়েক পা হেঁটে এসে বসে পড়ল আবার। কান, লেজ ঝুলে পড়েছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল কিশোর আর জিনার দিকে।

'মনে হয় না এখানে এভাবে কিছু পাওয়া যাবে,' গম্ভীর হয়ে বলল টমাস। 'বিয়াগুকে এত বোকা ভাবা ঠিক হবে না। বন্দিদের এরকম একটা সরগরম জায়গায় এনে নামাবে না।'

'সেটাই ভাবছি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তবে হাতের কাছেই রাখবে। দরকার পড়লেই যাতে তাড়াতাড়ি আবার কোথাও সরিয়ে ফেলতে পারে।'

রবিন বলল, 'অন্য কোনখান দিয়েও তো নামাতে পারে। যেখানে লোকজনের চোখে পড়ার ভয় নেই।'

বব বলল, 'তা-ও হতে পারে। এক কাজ করি, চলো, উপকূল ধরে হেঁটে যাই। রাফিকে মাটি শোঁকাতে শোঁকাতে যাব।'

'তাতে সারাজীবন লেগে যাবে,' টমাস বলল। 'সহজ কিছু করা দরকার।'

কিশোর বলল, 'লোকজনের চোখে পড়বে না, এরকম একটা জায়গাই আছে। যেখানে কাপড় খুলে রেখে নৌকা নিয়ে জিনা গিয়ে জাহাজে উঠেছিল। চলুন, ওখানে গিয়ে খুঁজি।'

এইবার কাজ হলো। জায়গাটায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে নাক উঁচু করে শুঁকতে লাগল রাফি। মাটিতে নামাল। তুলতে আর চায় না। লেজ নাড়তে লাগল। তারমানে মুসার গন্ধ পেয়ে গেছে এখানে তার শক্তিশালী নাক।

শব্দ করে কয়েকবার নিঃশ্বাস টানল সে। তারপর এগিয়ে চলল। পাহাড়ের দিকে গেছে একটা রাস্তা। সেটার দিকে এগোতে যেতেই তাকে থামাল কিশোর। ফিরে তাকিয়ে সবাইকে বলল, 'সাইকেল নিয়ে আমি ওর পিছে পিছে যাব। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে আপনারাও আসুন গাড়িতে করে। সাবধান থাকতে হবে। কারও চোখে পড়া চলবে না।'

স্টুডিওর ভ্যান থেকে সাইকেলটা নামিয়ে দিল একজন টেকনিশিয়ান।

পাহাড়ী পথ ধরে চলল দলটা। সরু রাস্তা। পথ একবার উঠছে, একবার নামছে। নামার সময় সহজ, ওঠার সময়ই যত পরিশ্রম। তার ওপর আরেকটা অসুবিধে, দুহাতে হ্যাণ্ডেল ধরতে পারছে না। এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরেছে, আরেক হাতে রাফির গলার চেন।

তাদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে থেকে এগোচ্ছে দুটো গাড়ি। একটা টমাসের, আরেকটা স্টুডিওর ভ্যান। রলি নিজের গাড়িটা ফেলে রেখে টমাসের গাড়িতে উঠেছে জিনা, রবিন আর মলির সঙ্গে। দুটোতেই যখন জায়গা হয়ে যাচ্ছে অহেতুক আরেকটা নেয়ার মানে হয় না। গাড়ির মিছিল নিয়ে এগোলে চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এমন ভঙ্গি করছে কিশোর, যেন কোন উদ্দেশ্য নেই, পাহাড়ে ঘুরতে বেরিয়েছে।

হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ের একটা সরু কাঁচা পথে নেমে পড়ল রাফি। সাইকেল থেকে নামল কিশোর। ছোট্ট একটা বনের মধ্যে ঢুকছে পথটা। এলাকাটা নির্জন।

গাড়ি থামাল টমাস। সে আর রবিন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল কিশোরের পাশে।

'এখানে গাড়ি আনা যাবে না,' কিশোর বলল।

'না পারলে নেই। হেঁটেই যাব।'

'কিশোর, তোমার আর একা যাওয়া ঠিক হবে না,' রবিন বলল। 'আমিও আসছি। আমাদের পেছনে খানিকটা দূরে থাকবে অন্যেরা। সাহায্যের দরকার হলেই যেন ডাকতে পারি।'

'ডাকবে কি করে?' বলেই দু-আঙুলে চুটকি বাজাল টমাস। 'হুইসেল! দরকার হলেই বাঁশি বাজিয়ে আমাদের ডাকবে। তাহলে দূর থেকেও শুনতে পাব।'

স্টুডিও ভ্যানটার কাছে দৌড়ে গেল সে। দুটো গাড়ি পাশাপাশি রাখা হয়েছে এখন। একটা হুইসেল বের করে নিয়ে এল। তার সঙ্গে এল জিনা।

'আমিও যাব,' জিনা বলল। 'দুজনের জায়গায় তিনজন হলে অসুবিধে হবে না। চলো।'

জিনার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল কিশোর। মুরুব্বি মুরুব্বি ভাব। কিশোর যাতে মানা করতে না পারে সে জন্যে। আরেক দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

মানা করল না কিশোর। করে লাভও নেই। শুনবে না জিনা।

টমাসের হাত থেকে হুইসেলটা নিয়ে রাফিকে নিয়ে আবার এগোল তিনজনে।

ওদেরকে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল টমাস।

তবে গোয়েন্দাদের কোন অস্বস্তি নেই। বরং উত্তেজিত। নীরবে এগিয়ে চলেছে। রাফির দিকে চোখ।

'জিনা, সত্যিই বের করতে পারবে তো রাফি?' কণ্ঠস্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'পারবে। ওর ভাবসাব দেখছ না? অন্য কোন দিকে নজর নেই, কোন দ্বিধা নেই। গন্ধ না পেলে এরকম করে চলত না।'

'শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদের থামাল কিশোর। হাত তুলল, 'ওই দেখো!'

রাফির শেকল টেনে ধরেছে সে। সঙ্কেত পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে বুদ্ধিমান কুকুরটাও। লেজ ঢোকানো দু-পায়ের ফাঁকে। একেবারে চুপ।

কিশোর যা দেখেছে সেটা জিনা আর রবিনও দেখল।

খানিক দূরে একটা পুরানো খামারবাড়ি। গাছপালার আড়ালে ঢাকা। ডালপাতার ফাঁকফোকর দিয়ে অতি সামান্যই চোখে পড়ে। পোড়ো। লোকজন আছে বলে মনে হয় না।

'দেখে মনে হচ্ছে মানুষ নেই,' আনমনে বলল কিশোর, 'তবে অসতর্ক হওয়া চলবে না। কাউকে ধরে এনে লুকিয়ে রাখার চমৎকার জায়গা। কেউ জানতেই পারবে না। কয়েক মাইলের মধ্যে মানুষের বসতি নেই।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রবিন। 'কাউকে কিডন্যাপ করে এনে লুকিয়ে রাখার ভাল জায়গা। জনি বিয়াণ্ডার জেলখানা কিনা ঢুকলেই দেখতে পাব।'

'ঢুকছি না কেন তাহলে?' তাগাদা দিল জিনা। মাঝে মাঝে দুঃসাহসী হয়ে পড়ে সে। এটা তেমনি একটা মুহূর্ত। মুসাকে উদ্ধার করার জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

'তাড়াহুড়া করা চলবে না,' কিশোর বলল। 'তাহলে সব পণ্ড হতে পারে। জানালা যেদিকে আছে সেদিকে এগোব না আমরা।'

'কিন্তু ওরা ভেতরে আছে কিনা শিওর হয়ে নিলে ভাল হত না?' রবিন বলল।

'বোকার মত কথা বলো না,' জিনা বলল। 'ওরা যে আছে রাফিই তার বড় প্রমাণ। মুসার গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছে সে। দেখছ না ভেতরে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।'

শেকল টানছে রাফি। বারবার তাকাচ্ছে জিনা আর কিশোরের মুখের দিকে এগোনোর অনুমতি চাইছে। শব্দ করতে নিষেধ করা হয়েছে তাকে সে জন্যে মুখে কোন আওয়াজ করছে না।

'ঠিক আছে, এগো,' শেকল ঢিল করে দিল কিশোর।

আরও কিছুটা এগোনোর পর আবার থেমে যেতে হলো। বাড়ি আর বাগান ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া। গাছ আর ঝোপের জন্যে একেবারে কাছে না এলে চোখে পড়ে না।

তার ধরে টেনে ফাঁক করার জন্যে হাত বাড়াল রবিন, যাতে ফাঁকের ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিতে পারে।

থাবা দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিল কিশোর। 'খবরদার! ছোঁবে না! ছুঁলেই হয়তো অ্যালার্ম বেজে উঠবে। বিদ্যুৎ নেই তাই বা জানছ কি করে?'

'ঢুকব কি করে তাহলে?' হতাশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'একটাই পথ, তারের নিচ দিয়ে। গর্ত করতে হবে। মাটি নরম। সহজেই পারা যাবে। রাফিকে লাগিয়ে দেব। আমরাও সাহায্য করব তাকে।'

নির্দেশ দিল জিনা। কি করতে হবে ভালমত বুঝিয়ে দিল রাফিকে। সাবধান করে দিল, কোনভাবেই যেন তারে ছোঁয়া না লাগে।

গর্ত খুঁড়তে খুবই ভাল লাগে রাফির। অনেক মজা। হাড় লুকিয়ে রাখতে, খরগোশের বাড়ি খুঁজতে, বেড়ার নিচ দিয়ে পার হতে, এরকম অনেক কারণেই গর্ত খুঁড়তে হয় কুকুরদের। এখন বেড়া পার হওয়ার ব্যাপার। মহাআনন্দে কাজে লেগে গেল সে। তাকে সাহায্য করল কিশোররা।

'কষ্ট তো করছি,' জিনা বলল, 'কেউ দেখে না ফেললেই হয়।'

'দেখবে না,' রবিন বলল। 'দেখছ না কি ঝোপঝাড়। এর মধ্যে দেখা যাবে না।'

'ব্যস, হয়ে গেল,' বলল কিশোর। 'ঢোকা যাবে।'

রাফিকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো আগে। নির্বিঘ্নে তারের অন্যপাশে চলে গেল সে। তারপর সাবধানে, অতি সাবধানে শুয়ে পড়ে গর্তে মাথা ঢোকাল কিশোর। মাটিতে প্রায় দেবে গিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে পাড় হতে লাগল। তারে ছোঁয়া লাগার ভয়ে বুক কাঁপছে। যদি বিদ্যুৎ থাকে?

কোনরকম অঘটন না ঘটিয়ে নিরাপদেই পেরিয়ে এল সে-ও। তারপর পেরোল জিনা। সব শেষে রবিন।

এপাশে এসে মাটিতে বসেই আধ মিনিট জিরিয়ে নিল ওরা। পরিশ্রম যতটা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি কাবু হয়েছে হাই ভোল্ট বিদ্যুতের ভয়ে। জিরিয়ে নিতে নিতেই দেখল, কারও চোখে পড়ল কিনা।

সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ নেই। অন্তত ওদের চোখে পড়ল না। দাঁড়াতে চাইছে না রাফি। যাওয়ার জন্যে অস্থির।

উঠল ওরা। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা একটা মাটির নিচের ঘরের ভেন্টিলেটরের সামনে এসে দাঁড়াল রাফি। লেজ নাড়তে লাগল।

ভেন্টিলেটরের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। ফিরে তাকাল সঙ্গীদের দিকে। 'মনে হচ্ছে এখানেই আছে।'

অন্য দুজনও এসে বসে পড়ল তার পাশে। ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল। কিছু চোখে পড়ল না। শুধুই অন্ধকার।

সত্যিই দেখতে পেয়েছে তো রাফি?

ষোলো

ভেন্টিলেটরের ওপরের ঢাকনাটা অনেক পুরানো। মরচে পড়ে আছে। কিশোর বলল, 'এটা সরাতে হবে। এসো, হাত লাগাও।'

তিনজনে ধরে টানতেই খুলে এল ঢাকনাটা। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ভেতরে একবার তাকিয়েই মাথা বের করে এনে পা ঢুকিয়ে দিল। দুপ করে পড়ল তিন-চার ফুট নিচের কয়লার গাদার ওপর।

তার পাশে লাফিয়ে নামল রাফি। মৃদু গরগর করল একবার। প্রায় ছুটে গিয়ে একটা দরজার পাল্লা আঁচড়াতে শুরু করল।

একবার দ্বিধা করে কিশোরও এগিয়ে গেল। চাপ দিয়ে বুঝল, ওপাশ থেকে খিল

লাগানো। জোরে জোরে ঠেলতে লাগল সে। পচে নরম হয়ে গিয়েছে বোধহয় খিলটা, সামান্য চাপেই ভেঙে গেছে। কিংবা মাথাটা সামান্য একটু ঢোকানো ছিল, খুলে গেছে। যা-ই হোক, পাল্লা খুলতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল।

আনন্দে অস্ফুট শব্দ করে উঠল সে। ওই তো আছে ওরা! সারি দিয়ে শুয়ে আছে ক্যাম্পবেডে। রোজার, জুন, ডক, রিচা ও মুসা। সবারই হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। ইস্, সাংঘাতিক কষ্টের মধ্যে রাখা হয়েছে বেচারাদের।

রবিনও নেমেছে ভেন্টিলেটর দিয়ে। এসে দাঁড়াল কিশোরের পাশে। পকেটনাইফ বের করল কিশোর। দুজনে মিলে মুক্ত করতে লাগল বন্দিদের।

'খাইছে!' হাত ডলতে ডলতে বলল মুসা, 'রক্তই বন্ধ হয়ে গেছে। এলে তাহলে শেষ পর্যন্ত। আমি তো আশাই ছেড়ে দিচ্ছিলাম।'

অন্যেরাও গোয়েন্দাদের দেখে মুসার মতই খুশি হলো। উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করতে লাগল তারা।

ডক জানাল, তার কাঁধের ব্যথা এখন অনেক কমে গেছে।

রোজার বলল, 'নিজের ওপরই এতদিন রাগ হয়েছে আমার। এত সহজে আমাকে ধরতে দিলাম বলে। জুনের অবশ্য দোষ নেই। আমাকে খুঁজতে গিয়েই বিয়াণ্ডার খপ্পরে পড়েছে।'

'আর আমি কি করলাম?' তিক্ত কণ্ঠে বলল রিচা। 'দিনদুপুরে ধরা পড়লাম ওদের হাতে। একটু সাবধান থাকলেই আর এমন হত না।'

'তোমারও দোষ নেই,' ডক বলল। 'তুমি কি আর জানতে ওরকম জায়গাতেও ঘাপটি মেরে থাকবে ব্যাটারা।'

'সব কথা পরেও শোনা যাবে,' তাড়া দিল কিশোর, 'তাড়াতাড়ি চলুন এখন এখান থেকে। বলা যায় না, বিয়াণ্ডার লোক এসে পড়তে পারে। ওরা নেই নাকি কেউ...'

তার কথা শেষ হলো না। বেজে উঠল তীক্ষ্ণ হুইসেল।

'জিনা!' প্রায় চিৎকার করে বলল রবিন। 'নিশ্চয় বিপদে পড়েছে!'

ভেন্টিলেটরের দিকে দৌড় দিল ওরা। ওখান দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারবে।

বেরিয়ে এসে দেখল কেন বাঁশি বাজিয়েছে জিনা। দুজন লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে টমাস।

বাঁশি শুনে কিশোরদের মতই ভ্যানের লোকেরাও দৌড়ে এল। সবার আগে ছুটতে দেখা গেল রলি আর ববকে।

এতজনের সঙ্গে পারল না দুই নাবিক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাত-পা বাঁধা হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতে হলো।

গোয়েন্দারা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হতেই অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিল টমাস। মিনিট গুণেছে কেবল। ধীরে ধীরে কেটেছে সময়। শেষে ধৈর্য হারিয়েছে সে। দলের অন্যদের বলেছে, 'আমি আর থাকতে পারছি না। দেখি গিয়ে, কি হলো?'

রলি বাধা দিয়েছে, 'কিন্তু ওরা বলে গেছে বিপদে পড়লে বাঁশি বাজাবে।'

'যাতে না পড়ে পড়ার আগেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি যাচ্ছি।'

কিছুদূর এগোলে টমাসেরও চোখে পড়েছে বাড়িটা। আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে, একটা ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া। চট করে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে সে। ঝোপ থেকে বেরিয়েছে দুজন নাবিক, ফ্লাইং অ্যাঞ্জেলের লোক। জায়গাটা পাহারা দিচ্ছিল। টহল দিতে দিতে অন্য দিকে চলে গিয়েছিল বলে কিশোর গোয়েন্দাদের দেখতে পায়নি। আবার ফিরে এসেছে এদিকে। ওদের চোখে সন্দেহের ছায়া। টমাসের ভারি জুতোর শব্দ কানে গেছে।

লুকিয়ে বাঁচতে পারল না টমাস। তাকে দেখে ফেলল প্রহরীরা। ঝাপটে ধরল। চেঁচামেচি কানে গেল জিনার। দেখল, দুজন লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে পরিচালক। আর কোন উপায় না দেখে সাহায্যের জন্যে বাঁশি বাজিয়েছে সে।

মুক্ত হয়ে আসা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে কোলাকুলি, হাত মেলানো, আর শুভেচ্ছা বিনিময় চলল। জানা গেল, বাড়িটাতে আরও লোক আছে।

ছুটল সবাই আবার। পালিয়ে যাচ্ছিল মলি, পিটার ও বিয়াণ্ডার আরও একজন নাবিক। ধরে ফেলা হলো ওদের।

হাত ঝাড়তে ঝাড়তে টমাস বলল, 'পালের গোদাটাকে ধরতে হবে এবার। চলো, থানায়। যথেষ্ট প্রমাণ হাতে এসেছে। এবার আর ধুনফুন করতে পারবে না পুলিশ। না এসে পারবে না।'

না আসার প্রশ্নই ওঠে না। বরং শোনার সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডিউটি অফিসার। বাড়ি চলে গিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর স্মিথ। খবর পেয়ে ছুটে এলেন। খামারবাড়িটাকে ঘেরাও করল পুলিশ। আসামীদের হাজতে ভরা হলো।

বিশ্রামের জন্যে হোটেলে চলে গেল রোজার, জুন, ডক ও রিচা।

মলিকে প্রশ্ন করতে লাগল পুলিশ।

মরমে মরে গেছে যেন তরুণী অভিনেত্রী। সব কথা খুলে বলতেই হলো পুলিশের কাছে। জানা গেল, রাতের বেলা বন্দিদের দেখতে খামারবাড়িতে আসে বিয়াণ্ডা।

তাকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতার প্ল্যান ঠিক করলেন ইন্সপেক্টর। অপরাধস্থলে অপরাধীকে ধরতে পারলে আদালতে অপরাধ প্রমাণ
করা সহজ হবে।

টোপ হিসেবে পাঁচজন লোককে শুইয়ে রাখা হবে ক্যাম্পবেডগুলোতে। অল্প আলোয় তাদের দেখে সহজে চিনতে পারবে না বিয়াণ্ডা। ঘরে অনেক পিপে আছে। ওগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকবে সশস্ত্র পুলিশ। বিয়াণ্ডা ঘরে ঢুকলেই তাকে আটকে ফেলা হবে।

কিশোর অনুরোধ করল, তাদেরকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হোক। রোজার, জুন, মলির জায়গায় অভিনয় করতে পারবে সে, রবিন আর জিনা। মুসা তো মুসার জায়গায়ই থাকবে। ডকের জায়গায় দরকার হলে ডককেও রাখা যেতে পারে।

ভেবে দেখলেন ইন্সপেক্টর। পছন্দ হলো তাঁর। কিশোরের অনুরোধ রাখলেন।

যথাসময়ে গিয়ে ক্যাম্পবেডগুলোতে শুয়ে পড়ল পাঁচজনে। মাথার ওপর চাদর

টেনে দিল কিশোর, রবিন ও জিনা। ডক আর মুসার সে প্রয়োজন পড়ল না। বরং মুখ খুলেই রাখল, বিয়াগুা যাতে সন্দেহ করতে না পারে। করলেও অবশ্য কিছু এসে যায় না। ওঘরে একবার ঢুকলেই পড়বে ফাঁদে। কি জন্যে ঢুকেছে তার সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে না।

চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল সবাই।

নির্দিষ্ট সময়ে এল বিয়াগুা। ঘরে ঢুকেই ডকের দিকে এগোল, 'এখন কেমন আছ, ডক? ব্যথা নিশ্চয় কমেছে। তোমার জখমটা নিয়ে আমি চিন্তিত আছি।'

'আমাকে নিয়ে আর চিন্তা করার কিছু নেই, আমি ভালই আছি।' মুখ বাঁকিয়ে বলল ডক, 'এবার নিজের চিন্তা শুরু করো। বড়ই খারাপ সময় আসছে তোমার।'

'আমার খারাপ সময়...'

'হ্যাঁ,' একটা পিপের আড়াল থেকে উদ্যত পিস্তল হাতে বেরিয়ে এলেন ইন্সপেক্টর স্মিথ, 'আপনার। পাঁচজন লোককে কিডন্যাপ করার দায়ে অ্যারেস্ট করা হলো আপনাকে। থানায় গিয়ে শুনব, কেন করেছেন।'

'আ-আপনি ভুল করছেন ইন্সপেক্টর...'

'মোটেও না,' চাদর সরিয়ে উঠে বসল কিশোর। 'আপনার জারিজুরি সব খতম, মিস্টার বিয়াগুা। আপনার চামচারাও ধরা পড়েছে।'

'তু-তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি, কিশোর পাশা। বড় বেশি ছেলেমানুষ ভেবেছিলেন আমাদের, তাই না? পুলিশকেও বোকা ভেবেছিলেন। উঁচু মহলের সঙ্গে খাতির আর কোন কাজে আসবে না আপনার।'

'জেলখানায় গিয়ে চোরডাকাতের সঙ্গে খাতির করুনগে এখন,' হেসে বলল মুসা। 'আপনাকে তখনই সাবধান করেছিলাম, তিন গোয়েন্দাকে অবহেলা করবেন না...'

'বাংলায় কি যেন একটা কথা আছে না কিশোর?' রবিন বলল, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অতি চালাকের গলায় দড়ি।'

সতেরো

আমেরিকায় ফিরে এসেছে তিন গোয়েন্দা। বসে আছে এখন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে। জিনা আর রাফিও রয়েছে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। কুকুর ঢুকতে দিতে কোন আপত্তি নেই পরিচালকের।

রবিনের দেয়া কেসের ফাইলটা পড়লেন না পরিচালক, আবার তার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'এক কাজ করবে। এখন থেকে ফাইলগুলো তোমাদের কাছেই রাখবে। রেকর্ড থাকবে তোমাদের কাছে, আমার যখন যেটা দরকার চেয়ে নেব। বলো এখন গল্পটা, তোমাদের মুখেই শুনি।'

বলতে শুরু করল রবিন। মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করল কিশোর, মুসা আর জিনা।

বিয়াগুাকে গ্রেপ্তার করার পর থামল।

পুরো পনেরো সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন পরিচালক। তারপর জিজ্ঞেস

করলেন, 'টাকার তো অভাব নেই বিয়াণ্ডার। কিডন্যাপিঙের মত জঘন্য একটা কাজ কেন করতে গেল?'

'লোভ, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'অনেক পাওয়ার লোভ।'

তাকিয়ে রইলেন পরিচালক। অপেক্ষা করছেন।

বলতে লাগল কিশোর, 'বছর চল্লিশেক আগে রোজার আর ডকের এক নানা উইলিয়াম জোনস দেশান্তরী হয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমান। তাঁর বাড়ি ইংল্যাণ্ডে। আত্মীয়-স্বজনরা বিদেশে যেতে বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, দেশে থেকেই কোন কাজ করতে। দু-একটা কাজ জুটিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু চাকরিবাকরি ধাতে সইল না জোনসের। কারও কথায়ই কান না দিয়ে শেষে চলে এলেন আমেরিকায়। এখানে এসে কপাল খুলে গেল তাঁর। এক ব্যবসায়ীর নজরে পড়ে গেলেন। পছন্দসই কাজ পেয়ে কাজ নিয়ে মেতে রইলেন। কাজের চাপে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারলেন না। রাগ করে আত্মীয়রাও তাঁর কোন খোঁজ করল না।

'বহু বছর কোন খোঁজখবর নেই। কতদিন আর মনে থাকে। আত্মীয়রা তাঁর কথা ভুলেই গেল। তাছাড়া মনে রাখার মত কোন চরিত্র তিনি ছিলেনও না তাদের কাছে। তারা ভুললেও জোনস কিন্তু তাদের ভোলেননি। একটা দুর্বলতা থেকেই গিয়েছিল। বোনের দুই মেয়ের দুই ছেলে হয়েছে খবর পেলেন একদিন। সম্পর্কে ওরা তাঁরও নাতি।'

'রোজার আর ডক?'

'হ্যাঁ। তিনি ওদের খবর জানলেও ওরা তাঁর কথা জানত না। তাদেরকে বলা হয়নি কখনও। ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে একজন মানুষের কথা বলার প্রয়োজনই মনে করেনি কেউ। আত্মীয়দের কেউ কেউ ধরে নিয়েছিল জোনস আমেরিকায় গিয়ে মারা গেছেন।

'ইংল্যাণ্ডে আর ফিরে যাননি জোনস। বিয়ে করেননি। নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। আমেরিকায়ই একটা এতিম ছেলেকে ছেলের মত মানুষ করেন। ছেলেটা বুদ্ধিমান। লেখাপড়া শিখল। সহজেই ঢুকে গেল জোনসের বিশাল ব্যবসার মধ্যে। তাকে নিজের কারখানার ম্যানেজার বানিয়ে দিলেন জোনস।'

'প্লাস্টিকের ব্যবসা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'জনি বিয়াণ্ডা?'

আবারও মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'বলে যাও।'

আগের কথার খেই ধরল কিশোর, 'জোনসের পালকপুত্র বিয়াণ্ডা। ভাবল, সব সম্পত্তি তারই হবে একসময়। সুতরাং মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে গেল সে। কোম্পানির আরও উন্নতি হলো। এই সময় একদিন জানল, জোনসের আরও উত্তরাধিকারী আছে। তাঁর দূর সম্পর্কের দুই নাতি। উকিলকে ডেকে উইল করিয়েছেন জোনস, সম্পত্তি তিন ভাগ করে দিয়েছেন। এক ভাগ পাবে বিয়াণ্ডা, বাকি দুই ভাগ রোজার ও ডক। পাবে জোনসের মৃত্যুর পর।

'এ খবর শুনে মাথা গরম হয়ে গেল বিয়াগুার। কি করা যায় ভাবতে লাগল। সম্পত্তির দুই ভাগ কিছুতেই সে অন্যকে দিতে রাজি নয়। সুযোগ এসে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। অসুখে পড়লেন জোনস। ডাক্তার রায় দিয়ে গেল ক্যান্সার। আর বেশিদিন আয়ু নেই জোনসের।

'দুই নাতিকে দেখার প্রবল আগ্রহ চেপে রাখতে পারলেন না জোনস। বিয়াগুাকে ডেকে অনুরোধ করলেন, ইংল্যাণ্ড থেকে তাদের নিয়ে আসার জন্যে।

'বিয়াগুা দেখল এইই সুযোগ। সামান্যতম প্রতিবাদ না করে সেদিনই বেরিয়ে পড়ল সে। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে খুঁজে বের করল রোজার আর ডককে। কৌশলে আটকে ফেলল।'

থামল কিশোর।

পরিচালক বললেন, 'আটকে রেখে কি লাভ হত? জোনস মারা গেলে তাঁর উকিল জানিয়ে দিত কাকে কাকে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন তিনি। দুই ভাইকে মেরে ফেলার ইচ্ছে ছিল নাকি বিয়াগুার?'

'না। জাহাজে আটকে রেখে জোনসের কাছে গিয়ে বলত ওদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পটিয়েপাটিয়ে পুরো সম্পত্তি তখন তার নামে লিখিয়ে নিত। বংশের কেউ না থাকলে বিয়াগুাকেই সব দিয়ে যেতেন জোনস।'

'কিন্তু ছাড়া পেলেই তো গিয়ে আদালতে বিচার চাইত রোজার আর ডক। তখন?'

'ওরা জানতেই পারত না ওদের এক বাউণ্ডুলে নানা কোটিপতি হয়ে এত টাকার সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন। আটকে রাখার খেসারত হিসেবে ওদেরকে কয়েক লাখ করে টাকা দিয়ে দিত বিয়াগুা। তার নামে কেস করা তো তখন দূরে থাক, তাকে মাথায় করে নাচত ওরা। পুলিশকে কিচ্ছু বলত না।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে পরিচালক বললেন, 'হুঁ, লোভ বড় ভয়ানক জিনিস। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু...' মুখ তুললেন তিনি। 'মলিও নিশ্চয় লোভে পড়েই বিয়াগুাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? টাকার লোভে প্রত্যাখ্যান করেছিল পিটারকে?'

'হ্যাঁ, স্যার,' জবাব দিল রবিন। 'পিটারকে বিয়ে করার কথা দিয়েও বিয়াগুার সঙ্গে পরিচয়ের পর সে কথা রাখেনি মলি।'

মুসা বলল, 'অথচ পিটার কিন্তু তাকে সত্যিই ভালবেসেছিল।'

'খুব ভাল হয়েছে এখন,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল জিনা। 'বিয়াগুাকে তো পেলই না, পিটারকেও হারাল। শয়তানগুলোর এমনই হয়।'

কয়েক সেকেণ্ড নীরব হয়ে রইলেন পরিচালক। তারপর বললেন, 'এবার তোমাদের কথা বলো। ছবিটা নিশ্চয় শেষ করেছিলে?'

'করেছি,' জবাব দিল রবিন। 'সম্মেলন শেষ হওয়ার পরও আরও কয়েক দিন সাউথবুর্নে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেরিআন্টি। পুরোপুরি ছুটি কাটানোর জন্যে। সম্মেলনটাকে কাজ হিসেবেই ধরেছিলেন তিনি।'

'যাক, বেচারা টমাসকে আর লোকসান দিতে হলো না।'

'না। বরং আরও একটা চমৎকার ছবির কাহিনী পেয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি আপত্তি না করেন।'

'আমি আপত্তি করব মানে?'

'তিন গোয়েন্দার সব কাহিনীই তো আপনার কাছে জমা দিই আমরা। পছন্দ হলে আপনি ছবি করবেন, সেরকমই কথা আছে। টমাস যেটা করেছে সেটা আপনার পছন্দ হয়নি বলেই সে করতে পেরেছে। এখন এই কিডন্যাপের কাহিনীটা যদি আপনার পছন্দ না হয়...'

'আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।'

'তাহলে আপনিই করছেন?'

'করতে অসুবিধে নেই। তবে টমাসও করতে পারে। সে করবে ইংল্যাণ্ডের দর্শকদের জন্যে, তার মত করে। আমি করব আমেরিকার জন্যে আমার মত করে। কাহিনী সামান্য এদিক ওদিক করে নিলেই হবে। তাছাড়া এই কাহিনীতে তারই অধিকার বেশি। এতে সে নিজে অংশগ্রহণ করেছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, 'ঠিক একথাই বলবেন, আমি জানতাম। টমাসকে কালই চিঠি লিখে জানিয়ে দেব, আপনার আপত্তি নেই।'

'আবার অভিনয় করতে যাচ্ছ নাকি তোমরা?'

'জানি না। আমার অভিনয়ের ইচ্ছে নেই। তবে ইংল্যাণ্ডে আবার বেড়াতে যাওয়ার লোভটা আছে ষোলো আনা। ছবি করলে সামনের গরমেই আমাদের নিয়ে যাবে টমাস। খরচ-খরচা সব তার।'

'আপত্তি না করে ভালই করেছি। আমার ওপরই খেপে যেতে তোমরা,' হাসলেন পরিচালক।

'না না, স্যার, কি যে বলেন!'

'দেখো, অভিনয় করতে গিয়ে আবার কোন রহস্যে জড়াও।'

'জড়ালে তো ভালই হয়,' আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল জিনা। 'জট ছাড়ানোর সুযোগ পাবে।'

হাসল সবাই।

কিশোর বলল, 'আজ তাহলে উঠি, স্যার।'

'আরে বসো, বসো, এতদিন পর এলে। তাছাড়া নতুন মেহমান নিয়ে এসেছ। আমাদের রাফিয়ান। তাকে না খাইয়ে ছাড়ি কি করে? কি রে রাফি, কি খাবি?' কলিং বেলের সুইচে চাপ দিলেন তিনি।

তার দিকে নজর দেয়ায় খুশি হলো রাফি। এতক্ষণ মনমরা হয়ে ছিল বেচারা। মুখ তুলে বেশ জোরাল স্বরে বলল, 'হউ! হউ!'

'কি বলল?' জানতে চাইলেন পরিচালক।

ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা। অনুবাদ করে দিল, 'চিকেন স্যাণ্ডউইচ, স্যার। ফ্রুট কেক আর আইসক্রীম। বেশি করে আনাতে হবে। ব্যাটা আবার রাক্ষস। অল্পে পেট ভরে না।'

হো হো করে হেসে উঠলেন পরিচালক।

দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল বেয়ারা। তাজ্জব হয়ে গেছে। সদাগম্ভীর ডেভিস ক্রিস্টোফারের অট্টহাসি তো দূরের কথা, মুচকি হাসিও দেখেনি কখনও।

*****
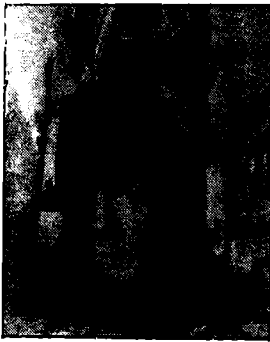
আলোর সঙ্কেত

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৯৪

কুকুরটাকে কোলে নিয়ে গেটের ভেতরে ঢুকল মুসা।

বাগানে ফুলগাছের মরা-পাতা বাছছেন মিসেস আমান। ভুরু কুঁচকে তাকালেন। 'এই ঘেয়োটাকে আবার জোগাড় করলি কোত্থেকে?'

কুণ্ঠিত হাসি হাসল মুসা। 'দেখো, মা, ফেলে দিয়ে আসতে বোলো না, প্লীজ! ওর শরীর খুব খারাপ।'

'পেলি কোথায়?'

'রাস্তায় পড়ে ছিল। পিটিয়ে আধমরা করেছে পাজি ছেলেগুলো। একটা কানও কেটে দিয়েছে, এই দেখো না...'

'ওসব দেখার আমার দরকার নেই। পানিটানি খাওয়া, একটু সুস্থ হলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আয়। কতবার বলেছি, এসব আমার পছন্দ না, বাড়িতে ঢোকাবি না, তা-ও আনে,' গজগজ করতে করতে আবার পাতা বাছায় মন দিলেন তিনি।

'কি হয়েছে, মুসা?' পেছনে শোনা গেল বাবার কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল মুসা। গ্যারেজের দরজায় বেরিয়ে এসেছেন মিস্টার আমান।

সেদিকে এগিয়ে গেল মুসা। কুকুরটাকে নামিয়ে রাখল বাবার পায়ের কাছে।

ঝুঁকে বসলেন আমান। আস্তে করে টেনে দেখলেন বাঁ কানটা। গোড়ার কাছে অনেকখানি কেটেছে। 'কি করে কাটল?'

'ছুরি দিয়ে কোপ মেরেছে।'

'খুব বেশি কাটেনি। কপাল ভাল ওর। কোপটা লাগেনি ঠিকমত।'

'কিন্তু রক্ত তো বন্ধ হচ্ছে না।'

এদিকে না তাকিয়েই মিসেস আমান বললেন, 'নিজেরা ডাক্তারি করতে না বসে পশু হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেই হয়।'

'ঠিক বলেছ,' মুসা বলল, 'তবে হাসপাতালে নেয়ার দরকার নেই। কাছেই একজন পশু-ডাক্তার আছে, তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

মুসাদের ব্লকের দুই ব্লক পরেই থাকেন ডাক্তার। দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কুকুর?'

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ! জখমটা কি খুব বেশি?'

'না না, তেমন কিছু না, গোটা দুই সেলাই লাগবে, ব্যস। শক্ত করে ধরে রাখো, নড়চড়া যাতে না করে। ব্যথা তেমন পাবে না। নাম কি?'

'মুসা। মুসা আমান।'

ভুরু কুঁচকে তাকালেন ডাক্তার, 'কুত্তার সেকেণ্ড নেম!'

'ওটা আমার নাম।'
'তোমার কথা জিজ্ঞেস করছি না। কুত্তাটার?'
'চিতা,' কোন কিছু না ভেবেই বলে দিল মুসা।
'হুঁ, ভাল নাম। চিতাবাঘ রাখলে মানাত না। চিতাবাঘ, অর্থাৎ লেপার্ড হলো বিড়াল গোষ্ঠীর প্রাণী। আর চিতা কুকুর গোষ্ঠীর। কাজেই...'
'জানি।'
'জানো? গুড বয়। লেখাপড়া তাহলে করো।'
বই পড়ে যে এ-জ্ঞানটা অর্জন করেনি মুসা, রবিনের কাছ থেকে শুনে শিখেছে, সেকথা আর বলল না। তবে সে-জন্যে লজ্জিত নয় সে। একভাবে শিখলেই হলো—বই পড়েই হোক, আর কারও কাছে শুনেই হোক।
পাঁচ মিনিটেই কাজ শেষ হয়ে গেল ডাক্তারের। ফিস দিতে গেল মুসা, নিলেন না তিনি। 'লাগবে না। তেমন তো কিছু করিনি। যাও, নিয়ে যাও, সেরে যাবে। জায়গাটা চুলকাতে দেবে না। চুলকালে ক্ষতি হতে পারে।'
'কিন্তু আটকাব কি করে?' জিজ্ঞেস করল উদ্বিগ্ন মুসা। 'এখনই দেখেন না চুলকানোর জন্যে কেমন শুরু করে দিয়েছে।'
'এক কাজ করতে পারো,' নাক চুলকালেন ডাক্তার। 'একটা কার্ডবোর্ড গোল করে কেটে গলায় পরিয়ে দিয়ো। তাহলে আর কাটাটা নাগাল পাবে না।'
'কিন্তু গলায় এতবড় কার্ডবোর্ড, সহ্য করবে? খুলে ফেলতে চাইবে তো।'
'শক্ত দেখে দেবে। যাতে ছিঁড়তে না পারে। এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। যদি পা বেঁধে ফেলে রাখতে না চাও।'
'নাহ্, সেটা অমানুষের কাজ হয়ে যাবে।'
'তাহলে এই-ই করোগে।'
কুকুরটাকে নিয়ে বাড়ি রওনা হলো মুসা। কথা বলতে বলতে চলল, 'শোন্, তোর আগের নাম কি জানি না। নতুন নাম দিলাম, চিতা। জবাব দিবি কিন্তু। মনিব-টনিব নিশ্চয় নেই তোর। তাহলে পথে ফেলে পেটাতে পারত না। কি, চিতা ডাকলে জবাব দিবি তো?'
কি বুঝল কুকুরটা কে জানে। সেবা-যত্ন পেয়ে দুর্বলতা অনেকখানি কেটেছে। মৃদু গলায় বলল, 'ঘাঁউ!'
বিশাল কুকুর, সাংঘাতিক ভারি। হাঁপিয়ে গেছে মুসা। আর কোলে রাখতে না পেরে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'হাঁট এবার। পারবি তো?'
জবাব না দিয়ে রাস্তায় বসে পড়ল কুকুরটা। একটা পা তুলে চুলকানোর জন্যে নিয়ে গেল জখমী কানটার কাছে।
ঝট করে তার পা চেপে ধরল মুসা। 'না না, এই কাজও করিসনে! প্ল্যাস্টার, ওষুধ, সব যাবে!'
অবাক হয়ে মুসার মুখের দিকে তাকাল কুকুরটা। পা ছাড়ানোর চেষ্টা আর করল না। বোধহয় ভাবল, *আমার কাছে কাছে আর থাকবে কতক্ষণ? দাঁড়াও, একা হয়ে নিই, প্রাণভরে চুলকে নেব।*

কিন্তু তার ভাবনাও যেন পড়ে ফেলল মুসা। বলল, 'সে সুযোগ আর তোকে দেয়া হচ্ছে না। বাড়ি গিয়েই কার্ডবোর্ডের কলার লাগাব।'

গেটের ভেতর ঢুকে এবার আর মাকে চোখে পড়ল না। পাতা তোলা শেষ বোধহয়, ঘরে চলে গেছেন। বাগানের কোণে ছায়ায় বসে কাজে লেগে গেল মুসা। একটুকরো কার্ডবোর্ড জোগাড় করে এনে গোল করে কাটল। তার মাঝখানে গোল ছিদ্র করল একটা, কুকুরটার গলার মাপে। কার্ডবোর্ডের বড় একটা রিঙ তৈরি হয়ে গেল। মাথা গলে ঢুকবেও না, বেরোবেও না। তার একধার কেটে ফাঁক করে ঢুকিয়ে দিল কুকুরের গলায়। কাটাটা আবার সরু তার দিয়ে সেলাই করে জুড়ে দিল।

'ব্যস, হয়েছে। এবার হাঁট তো দেখি।'

হাঁটল কুকুরটা। পা তুলে চুলকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু শক্ত হার্ডবোর্ডের ওপর দিয়ে কোনমতেই কাটা কানের নাগাল পেল না।

'অসুবিধে লাগছে? কয়েকটা দিন সহ্য কর, ঠিক হয়ে যাবে।'

গ্যারেজের দরজায় বেরোলেন মিস্টার আমান। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কুকুরটার দিকে। তারপর হা-হা করে হেসে উঠলেন, 'এ-কি! রানী প্রথম অ্যালিজাবেথের রাফ পরিয়ে দিয়েছ দেখি! হা-হা-হা-হা!'

'হাসছ কেন? অত হাসির কি হলো? ডাক্তার পরাতে বলল, পরিয়ে দিলাম।'

কুকুরটা বোধহয় ভাবল, তারও কিছু বলা দরকার, আমানের দিকে তাকিয়ে উঁচুস্বরে 'হাউ! হাউ!' করল দুই বার।

আরও জোরে হেসে উঠলেন তিনি। 'দেখো দেখো মুসা, কুত্তাটা তোমার পক্ষ নিয়েছে।'

অত হাসাহাসি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মুসার আম্মা। অবাক হয়ে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর ফেটে পড়লেন, 'এই জন্যেই, এই জন্যেই এসব রাখতে দিই না আমি বাড়িতে। কাজকর্ম ফেলে রেখে যত সব আদিখ্যেতা শুরু হয়ে যায়। অ্যাই মুসা, ওটা কি লাগিয়েছিস?'

'কেন কলার, দেখতে পাচ্ছ না?'

'এটা কি ধরনের কলার হলো?'

'বাবা বলল, অ্যালিজাবেথিয়ান...'

'চুপ, গাধা কোথাকার! খোল জলদি, খোল...'

'বা-রে, ডাক্তার যে বলল লাগাতে?'

'তাহলে কুত্তাটাকেই ফেলে দিয়ে আয়, যেখান থেকে এনেছিস সেখানে। এই ভাঁড় যেন দ্বিতীয়বার আর আমার চোখে না পড়ে। ওফ্, অসহ্য!' গজগজ করতে করতে আবার ভেতরে চলে গেলেন মিসেস আমান।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'মুসা, এটাকে রাখার ইচ্ছে নাকি তোমার?'

'হ্যাঁ, বাবা, কিন্তু মা...'

'কয়েক দিনের জন্যে দূরে কোথাও সরিয়ে রাখো। কান ভাল হয়ে গেলে কলারটা খুলে ফেলে দিয়ো। তারপর দেখা যাক। সহ্য করিয়ে নেয়া যাবে আস্তে আস্তে। যদি কুত্তাটা কোন গোলমাল না করে।'

'বাবা, ওর নাম চিতা রেখেছি।'
'ভাল নাম। অ্যাই কুকুর, চিতা বললে জবাব দিবি?'
ঘাড় নাড়িয়ে যেন জবাব দিল সে, 'ঘুফ্!'
হেসে, কাজ করতে চলে গেলেন বাবা। মুসা ভাবতে লাগল, কোথায় রাখা যায় কুকুরটাকে? কিশোরদের স্যালভিজ ইয়ার্ড? নাহ্, মেরিচাচীও তেমন পছন্দ করেন না। রবিনদের বাড়িতেও রাখার মত ঘর নেই। বাইরে বেঁধে রাখলে পারা যায়। কিন্তু একটা আহত জানোয়ারকে বাইরে বেঁধে রাখা কি উচিত হবে? বাইরে রাখলে তো তাদের বাড়িতেই···
'আরি, মুসা, এটা কি?'
ফিরে তাকাল মুসা। ওদের রাঁধুনি ডেইজি। 'কি আবার, কুকুর। দেখছ না?'
মুসার পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়ে হি-হি করে হাসল মহিলা। 'কুকুর! ও-মা, আমি তো ভাবলাম দক্ষিণ আমেরিকার কোন জন্তু! হি-হি!'
'অত হি-হির কি হলো?' ধমকে উঠল মুসা, 'যাও, ঘরে যাও।'
আরও জোরে হি-হি করে কুকুরটার দিকে তাকাতে তাকাতে ঘরে চলে গেল ডেইজি।
নাহ্, এখানে আর থাকা যাবে না। আপাতত স্যালভিজ ইয়ার্ডেই চলে যাবে। কিন্তু চিতাকে নিয়ে গেটের বাইরে সবে বেরিয়েছে, পড়ে গেল একেবারে টেরিয়ার ডয়েলের মুখোমুখি।
থমকে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু। কঙ্কালসার লম্বা একটা আঙুল কুকুরটার দিকে তুলে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল। 'বা-বা বা-বা, গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে এবার সার্কাসের দলে নাম লেখাতে যাচ্ছ নাকি?'
'ছাগলের মত বা-বা করছ কেন? যেখানেই যাই, তাতে তোমার কি, শুঁটকি কোথাকার!'
একটুও রাগ করল না টেরি। হাসির পরিমাণ আরও বাড়াল। 'এই ফকিরা কুত্তাটাকে জোগাড় করলে কোত্থেকে? একেবারে একটা ভাদাইম্মা। অতই যদি কুত্তা পোষার শখ হয়েছিল, আমাকে বললেই হত, দান করে দিতাম একটা। কতই তো আছে আমার।'
'ভাদাইম্মা' গালিটা পছন্দ হলো না চিতার। শুঁটকি হাসছে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে, সে রাগল খক-খক করে, লাফ দিয়ে এগোলো তার দিকে। হাস্যকর ভঙ্গিতে দুলে উঠল গলার কলার।
টেরিও লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে ব্যঙ্গ করল, 'ও-মা, আবার কামড়াতে আসেগো! এই ভাদাইম্মা, তোর আবার রাগও আছে দেখি?'
'না রাগ নেই,' মুসা বলল, 'শুঁটকির গন্ধ সহ্য করতে পারে না তো, তাই অমন খেপেছে।'
তবুও রাগল না টেরি। 'শুঁটকি তো ভাল জিনিস, জানো না বুঝি? অনেক দাম। দুনিয়ার অনেক লোকের প্রিয় খাবার। ফকিরা কুত্তা তো, ডাস্টবিন থেকে মরা ইন্দুর খেয়ে অভ্যাস, ভাল গন্ধ আর সহ্য করতে পারে না।'

টেরির মত ধৈর্য নেই মুসার। আর শান্ত থাকতে পারল না। রেগে উঠে হুকুম দিল কুকুরটাকে, 'যা তো চিতা, দে ব্যাটাকে কামড়ে, দেখি তোর বাহাদুরি! শুঁটকিগিরি যেন আর জীবনে করতে না আসে!'

ঘাউ করে বাঘের হাঁক ছাড়ল চিতা। নিরীহ ভালমানুষ কুকুরটার যে এত রাগ আছে, এত জোরে হুঙ্কার ছাড়তে পারে, মুসাও কল্পনা করেনি। চমকে গেল। শুঁটকিরও হাসি চলে গেছে।

আরেকবার ঘাউ করে উঠে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল চিতা। গলার বোর্ডটা অসুবিধে করছে। সে-জন্যেই বেঁচে গেল টেরি, নইলে কুকুরের কামড় তাকে খেতেই হত। ঘুরে মারল দৌড়। কয়েক পা গিয়েই একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে আছাড় খেল। গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল চিতা।

'বাবাগো, খেয়ে ফেলল গো!' বলে চিৎকার করে কোনমতে উঠে আবার দৌড় দিল টেরি।

পেছনে কিছুদূর তেড়ে গেল চিতা। তারপর 'ত্যাঁদড় ছোকরাটাকে যথেষ্ট শিক্ষা দেয়া হয়েছে' ভেবে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এল।

হাসতে হাসতে বাঁকা হয়ে গেছে মুসা। কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল। কিশোর আর রবিনকে বলার জন্যে তর সইছে না। তাড়াতাড়ি এগোল। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। পিছে লাগল কয়েকটা ছেলে। টিটকারি দিতে লাগল। হাততালি দিয়ে, কুকুরটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে, গান গেয়ে গেয়ে খেপাতে শুরু করল মুসাকে। এদের মধ্যে একটা ছেলে আছে, শুঁটকির দলের।

কত আর সওয়া যায়? ইয়ার্ডে যাওয়া বাদ দিয়ে মুখ গোমড়া করে আবার চিতাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল মুসা। ঠিক করেছে, মা এবার কিছু বললেই হয়, মুখের ওপর জবাব দিয়ে দেবে।

গেটের ভেতর ঢুকতেই তাঁর সঙ্গে দেখা। 'অ্যাই দেখো, আবার নিয়ে এসেছে! ঝাঁটাপেটা করে না তাড়ালে আর ফেলবি না, না?'

মনে মনে যতই ঠিক করুক জবাব দেবে, মায়ের মুখে মুখে কথা বলার সাহস নেই মুসার, মিনমিন করে বলল, 'মা, ও একটু ভাল হয়ে উঠুক···কয়েকটা দিন···'

'না! ভাল কুত্তা হলেও এককথা ছিল। একটা ঘেয়ো, তা-ও আবার কান কাটা, পাগল হয়ে গিয়ে শেষে জলাতঙ্কই ছড়াবে না কি···'

'মা, কান কাটলে পাগল হয় না কুকুর···'

'চুপ, আবার বেশি কথা! আমি বলেছি, এ-বাড়িতে কুকুর-বেড়াল থাকবে না, ব্যস থাকবে না, আর কোন কথা নেই, আর যেন বলতে না হয়।'

মুখ চুন করে গ্যারেজের দিকে রওনা হলো মুসা। কুকুরটা বুদ্ধিমান। কি করে যেন বুঝে গেছে, তাকে নিয়েই যত অশান্তি। চুপচাপ মুসার সঙ্গে সঙ্গে গেল সে, টুঁ শব্দ করল না।

গ্যারেজের পেছনে একচিলতে জায়গা আছে। সেখানে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। কুকুরটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল মুসা, 'চিতা, আজই আমরা চলে যাব, বুঝলি। এ-বাড়িতে আর না। আমার ইচ্ছেমত একটা কোন জানোয়ার

পালতে পারব না, এখানে কে থাকে? বল, কেউ থাকে এরকম জায়গায়?'

মাথা নেড়ে কুকুরটা বলল, 'হাউ!'

'বুদ্ধি আছে তোর, সব বুঝিস। আজ রাতেই চলে যাব আমরা। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, চুপি চুপি বেরিয়ে আসব আমি। মা-কে দেখিয়ে তো যাওয়া যাবে না, চুরি করেই যাব। আমার তাঁবুটা নেব, সাইকেল নেব। একটা সুন্দর জায়গা আছে, গোল্ডেন স্প্রিঙ, কিশোর বলে সোনালি ঝর্না, সেখানে চলে যাব। দেখবি, তোরও ভাল লাগবে। তোর কান ভাল না হওয়া পর্যন্ত ফিরব না। কি বলিস?'

'হাউ!'

'ভেরি গুড। লক্ষ্মী ছেলে। তাহলে এই কথাই রইল। তুই এখানেই থাক, খবরদার, একটুও বেরোবি না। মা দেখলে আর রক্ষে থাকবে না। আমি তোর খাবার এখানেই দিয়ে যাব।'

সুতরাং গভীর রাতে, বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে, সেই সময় পা টিপে টিপে নিচতলায় নেমে এল মুসা। জিনিসপত্র আগেই গুছিয়ে সবার অলক্ষ্যে নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছে গ্যারেজের পেছনে। সাইকেলটা বের করে চলে এল সেখানে। তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে কুকুরটা। বেরোয়নি। জিনিসগুলো পাহারা দিয়ে রেখেছে।

তাঁবু আর খাবার-দাবারগুলো সাইকেলের ক্যারিয়ারে তুলে নিল মুসা। বেঁধে নিল দড়ি দিয়ে, যাতে পড়ে না যায়। ব্যাকপ্যাকটা পিঠে বেঁধে বলল, 'চল, চিতা। খবরদার, কোন শব্দ করবি না।'

সাইকেল ঠেলে নিয়ে গেটের বাইরে বেরোল সে। কুকুরটা ছায়ার মত নিঃশব্দে এল তার সঙ্গে সঙ্গে।

সাইকেলে চাপল মুসা। আস্তে আস্তে প্যাডাল করে এগিয়ে চলল। চিতা চলল তার পাশে পাশে।

রাতের অন্ধকারে যে হারিয়ে গেল দুজনে, বাড়ির কেউ জানল না। তেমনি নীরব হয়ে আছে বাড়িটা। কেবল মাঝে মাঝে ক্যাঁচকোঁচ করছে রান্নাঘরের দরজার কজা, খুলে বেরোনোর পর পাল্লাটা লাগাতে ভুলে গিয়েছিল মুসা।

পরদিন সকালে অনেক বেলায়ও মুসার সাড়া না পেয়ে তাকে ডাকতে গেলেন মা। দেখেন, দরজা খোলা। ঘরে কেউ নেই। বাথরুমেও না। গেল কোথায় ছেলেটা? তাঁকে না বলে তো কোথাও যায় না!

বিছানার ওপর বড় একটা সাদা খাম পড়ে থাকতে দেখলেন তিনি।

ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। তুলে নিলেন। মুখ খোলা। ভেতরে একটুকরো কাগজ। একটা চিঠি।

গম্ভীর মুখে ডাইনিং রুমে নেমে এলেন তিনি। টেবিলে চা খাচ্ছেন আর খবরের কাগজ পড়ছেন মিস্টার আমান। নীরবে তাঁর সামনে এনে চিঠিটা ফেললেন মুসার আম্মা।

ভুরু কুঁচকে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়লেন আমান। মুসা লিখেছে ঃ

মা,

কয়েক দিনের জন্যে চলে গেলাম। চিতার কান ভাল না হলে আর ফিরব না। তাঁবু আর দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে গেলাম। দুশ্চিন্তা কোরো না। রবিন আর কিশোর জিজ্ঞেস করলে বোলো, পিকনিকের জন্যে নতুন যে জায়গাটা বেছেছি আমরা, সেখানে গেছি, সোনালি ঝর্নায়।

—মুসা।

পড়ে গম্ভীর হয়ে আমান বললেন, 'অতটা না ধমকালেও পারতে। একটা কুত্তা নাহয় এনেছেই। অনেক ছেলেই পোষে ওরকম।'

'তাই বলে না জানিয়ে চলে যাবে?'

'যাবেই তো। মুসা অনেক ভাল ছেলে। নাহলে তুমি যেমন ধমকা-ধমকি করো, অনেক ছেলেই সহ্য করত না, অনেক আগেই কিছু করে বসত। সে তো কিছুই বলে না।'

'আমি তো ওর ভালর জন্যেই বকি। তাই বলে কি আমি ওকে ভালবাসি না?'

'বাসো, নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার আমাদের, ও এখন আর অত ছোট নেই। সেই মতই আচরণ করা উচিত তার সঙ্গে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে বিগড়ে যেতে পারে।'

দুই

দুপুর বেলা বাস থেকে নামল রবিন। মেইন রোড থেকে নেমে এল একটা আঁকাবাঁকা পথে। পথটার দুই ধারে ঝোপঝাড়, তার মধ্যে মাথা উঁচু করে আছে কিছু বড় বড় গাছ। পিঠে বাঁধা ব্যাকপ্যাক, আরেকটা ব্যাগ হাতে ঝোলানো। খানিকটা হেঁটে এসে তাকাল এদিক ওদিক। মুসাকে খুঁজল। এই ঝোপঝাড়ের মধ্যে ওকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে। কোথায় আছে কে জানে।

কপালের ঘাম মুছল সে। জিরাতে বসল একটা ঝোপের পাশে। মিনিটখানেক পরেই 'হুঁক' করে একটা বিচিত্র শব্দ হলো আরেকটা ঝোপের ভেতর।

মাথা সোজা করে সেদিকে তাকাল রবিন। সন্দেহ হলো। কিছু আছে ওর মধ্যে। উঠে পায়ে পায়ে এগোল সেদিকে। সামনে থেকে কিছু দেখা গেল না। ঘুরে চলে এল পেছনে। কাঁটাঝোপের ভেতর শুয়ে থাকতে দেখল মুসা আর একটা কুকুরকে।

'বাহ্, বেশ আরামেই আছ দেখছি।'

চোখ মেলল মুসা। লাফিয়ে উঠে বসল, 'এসেছ! তোমার জন্যেই বসে আছি। কোথায় আবার গিয়ে খুঁজবে। কখন যে চোখ লেগে এল···জানতাম তুমি আসবে।'

'সকালে গিয়েই পেয়ে গেলাম তোমার চিঠি। চলে এলাম।'

'কিশোর আসেনি?'

'নাহ্। গিয়েছিলাম। আটকে দিয়েছেন মেরিচাচী। একগাদা মাল এনে হাজির করেছেন রাশেদচাচা। আরও আনতে গেছেন। কিশোর কয়েক দিন আর বেরোতে

পারবে বলে মনে হয় না। বলে এসেছি, ফাঁক পেলেই চলে আসতে।'

'হুঁ। তিনজন নাহলে জমে না। ছুটির শুরুতেই এবার ঘাপলা হয়ে গেল। বাকিটা কি হবে কে জানে। তারপর, মা কিছু বলল?'

'সাবধানে থাকতে বলেছেন।'

'চিতার কথা কিছু বলল না?'

'না। এটাই তাহলে তোমার চিতা? কুকুরটা কিন্তু ভালই মনে হচ্ছে। রেখে দেয়ার ইচ্ছে নাকি?'

'দেখি। মাকে নিয়ে মুশকিল। রাখতে দেবে কিনা আল্লাই জানে।'

এদিক ওদিক তাকাল রবিন। আবার ফিরল মুসার দিকে, 'ক্যাম্প করেছ কোথায়?'

'ঝর্নাটার কাছে। যেটা সেদিন দেখে গিয়েছিলাম আমরা।'

'চলো, যাই।'

ঝোপ থেকে বেরোল মুসা। রবিনের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'কিশোর এলে আরও মজা হত। চিতার কান শুকাতে কয়েক দিন লাগবে। ততদিন চুটিয়ে পিকনিক করতে পারতাম। জায়গাটা সত্যি ভাল, তাই না? কয়েক মাইলের মধ্যে মানুষজন নেই। একলা শুধু আমরা।'

মুসার প্রায় পা ঘেঁষে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল চিতা। নাক তুলে বাতাস শুঁকতে লাগল।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'অ্যাই চিতা, তুই আমাকে চিনিস?'

কুকুরটা শুধু বলল, 'ঘোও।'

'কি করে চিনবে? আর কি কখনও দেখেছে? তবে দেখো, ভাব হতে দেরি হবে না। খুব ভাল মানুষ ও। বুদ্ধিও আছে।'

'কিন্তু ও ওরকম করছে কেন?'

কুকুরটার দিকে ভাল করে তাকাল মুসা। 'বোধহয় খরগোশের গন্ধ পেয়েছে।'

পা তুলে কাটা কানটা চুলকানোর চেষ্টা করল চিতা। হার্ডবোর্ডের জন্যে নাগাল পেল না।

'কলার লাগিয়েছ বটে একটা। হাহ্ হা! বুদ্ধিটা কার?'

'ডাক্তারের।'

'ওর অসুবিধে হয় না?'

'তা তো কিছুটা হয়ই। বেশি অসুবিধে খরগোশের গর্তে ঢোকার। অথচ আসার পর থেকে এই কাজটাই বেশি করতে চাইছে।'

'জিনার রাফিয়ানের মত।'

'আসলে সব কুকুরেরই এক স্বভাব।'

'হুঁ। আচ্ছা, রাস্তায় কুকুর এল কোত্থেকে? ছাড়া থাকার তো কথা নয়। কার কুকুর?'

'কি জানি।'

ছোট একটা পাহাড় ডিঙালো ওরা। মুসা বলল, 'পাহাড়ের ঢালে একটা

পুরানো কটেজ দেখেছি। অনেক আগের বাড়ি। লোকজন থাকে না। দেয়াল ধসে গেছে। রোজ-র‍্যাম্বলারের ঝাড়ে ছেয়ে আছে দেয়াল।'

'ভেতরে ঢুকেছ?'

'মাথা খারাপ! একলা ঢুকব!'

হাসল রবিন, 'ভূতের ভয়ে?'

'দেখো, সব সময় ঠাট্টা কোরো না। যা বাড়ির বাড়ি, ওটাতে ভূত থাকতেই পারে।'

লোকজন এদিকে বিশেষ আসে বলে মনে হয় না। জন্তু-জানোয়ার, বিশেষ করে খরগোশ আর শেয়াল চলাচলের ফলে খুব সরু একটা পথ তৈরি হয়েছে। সেটা ধরে এগোল ওরা।

হুঁশিয়ার করে দিল মুসা, 'দেখে চলো। যাওয়ার সময়ও একটা র‍্যাটলস্নেক দেখে গেছি। রাস্তার ওপরেই শুয়ে ছিল।'

ম্যাপ দেখে গোল্ডেন স্প্রিঙকে তাদের নতুন পিকনিক স্পট হিসেবে বাছাই করেছে তিন গোয়েন্দা। এক রোববারে এসে দেখেও গিয়েছে। বেশিদূর ঘুরতে পারেনি। অনেক জায়গাই অচেনা রয়ে গেছে।

'গোসলের জায়গা আছে নাকি কাছাকাছি? লেক-টেক?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ঘেমে গেছি। পানিতে নামতে পারলে ভাল হত।'

'জানি না। দেখার সময় পাইনি। ওই যে দেখো, বাড়িটার খানিকটা দেখা যাচ্ছে।'

তাঁবুটাও শীঘ্রি চোখে পড়ল রবিনের। ঝর্নার ধার ঘেঁষে পেতেছে। পানি পাওয়ার সুবিধের জন্যে।

কাছে এসে তাঁবুর ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল সে। নরম ডালপাতা পুরু করে বিছিয়ে বিছানা করেছে মুসা। এক কোণে একটা মগ, এক ব্যাগ কুকুরের বিস্কুট, কয়েকটা খাবারের টিন, আর আধখাওয়া একটা পাঁউরুটি রাখা।

তাড়াহুড়োর জন্যে তেমন কিছু আনতে পারেনি মুসা, বুঝল রবিন। সে নিজে যে অনেক কিছু নিয়ে এসেছে সেটা ভেবে খুশি হলো। প্রচুর স্যাণ্ডউইচ তৈরি করে দিয়েছেন তার মা। কয়েক দিন চলবে। এখনই কয়েকটা খেয়ে ফেললে মন্দ হয় না। খিদে পেয়েছে।

তাঁবুর ছায়ায় বসে খাবারের প্যাকেট খুলল রবিন। স্যাণ্ডউইচ আর টমেটো বের করল। দেখে দারুণ খুশি মুসা।

আয়েশ করে চিবাতে লাগল দুজনে। স্যাণ্ডউইচে এক কামড় দেয়, তারপর আরেক কামড় দেয় টমেটোতে। চিতা খাচ্ছে তার জন্যে আনা বিস্কুট। একটা স্যাণ্ডউইচও দেয়া হয়েছে তাকে।

কয়েক কামড়েই সেগুলো গিলে নিয়ে উঠে পড়ল সে।

'কোথায় যায়?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে হয় পানি খেতে। চলো, আমরাও খেয়ে আসি।'

মগ নিয়ে রওনা হলো ওরাও। ঝোপঝাড়ের অভাব নেই। কোথাও ঘন,

কোথাও পাতলা। তার ভেতর দিয়েই এগোল। ঝর্নাটা খুব সুন্দর। পাড়ে তৈরি করা হয়েছে কটেজ। বাড়ির কাছ থেকে খানিক দূরে এক জায়গায় বেঁকে গেছে ঝর্না। ওখানে প্রচুর পাথর পড়ে আছে পানিতে। ওগুলোতে বাড়ি খেয়ে যাচ্ছে স্রোত। পাথরের জন্যে পাড়ের মাটির ক্ষতি করতে পারছে না পানি, ক্ষয় করতে পারছে না। বাঁকের কাছে পানির সামান্য ওপরে পড়ে আছে বড় একটা সাদা পাথরের ফলক।

টলটলে পরিষ্কার পানি, দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে। পানিতে হাত চুবিয়ে বলে উঠল রবিন, 'আহ্, একেবারে বরফ! যা তেষ্টা পেয়েছে, মনে হচ্ছে সব খেয়ে ফেলতে পারব।'

পানি খেয়ে এসে তাঁবুর পাশে শুয়ে পড়ল ওরা। কথা বলতে লাগল।

'যা-ই বলো,' রবিন বলল, 'জায়গাটা ভারি চমৎকার। মানুষ নেই, জন নেই, হইচই নেই। শুধু পাখি আর খরগোশ। খুব ভাল লাগছে।'

'ঠিক। বিরক্ত করার কেউ নেই,' হাই তুলল মুসা।

এই সময় শোনা গেল শব্দটা। দূরে। ঠন করে পাথরে বাড়ি লাগল ধাতব কোন জিনিস। পর পর কয়েকবার শোনা গেল একই শব্দ, তারপর থেমে গেল।

উঠে বসেছে মুসা। 'কিসের শব্দ কিছু বুঝলে?'

'না। অনেক দূরে। এত চুপচাপ এখানে, বহু দূরের শব্দও শোনা যায়।'

কয়েক মিনিট পর আবার শুরু হলো শব্দ। আগের বারের মতই কয়েকবার হয়ে থেমে গেল। ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে দুজনে। বাতাসে কেবল এখন ঘাসের গুটি ফাটার পুট-পুট-পুট আওয়াজ। ফাটছে, আর ছড়িয়ে দিচ্ছে কালো বীজগুলো।

ফিরে এসে মুসার পায়ের ওপর বসে পড়ল চিতা।

চমকে জেগে গেল মুসা। 'এই, এই শয়তান, সর! বসার আর জায়গা পেল না! কানা নাকি?...খাইছে, এ-ব্যাটা ওই হাড্ডি নিয়ে এল কোত্থেকে!'

চেঁচামেচিতে রবিনও জেগে গেল। তবে পুরোপুরি জাগল না, চোখ আধবোজা করে বলল, 'আমি হাড়টাড় আনিনি।'

'তোমার কথা বলিনি। ও পেল কোথায়?'

পুরোই জেগে গেল রবিন। 'খরগোশ মেরেছে হয়তো।'

'না, খরগোশের হাড় নয়। থেকেছে রাস্তায় রাস্তায়, ফকিরা স্বভাব কি আর সহজে যায়। যা পায় তুলে নিয়ে আসে। জলদি বল, কোথায় পেয়েছিস?'

চিতাটা মনে করল, মুসাও ভাগ চাইছে। হাড়টা মুখে নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'হউ!'

'দূর ব্যাটা, সর এখান থেকে! আমি আর কাজ পেলাম না, তোর পচা হাড্ডি খেতে যাই।'

উঠে বসে হাই তুলতে তুলতে রবিন বলল, 'হয়তো কাছেই অন্য কেউ ক্যাম্প করেছে। কেড়ে আনেনি তো? অন্য কোন কুত্তার কাছ থেকে?'

'আনতেও পারে। এই ফেল, ফেলে দিয়ে আয়! জলদি যা! রাস্তা থেকে আর কখনও কিছু তুলে আনবি তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।'

আবার শুরু হলো সেই ধাতব শব্দ।

এবার আর গুরুত্ব না দিয়ে পারল না গোয়েন্দারা।

মুসা বলল, 'তোমার কথাই ঠিক। আরও কেউ ক্যাম্প করেছে। চলো, দেখে আসি।'

তিন

রোদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল দুজনে। পায়ের কাছে রয়েছে চিতা।

কটেজটাকে পাশ কাটানোর সময় রবিন বলল, 'চলো, ভেতরটা দেখে যাই। নিশ্চয় অনেক পুরানো।'

'যাব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো। দিনের বেলা ভূতের ভয় নেই।'

চওড়া দরজায় এসে দাঁড়াল ওরা। পাথরে তৈরি ধনুকের মত খিলান। পাল্লার চিহ্নও নেই। বহুদিন আগেই গায়েব। ভেতরে অনেক বড় একটা ঘর। পাথরের মেঝে। এক সময় সমান ছিল, এখন উঁচুনিচু হয়ে আছে। ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজিয়েছে।

জায়গায় জায়গায় ধসে পড়েছে দেয়াল। আলো আসছে সেপথে। একটা জানালা মোটামুটি ঠিকই আছে, বাকিগুলোর জায়গায় কেবল ফোকর। কিচ্ছু নেই। এক কোণ থেকে পাথরের সরু সিঁড়ি উঠে গেছে।

'ওপর তলায়ও ঘর আছে,' রবিন বলল। 'ওই যে, আরেকটা দরজা।'

সেটা দিয়ে ছোট আরেকটা ঘরে যাওয়া যায়। সেখানে পুরানো একটা সিংক আছে। আর কিছু ভাঙাচোরা জিনিস, একটা হ্যাণ্ড-পাম্পের অবশিষ্ট।

'দেখার তেমন কিছু নেই। ওপর তলার অবস্থাও ভাল হবে না। এই যে, আরেকটা দরজা,' বলতে বলতে গিয়ে বন্ধ পাল্লায় ঠেলা দিল মুসা।

এক ঠেলাতেই মরচে পড়া ভাঙা কজা থেকে পাল্লাটা ছুটে গিয়ে থপাস করে পড়ল বাইরের ঘাসের ওপর। অযত্নে, অবহেলায় জংলা হয়ে আছে ওখানে।

'খাইছে। এতটা পচে গেছে কল্পনাই করিনি।'

পেছনের উঠানে উঁকি দিয়ে দেখতে দেখতে রবিন বলল, 'ছাউনি ছিল এখানে। খোঁয়াড় ছিল। হাঁস-মুরগী পালত। ওই দেখো, একটা শুকনো ডোবা।'

অনেক কিছুই ছিল এখানে, সব ধ্বংস হয়ে গেছে। ছোট একটা আস্তাবলও আছে, ঘোড়া আর নেই তাতে। পড়ে আছে মরচে পড়া লোহার নাল। দেয়ালে গাঁথা কীলকে এখনও ঝোলানো রয়েছে একটা লাগাম।

'পুরানো বাড়িতে ঢুকলেই আমার কেমন গা ছমছম করে, বুঝলে,' মুসা বলল। 'মনে হতে থাকে, এই বুঝি সাংঘাতিক কিছু ঘটল। কিন্তু অবাক লাগছে, এখানে সে রকম কোন অনুভূতি হচ্ছে না। মানুষগুলো এখানে সুখেই ছিল মনে হয়। মনে হচ্ছে, এখনই মুরগী কক-কক করবে, হাঁস ডাকবে...'

কাঁক-কোয়াক! কাঁক-কোয়াক!

কক-কক! কক-কক! কক-কক!

বলতে না বলতেই ডেকে উঠল হাঁস-মুরগী। ভীষণ চমকে গেল দুজনে। ঝট করে তাকাল পরস্পরের মুখের দিকে।

'আল্লারে, এ-কি!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'হাঁস-মুরগীর ডাকই শুনলাম তো! কোথায় ওগুলো?'

রবিনও তাজ্জব হয়ে গেছে। বিড়বিড় করল, 'এখন ঘোড়া ডেকে না উঠলেই বাঁচি।'

বলেও সারল না সে, ঘোড়ার নাক ডাকার আওয়াজ হলো।

'আল্লারে, গেছিরে, ভূত!' বলেই দৌড় দিতে গেল মুসা।

হাত ধরে ফেলল রবিন। 'দাঁড়াও। দেখি।'

মুসার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে চোখ উল্টে পড়ে যাবে।

আবার মুরগীর কক-কক শোনা গেল।

'বিশ্বাস করতে পারছি না!' আনমনে বলল রবিন। 'শোনার ভুল একসঙ্গে দুজনের হতে পারে না। তারমানে সত্যি ডাকছে। চলো তো, আস্তাবলের ওদিকে দেখি?'

'চিতাটা গেল কোথায়? এই চিতা, চিতা?' গলা চড়িয়ে ডাকতে সাহস পেল না মুসা।

চিতার সাড়া নেই। জবাবে শোনা গেল শিস। অনেক সময় কুকুরকে ডাকে যেভাবে মানুষ।

জোরে ডাক দিল রবিন, 'চিতা! কোথায় তুই?'

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কুকুরটা। কেমন যেন বোকা বোকা ভঙ্গি। লেজ নাড়ছে।

আরও অবাক হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। নীল রঙের একটা ফিতে বাঁধা লেজে।

'অ্যাই, তুই ফিতা কোথায় পেলি!' মুসার চোখ যেন আর কোটরের মধ্যে থাকতে চাইছে না। 'বাঁধল কে? রবিন, আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না…'

জবাব দিল না রবিন। কুকুরটার লেজ থেকে ফিতেটা খুলে নিল। তারপর বলল, 'আর যাই হোক, ভূত নয়। ভূতে ফিতে বাঁধে না।'

'বলাও যায় না। কত রকমের ভূত আছে।'

কুকুরটাকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কোত্থেকে আনলি এটা?'

ফ্যালফ্যাল করে কেবল তাকিয়ে রইল চিতা। কিছু বোঝাতে পারল না।

মুসাকে নিয়ে বাড়িটায় খুঁজতে শুরু করল রবিন, কিছুই পেল না। মানুষের ছায়াও দেখল না। হাঁস নেই, মুরগী নেই, ঘোড়া নেই।

ভুরু নাচিয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এবার? এবার কি বলবে?'

'আগের কথাই। ভূতুড়ে মনে হলেও ভূতের কাণ্ড নয়। পাশ দিয়ে হয়তো কেউ যাচ্ছিল, আমাদের কথা শুনে মজা করার লোভ সামলাতে পারেনি।'

'তাহলে সেই কেউটা এখন কোথায়?'

বাড়ির বাইরেও খোঁজাখুঁজি করল ওরা। কাউকে দেখতে পেল না। ধাতব শব্দ কে করেছে জানতে যাওয়ার আর ইচ্ছে হলো না। ক্যাম্পে ফিরে এল।

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। শুয়ে আছে চিতা। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসল। দৌড়ে গেল একটা ঘন ঝোপের কাছে। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল।

'আবার কি দেখল?' মুসার প্রশ্ন। 'পাগল হয়ে গেল নাকি কুত্তাটা! কি রকম করছে? এই ব্যাটা, আয়, আয় বলছি!'

হার্ডবোর্ডের কলারের জন্যে ঢুকতে পারল না চিতা। পিছিয়ে এল। ঠেলাঠেলিতে বেঁকাতেড়া হয়ে গেছে কলারটা।

কেঁউ! কেঁউ! করে দুইঘার চিকন হাঁক দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা ছোট জাতের কুকুর। এত বেশি মোটা, প্রায় গোল হয়ে গেছে। একটা চোখ কানা। ভাল চোখটা অস্বাভাবিক বড়, চকচকে। শরীরের অর্ধেক সাদা, অর্ধেক কালো, অনেক লম্বা লেজ, কিন্তু তাতে লোমের পরিমাণ খুব কম। গদগদ ভঙ্গিতে ঘন ঘন নাড়ছে সেটা।

'খাইছে! এটা এল কোত্থেকে? চিতার সঙ্গে ভাবই বা হলো কখন? দেখো রবিন, যা-ই বলো, এ ভূতের কারবার ছাড়া আর কিছু না!'

রবিন চুপ করে দেখছে কুকুরদুটোকে। তখন যে হাড়টা এনেছিল চিতা, সেটা গর্ত করে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল। অদ্ভুত এই কাণ্ডটা প্রায় সব কুকুরই করে, জানে সে। হাড় পেলে গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে রাখে। কেন করে এই কাজ, বড় বড় কুকুর-গবেষকও এর জবাব দিতে পারেননি। হাড়টা এখন বের করে অন্য কুকুরটাকে সাধতে লাগল চিতা। মেহমানকে খাতির করছে।

কিন্তু মেহমান ওই গন্ধওলা হাড়ের প্রতি কোন আগ্রহই দেখাল না।

'নাহ্, মাথাটাই খারাপ করে দেবে এই ফকিরা কুত্তাটা!' কপালে হাত দিয়ে বলল মুসা। 'কি যে করছে! এরপর দেখা যাবে একটা বেড়াল সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির...'

বলতে না বলতেই ঝোপ থেকে বেড়াল ডেকে উঠল মিঅ্যাঁউ করে।

কান খাড়া করে ফেলল দুটো কুকুরই। ঝোপের কাছে ছুটে গেল। বিকট ঘেউ ঘেউ করে ভেতরে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল চিতা, কলারটার জন্যে এবারেও পারল না।

ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। চিতাকে বলল, 'সর, সর দেখি। মুসা, এগুলোকে আটকাও। আমি বেড়ালটাকে বের করি। এল কোত্থেকে এসব জানোয়ার!'

চিতাকে এক থাপ্পড় দিয়ে সরিয়ে দিল মুসা। অন্য কুকুরটার কলার টেনে ধরে রাখল। উত্তেজিত হয়ে একমাত্র চোখের দৃষ্টি মেলে ঝোপের দিকে তাকিয়ে আছে ওটা, জোরে জোরে নাড়ছে লেজ।

বসে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিল রবিন। বাইরের রোদের আলোর তুলনায় ভেতরটা বেশি অন্ধকার। প্রথমে কিছু দেখল না। চোখে আলো সয়ে আসতেই একটা ধাক্কা খেলো যেন।

গোলগাল একটা হাসিখুশি মুখ তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। জ্বলজ্বলে চোখ। লম্বা চুলে কপাল ঢাকা। হাসিটা বাড়ল, বেরিয়ে পড়ল সুন্দর সাদা দাঁত।

'মিআঁউ!' আবার বেড়ালের ডাক ডাকল সে।

'দেখেছ?' বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ। বেড়াল নয়।'

রবিনের উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে ঘুরে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল মুসা। 'তবে কি ভূ...'

'মানুষ। এই ছেলে, বেরিয়ে এসো। তোমার চাঁদবদনখানা দেখি।'

খড়মড় শব্দ করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ছেলেটা। বয়েস বারো-তেরো হবে। 'রেগে গেছ, না?'

ছুটে গিয়ে তার গাল চেটে দিল চিতা।

অবাক হয়ে গেছে মুসা। এত খাতির! ছেলেটার কুকুরই না তো? বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পড়েছিল পাজি ছেলেগুলোর পাল্লায়? খবর পেয়ে নিতে এসেছে এখন সে? জিজ্ঞেস করল, 'আমার কুত্তাটার সঙ্গে খাতির হলো কি করে তোমার?'

'আমার ক্যাম্পে বসেছিলাম,' জানাল ছেলেটা, 'এমন সময় কুকুরটা গিয়ে হাজির। একটা হাড় সাধলাম, নিয়ে নিল। কেন গেছে, বুঝলাম।' কানা কুকুরটাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার কার্বের সঙ্গে ভাব করার জন্যে।'

হাঁপ ছাড়ল মুসা। চিতার মালিক ছেলেটা নয়। বলল, 'কার্ব! এটা কেমন নাম হলো?'

'কার্ব হলো কার্বোহাইড্রেটের সংক্ষেপ। আগে নাম ছিল পাম। খেয়ে খেয়ে শরীরে কার্বোহাইড্রেট জমে মোটা হয়ে যাওয়ায় পরের নামটা রেখেছি।'

হেসে ফেলল মুসা, 'পামটাও খারাপ ছিল না। পামকিনের সংক্ষেপ। কুমড়োই তো বেশি মানানসই।'

ছেলেটাও হাসল। 'তা মন্দ বলোনি। কিন্তু তোমার কুত্তাটার গলায় হার্ডবোর্ড পরিয়েছ কেন?'

'কানে জখম। যাতে চুলকাতে না পারে। তুমিই ওর লেজে ফিতা বেঁধেছিলে?'

'হ্যাঁ। একটু মজা করলাম তোমাদের সঙ্গে।'

'হাঁসের ডাক আর মুরগীর ডাকও তুমিই ডেকেছিলে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ। তো, এখানে কেন এসেছ? ঘুরতে, নাকি গাছপালা নিয়ে গবেষণা? ইস্কুলের টাস্ক?'

'ঘুরতে এসেছি। কয়েক দিন ছুটি কাটাতে। তুমি?'

'মাটি খুঁড়তে।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। পাগল নাকি ছেলেটা!

রবিনও অবাক হয়েছে। 'মাটি খুঁড়তে?'

'বুঝলে না?' আবার হাসল ছেলেটা। 'আমার আব্বা প্রত্নতাত্ত্বিক। মাটি খুঁড়ে প্রাচীন জিনিস বের করাটা তার নেশা। কাজটা আমারও ভাল লাগে। অনেক আগে এখানে ইনডিয়ানরা বাস করত। ধারণা করা হয়, ওদের অনেক প্রাচীন একটা শহর ছিল এখানে। ছুটি পেয়ে আমি খুঁড়তে এসেছি। ওদের ব্যবহার করা জিনিস খুঁজছি। হাঁড়ি-কুঁড়ি, বাসন-পেয়ালা, অস্ত্র, এসব।' পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে

দেখাল সে, 'এই দেখো, কি পেয়েছি।'

মুদ্রাটা হাতে নিয়ে দেখল রবিন। ভুরু কুঁচকে গেছে। 'ইনডিয়ানদের! অত আগে মুদ্রা ব্যবহার করত বলে তো শুনিনি!'

'না, স্প্যানিশদের। কয়েক শো বছর আগে এখানে ক্যাম্প করে থেকেছে ওরা। কলোনি করার ইচ্ছে ছিল হয়তো, পরে কোন কারণে করেনি।'

মুদ্রাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল রবিন, 'শুনতে ভালই লাগছে।'

'তার মানে ইতিহাসে ইন্টারেস্ট আছে তোমার।'

'আছে। একদিন দেখতে যাব তোমার মাটি খোঁড়া...'

'না না,' জোরে মাথা নাড়ল ছেলেটা, 'যেয়ো না, প্লীজ! জরুরী কাজ করছি। কাজের সময় লোকজন ভাল লাগে না। আর আমি তোমাদের বিরক্ত করতে আসব না, কথা দিচ্ছি। তোমরাও আমাকে কোরো না।'

'বেশ। করব না।'

'কিছু মনে করলে না তো আবার?'

'না। বুঝতে পারছি তোমার অসুবিধে। মন দিয়ে আমি যখন কোন কাজ করি, কিংবা বই পড়ি, তখন কেউ কাছে গেলে আমারও বিরক্ত লাগে।'

হাসল ছেলেটা। 'আমিও তোমাদের বিরক্ত করতে আসতাম না। কুকুরটা গেল তো, ভাবলাম কার কুকুর, দেখে যাই। বলে যাই, আমার ক্যাম্পের কাছে যেন না যায়।'

'নিজের কাছে যেতে তো খুব বাধা দিচ্ছ,' ফস করে বলে বসল মুসা, 'কিন্তু আমাদের যে ভয় দেখালে?'

'সরি। আমি সত্যিই দুঃখিত। বললাম তো, আর আসব না। তোমরা তোমাদের মত থাকো, আমি আমার মত থাকব।'

শিস দিয়ে কার্বকে কাছে ডাকল ছেলেটা। কুকুরটাকে নিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে গেল।

মুসার দিকে ঘুরল রবিন, 'আজব ছেলে, তাই না?'

'মাথায় ছিট আছে।'

'তবে ভাল ছেলে। আমার কিন্তু খারাপ লাগেনি।'

'আমার লেগেছে, ওর কথাবার্তা। বড় বড় বোলচাল।'

চার

নাস্তার সময় হয়েছে, ঘড়ি তো জানান দিচ্ছেই, পেটও বলছে। এমন কি চিতার পেটও। গরম অসহ্য লাগছে তার। একটু পর পরই গিয়ে ঝর্না থেকে পানি খেয়ে আসছে। পিপাসা অন্য দুজনেরও লাগছে। ভাবছে, একটা জগ হলে ভাল হত। ছোট মগে হচ্ছে না। বার বার যেতে হচ্ছে ঝর্নায়।

বিস্কুট, স্যাণ্ডউইচ আর চকলেট দিয়ে নাস্তা সারল ওরা।

কুকুরটার কান পরীক্ষা করে রায় দিল মুসা, অনেক ভাল হয়ে গেছে।

'কিন্তু কলারটা খোলা বোধহয় উচিত হবে না,' রবিন বলল। 'আঁচড়ে আবার ঘা বাড়াবে।'

'অত সহজে আমি খুলছিও না। আচ্ছা, কি করা যায় এখন, বলো তো? বসে থেকে কি করব, চলো একটু হেঁটে আসি।'

'চলো···শোনো, ধাতব শব্দ। মাটি খুঁড়ছে ছেলেটা। কি করে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'আমারও করছে। কিন্তু যাব না, কথা দিয়েছি আমরা। কথা রাখা উচিত।'

'তা ঠিক।' যেদিক থেকে শব্দ আসছে তার উল্টো দিক দেখিয়ে রবিন বলল, 'চলো, ওদিকে যাই। পথ হারাব না তো?'

'পথ হারাব কেন? আর কুকুরটা তো আছেই। সে-ই পথ দেখাবে। চিতা, চাঁদের আলোয় বাড়ি ফিরতে পারবি তো?'

'ঘাউ' করে জবাব দিল কুকুরটা।

'পারবে, বলল।'

'কি করে বুঝলে? ও তো ওর নাম শুনলেই ঘাউ করে। যাকগে, বেশি দূরে না গেলেই হবে, পথ হারানোর ভয় থাকবে না। ইস্, কিশোর থাকলে এখন আরও মজা হত। আচ্ছা, ও এখন কি করছে, বলো তো?'

'কি আর। মুটেগিরি। মাল সরাচ্ছে ইয়ার্ডে। আসবে কখন?'

'বলল তো সুযোগ পেলেই চলে আসবে।'

'পালায় না কেন?'

'বেশি চাপ পড়লে ঠিকই পালাবে।'

সুন্দর বিকেল। হাঁটতে ভাল লাগছে। খরগোশেরা জটলা করছে। সেগুলোকে তাড়া করতে চাইছে চিতা, আটকে রেখেছে মুসা। ফলে খুব মন খারাপ কুকুরটার। ভাবছে যেন, *চুপচাপ বসে খরগোশের কাণ্ড দেখার কি মানে হয়? ওগুলোকে বানানোই হয়েছে তাড়া করার জন্যে।* কলার ছোটানোর জন্যে টানাটানি করে দেখেছে সে, গুঙিয়ে গুঙিয়ে প্রতিবাদও করেছে। কোন ফল হয়নি। রেগে গিয়ে শেষে একটা ডাল ভেঙে নিয়েছে মুসা, বেশি বেয়াড়াপনা করলে পেটানোর জন্যে।

এক জায়গায় বসে কিছুক্ষণ খরগোশের খেলা দেখল ওরা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আর বেশি দূরে না গিয়ে ক্যাম্পে ফিরে চলল। তাঁবুর কাছাকাছি আসতেই নরম শিস কানে এল। আবার কে?

বড় একটা ঝোপ ঘুরে অন্য পাশে আসতে দেখা হয়ে গেল ছেলেটার সঙ্গে। অল্পের জন্যে ধাক্কা লাগেনি। চুপচাপ ওদের কাছ থেকে সরে যেতে চাইল সে।

অবাক হয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আবার এসেছ? বললে না আর আসবে না?'

ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছেলেটা। কপালে এসে পড়া লম্বা চুল সরাল। বলল, 'না, এমন কথা বলিনি।'

'নিশ্চয় বলেছ!' রবিন বলল, 'তুমি তোমার কথা রাখোনি, আমরাও রাখব না। তোমার ক্যাম্পের কাছে যাব এবার।'

'আমি কোন কথা দিইনি,' ছেলেটাও যেন অবাক হয়েছে ওদের কথা শুনে।

'বাহ্‌, চমৎকার,' মুখ বাঁকিয়ে বলল মুসা। 'হাঁস, মুরগী আর ঘোড়ার ডাক ডেকেছ যে সেটাও নিশ্চয় মনে নেই?'

'এবং বেড়ালের ডাক?' যোগ করল রবিন।

'উন্মাদ!' বিড়বিড় করে ছেলেটা বলল, 'বদ্ধ উন্মাদ!'

'তারমানে তুমি আসতেই থাকবে এখানে,' মুসা বলল, 'সে জন্যেই এসব ভণিতা।'

'আসব তো বটেই। এই ঝর্নাটার পানি খুব ভাল। আমি যেটার কাছে ক্যাম্প করেছি সেটার অত ভাল না।'

'একথা আগে বললেই হত। ঠিক আছে, তুমি যখন আসা বন্ধ করবে না, আমরাও যাব তোমার ওদিকে।'

'এলে আসবে, কে মানা করেছে? তবে শুধু তোমরা, দয়া করে কুত্তাটাকে এনো না। দেখে ভাল মনে হচ্ছে না। আমারটাকে খেয়ে ফেলবে।'

'কি পাগলের মত কথা বলছ!' রবিন বলল, 'খাবে না যে ভাল করেই জানো। খুব খাতির হয়ে গেছে, দেখোনি?'

'না, দেখিনি।' আর কিছু না বলে, আরেকবার কপালের ওপর এসে পড়া চুল সরিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ছেলেটা।

সেদিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'কি মনে হয়? তখনকার সঙ্গে এখনকার কোন মিলই নেই। রবিন, এত তাড়াতাড়ি সব কথা ভুলে গেল সে?'

'কি জানি, কিছু বুঝতে পারছি না,' রবিনের বিস্ময় কাটেনি। 'তখন দেখলাম এত হাসিখুশি, এত ভদ্র, হাসি ছাড়া কথা বলে না, আর এখন হয়ে গেল পুরোপুরি তার উল্টো। গোমড়ামুখো। এক বিন্দু হাসি নেই।'

'আমার বিশ্বাস, মাথায় দোষ আছে ওর,' আবার পা বাড়াল মুসা।

তাঁবুর কাছে এসে বসল ওরা। হাই তুলে মুসা বলল, 'রবিন, তোমার ঘুম পায় না? আমার পাচ্ছে।'

'পাবেই। কাল সারারাত ঘুমাওনি তো।'

'আমি তাহলে শুয়ে পড়লাম।'

'পড়ো। আমার সহজে আসবে না। না আসুক। তাঁবুর বাইরে শোবো। শুয়ে শুয়ে তারা দেখব। ইচ্ছে হলে চিতাকে তোমার কাছে রাখতে পারো।'

'আমিও বাইরেই থাকব,' মুসা বলল। 'বৃষ্টিটিষ্টি যখন নেই, অযথা বদ্ধ গুমোটে ঘামতে যাব কেন? এসো, ডালপাতাগুলো বের করে বাইরেই বিছানা করে ফেলি।'

বাইরে বিছানা করা হলো। রবিনরা শোয়ার আগেই তাতে উঠে শুয়ে পড়ল চিতা। ধমক লাগাল মুসা, 'এই ব্যাটা, তোকে কে শুতে বলল? কম্বলটা নষ্ট করবি তো। তুই নিচে থাক। কুকুররা ঘাসে শুয়েও আরাম পায়।'

বিছানা পেতে, ঝর্নায় গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পানি খেয়ে এল ওরা।

হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে মুসা বলল, 'আহ্‌, কি আরাম!'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'রাতে ঠাণ্ডা লাগে?'

'শেষ রাতের দিকে লাগে।'

'অসুবিধে নেই। আমিও একটা কম্বল এনেছি। গায়ে দিতে পারব।'

'আজ লাগবে বলে মনে হয় না। কাল একটু মেঘ-মেঘ ছিল···রবিন, দেখো, একটা তারা।'

দেখতে দেখতে ছয়-সাতটা গুণে ফেলল দুজনে। তার পর এত দ্রুত তারা ফুটতে শুরু করল, খেই হারিয়ে ফেলল। শত-সহস্র তারায় ভরে গেল আকাশ। দেখা দিল ছায়াপথ।

'তারাগুলো কি বড় বড় দেখো! কি উজ্জ্বল!' রবিন বলল। 'শহরে এমনটা লাগে না। এসব জায়গায় এলে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হয়। কি বিশাল মহাকাশ! কত কোটি কোটি মাইল দূরে···মুসা, ঘুমিয়েছ?'

জবাব নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে।

কুকুরটা শুয়ে আছে তার পাশে, ঘাসের ওপর।

রাত বাড়ছে। চাঁদ নেই, কিন্তু তারার জন্যে জমাট বাঁধতে পারছে না অন্ধকার। লোকালয় থেকে বহুদূরে রয়েছে ওরা। কোন শব্দ নেই। এমন কি পেঁচাও ডাকছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জড়িয়ে এল চোখ···

হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল তার। কেন ভাঙল বলতে পারবে না। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। তারাজ্বলা আকাশের দিকে চোখ। মনে হলো এখনও ঘুমিয়ে আছে, স্বপ্ন দেখছে।

পিপাসা পেয়েছে খুব। উঠে তাঁবুতে ঢুকল মগটার জন্যে। খুঁজে পেল না অন্ধকারে। বেশি খোঁজাখুঁজি করল না, বেরিয়ে এল। মগ ছাড়াও খেতে পারবে।

চিতাও জেগে গেছে। রবিনের সঙ্গে যাবে কি যাবে না দ্বিধা করে শেষে মুসার কাছেই রয়ে গেল।

অন্ধকারেও ঝর্নাটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না তার। পানি বয়ে যাওয়ার কুলকুল শব্দই জানিয়ে দিল কোথায় রয়েছে ওটা। একটা পাথরের ওপরে এসে বসল। পানি তুলে নিল আঁজলা ভরে। এত গরমেও এত ঠাণ্ডা থাকে কি করে পানি ভেবে অবাক হলো। মাটির গভীরে যেখান থেকে বেরিয়ে আসে সেখানটা নিশ্চয় বরফের মত ঠাণ্ডা।

পানি খেয়ে নেমে এল পাথর থেকে। তারার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। ঠিক পথেই যাচ্ছি তো?—ভাবল।

আবার এগোল কিছুটা। আবার দাঁড়াল। না, তাঁবুর দিকে নয়। পথ ভুল করে আরেক দিকে চলেছে।

সামনে চোখ পড়তেই স্তব্ধ হয়ে গেল সে। আলো! আলোর ঝিলিক। ওই তো, আবার দেখা গেল। কিসের আলো?

কোন দিকে এসেছে বুঝতে পারছে। তারার আলোতেও ভাঙা কটেজটার আবছা অবয়ব দেখে চিনতে অসুবিধে হলো না। আলো দেখা গেছে ওটার ভেতর থেকেই।

আর এগোতে সাহস করল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে। ফিসফিস কথা শুনল বলে মনে হলো। ভেতরে হাঁটাচলার শব্দও হচ্ছে।

নাকি সব তার কল্পনা? হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে…না, ওই যে, আবার আলো জ্বলল! ভুল নয়।

নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেল তার। ওই পোড়ো বাড়িতে এত রাতে কে ঢুকল? মুসার মত ভূতের ভয় না পেলেও এগিয়ে গিয়ে দেখার সাহস হলো না। নিঃশব্দে যত তাড়াতাড়ি পারল ফিরে এল তাঁবুতে।

ঘুমিয়ে আছে মুসা। আগের মতই।

কেবল চিতা তাকে দেখে মৃদু স্বরে গোঁ-গোঁ করে জানান দিল সে জেগেই আছে।

বিছানায় উঠে মুসার গায়ে আলতো ঠেলা দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, 'মুসা, এই মুসা, জলদি ওঠো! মুসা…'

পাঁচ

উঠল না মুসা। ঘুমের মধ্যেই গোঙাল, আরেক পাশে কাত হয়ে শুতে গিয়ে বিছানা থেকেই গড়িয়ে পড়ে গেল অর্ধেকটা শরীর। তা-ও জাগল না।

'মুসা, মুসা, ওঠো না!' ধাক্কা দিল রবিন, আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল, কিন্তু লাভ হলো না। জোরে ডাকতেও ভয় পাচ্ছে। কটেজ থেকে শুনে ফেলতে পারে।

অনেক গুঁতোগুঁতির পর অবশেষে ভাঙল মুসার কুম্ভকর্ণের ঘুম, জড়িত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

নীরব রাতে অনেক জোরাল শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

'চুপ! আস্তে!'

'কেন?' অবাক হলো মুসা। 'কে কি করবে? যত খুশি…'

'মুসা, প্লীজ, আস্তে! কটেজে কেউ আছে!'

পুরো সজাগ হয়ে গেল মুসা। 'ভূত!'

যা দেখে এসেছে জানাল রবিন।

'দেখতে যেতে বলছ?' কুকুরটার দিকে তাকাল মুসা, 'চিতা, ভূত দেখতে যাচ্ছি আমরা। খবরদার, একদম চুপ থাকবি। টুঁ শব্দ করবি না।'

শুরুতে ভয় পেলেও এখন ভয় কেটে গেছে মুসার। ও এই রকমই। কাজের সময় দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। চিতা চলেছে তার পায়ে পায়ে। রবিন পেছনে।

খুব সাবধানে কটেজটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। তারার আলোয় আবছা চোখে পড়ছে বাড়িটার অবয়ব। এখন আর আলো কিছু নেই। কোন শব্দও না।

পুরো পাঁচটা মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। তারপর অস্থির হয়ে উঠল কুকুরটা। বিরক্ত লাগছে তার! তাকে আটকে রেখেছে কেন মুসা? ছেড়ে দিলেই তো হয়, ঘরে ঢুকে দেখে আসতে পারে।

'কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'তুমি যখন দেখেছ তখন হয়তো ছিল, এখন চলে গেছে। চোখের ভুল যদি না হয়ে থাকে।'

'না, ভুল নয়। ঢুকে দেখব নাকি? আগে চিতাকে পাঠিয়ে দিই, কাউকে দেখলে

ঘেউ ঘেউ শুরু করবে।'

কুকুরটার মাথায় আস্তে চাপড় দিয়ে মুসা বলল, 'যা, দেখ, কেউ আছে নাকি?'

একছুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল চিতা।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল দুই গোয়েন্দা। নিজেদের বুকের ধুকপুক ধুকপুকও যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, কেবল মাঝে মাঝে কানে আসছে পাথরের মেঝেতে চিতার নখ ঘষা লাগার আওয়াজ।

'নাহ্, কেউ নেই,' আবার বলল মুসা, 'তাহলে গন্ধ পেয়ে যেত কুকুরটা। তুমি ভুলই দেখেছ মনে হয়। ঘুম ভেঙে হঠাৎ করে গেছ তো...'

'না, আমি ভুল দেখিনি,' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'লোক ছিলই ওখানে। কম পক্ষে দুজন। ফিসফিস করে কথা বলতে শুনেছি।'

'তাহলে এখন নেই কেন?' গলা চড়িয়ে ডাকল মুসা, 'চিতা, চলে আয়। কাউকে পাবি না।'

বেরিয়ে এল চিতা।

ফিরে চলল ওরা।

চুপ করে আছে রবিন। ফেরার পথে একটা কথাও বলল না। ক্যাম্পে এসে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে আগের রাতের কথা মনে পড়ল তার। রাতে মুসা অবিশ্বাস করেছে, এখন তার নিজেরই সন্দেহ হতে লাগল, সত্যিই দেখেছিল তো? দেখে থাকলে এত তাড়াতাড়ি কোথায় গেল লোকগুলো? ওরা যাওয়ার পর কটেজে কেউ আর ছিল না, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে চিতার নাক এড়াতে পারত না। সুতরাং আবার যখন সেকথা তুলল মুসা, তর্ক করল না আর রবিন।

নাস্তা খেতে বসল ওরা। গরমে নষ্ট হয়ে এসেছে স্যাণ্ডউইচ, একটু একটু গন্ধ লাগছে। প্রায় জোর করেই দুটো খেল রবিন। কিন্তু মুসা আর চিতা কেয়ারও করল না। গপ গপ করে গিলল।

খেয়েদেয়ে মুসা বলল, 'নাহ্, আর ভাল লাগছে না এখানে। চিতার কলারটা খুলতে পারলে আর এক মিনিটও থাকতাম না।'

'কিন্তু থাকতে হচ্ছে। কি করে সময় কাটানো যায়, বলো তো?'

'চলো, ছেলেটার ওখান থেকে ঘুরে আসি।'

চিতাকে নিয়ে সেদিকে রওনা হলো ওরা। কাছাকাছি হতেই মাটি কোপানোর শব্দ কানে এল। ঝোপ থেকে ছুটে বেরোল একটা রোমশ শরীর। ঘেউ ঘেউ করে স্বাগত জানাল।

'হাই কার্ব,' হেসে বলল রবিন, 'হাড়টাড় আর নেই তোর কাছে? চিতাকে দিবিনে?'

মাটি খোঁড়ার শব্দ থেমে গেল।

ঝোপ ঘুরে অন্যপাশে এসেই দাঁড়িয়ে গেল গোয়েন্দারা। খুঁড়ে খুঁড়ে কি করে রেখেছে! ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত। কোন কোনটা খুব গভীর। আলগা মাটি স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে গর্তের কিনারে।

ছেলেটাকে দেখা গেল না।

'এই, কোথায় তুমি?' ডেকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

বলেই চোখে পড়ল তাকে। একটা ট্রেঞ্চের মত গর্তে নেমে কি যেন দেখছে। ডাক শুনে ওপর দিকে তাকাল। কুঁচকে ফেলল ভুরু। চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাদের না আসতে মানা করেছিলাম! লোক তো মোটেও সুবিধের না তোমরা! কথা রাখতে জানো না!'

'বা-বা,' ব্যঙ্গ করল মুসা। 'দেখো, তোমার মুখে ওকথা মানায় না। 'কথা তো তুমিই রাখনি। প্রতিজ্ঞা ভুলে আবার গেছ আমাদের ক্যাম্পের কাছে। এটাও ভুলে গেছ?'

'আমি যাইনি। প্রতিজ্ঞা কখনও ভুলি না আমি, কথা দিলে কথা রাখি। যাও এখন, ভাগো। তোমরা আসলেই ভাল মানুষ না।'

'তুমি ভাল?' রেগে গেল মুসা। 'ঠিক আছে, যাচ্ছি। এই পচা জায়গায় থাকার আমাদেরও কোন ইচ্ছে নেই। বানাও তোমার কবর, যত খুশি। নিজের কবরে নিজেই পড়ে মরো।'

'মরলেও তোমাদের ডাকতে যাব না। দয়া করে যাও এখন। আর এসো না এখানে, প্লীজ!' বলেই আবার মাটিতে কোপ মারল।

ঘুরে আবার হাঁটতে লাগল দুই গোয়েন্দা।

'ছেলেটা সত্যিই পাগল,' রবিন বলল। 'নিজেই কথা দিল, নিজেই ভাঙল, এখন আবার অস্বীকার করে। আবার বড় গলায় বলে, কথা দিলে আমি কখনও ভাঙি না। বাহ্!'

খরগোশ চলাচলের পথ ধরে একটা ওকের জটলায় এসে ঢুকল ওরা। একটা ছেলে বসে আছে সেখানে। বই পড়ছে। ওদের সাড়া পেয়ে মুখ তুলল।

'খাইছে!' থমকে দাঁড়াল মুসা, 'দেখো, কে!'

রবিনও হাঁ হয়ে গেছে। আবার সেই ছেলেটা! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এল কি করে এখানে? এইমাত্র দেখে এসেছে ট্রেঞ্চের নিচে। বইটার মলাটে লেখা নাম পড়ল রবিন। প্রত্নতত্ত্বের ওপর লেখা।

তার সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল মুসা। 'আরেকটা খেলা, নাকি? চালাকি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে? দৌড়াতেও তো পারো সাংঘাতিক। এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছ...'

'বলে কি! মাথামুণ্ড তো কিছুই বুঝি না!' গুঙিয়ে উঠল ছেলেটা। 'আমাকে একটু একা থাকতে দিতে পারো না? কাল সন্ধ্যায় একবার উল্টো-পাল্টা কি সব বললে, এখন এসেছ আবার...'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'আগে বলো এত তাড়াতাড়ি এখানে এলে কি করে?'

'তাড়াতাড়ি আসতে যাব কেন? খুব ধীরে-সুস্থে হেঁটে এসেছি, বই পড়তে পড়তে। হাঁটার সময়ও বই পড়ি আমি। তাতে সহজে পথ ফুরায়।'

'গুল মারার আর জায়গা পাও না,' ঝাঝিয়ে উঠল মুসা। 'দৌড়ে এসেছ তুমি, আমি জানি। শুধু শুধু ভণিতা করছ কেন? কয়েক মিনিট আগেই তোমার সঙ্গে দেখা

হয়েছে।'

'উফ্, আর পারি না!' কপাল চাপড়াল ছেলেটা। 'তোমাদেরকে মোটেও ভাল মানুষ মনে হচ্ছে না। ভাল মানুষেরা অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না। এখন দয়া করে যাবে? আমাকে পড়তে দেবে? আরেকটা কথা, আর আমাকে জ্বালাতে এসো না, প্লীজ! আমাকে আমার মত থাকতে দিয়ো।'

ছেলেটার কথা বলার ভঙ্গি ভাল লাগল না চিতার। গরগর করে উঠল সে।

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল ছেলেটা। 'খবরদার, আমার সঙ্গে ওরকম করবি না! থাপ্পড় মেরে দাঁত ফেলে দেব!'

শার্টের হাতা গুটাতে শুরু করল মুসা, 'দেখি, দাও তো দেখি থাপ্পড়! কত্তবড় সাহস…'

তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ওখান থেকে টেনে সরিয়ে আনল রবিন। 'থাক, থাক, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। বদ্ধ উন্মাদ। পাগলের সঙ্গে কথা বলে কে।'

ঘুরে আবার আরেক দিকে হাঁটতে শুরু করল ওরা। কয়েক পা গিয়ে ফিরে তাকাল রবিন। ওদের দিকে নজরই নেই ছেলেটার। বইয়ে ডুবে গেছে।

'এরকম পাগল আর দেখিনি!' নিচুস্বরে বলল সে। 'অবাকই লাগছে। মুসা, ও-ই গিয়ে কটেজে ঢোকেনি তো কাল রাতে?'

'কি জানি!' কানের নিচে চুলকাল মুসা। 'তবে বলা যায় না, ছেলেটা ভূতের চেয়েও বড় পাগল। ঢুকতেও পারে।'

আরও কিছুদূর এগিয়ে একটা ডোবামত দেখা গেল। দূর থেকে দেখেই বলে উঠল মুসা, 'গোসলের জায়গা বোধহয় পেয়ে গেলাম।'

ডোবাটার পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। পানি বেশ পরিষ্কার।

'হুঁ, ভালই,' রবিন বলল, 'গোসল করা যায়।'

দু-দিন গোসল হয় না। জায়গা পাওয়ার পর আর দেরি করল না। কাপড় খুলে নেমে গেল।

ছোট হলেও ডোবাটা বেশ গভীর। দাপাদাপি করতে, সাঁতার কাটতে অসুবিধে হচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে ডোবাডুবি করে পানি থেকে উঠল ওরা। পাড়েই হাত-পা ছড়িয়ে বসল গায়ের পানি শুকানোর জন্যে।

মুসা বলল, 'রবিন, খাবার আনা দরকার।'

'কোত্থেকে? বাড়ি চলে যাব নাকি?'

'সেটাই ভাল হবে। বেশি করে আনতে পারবে। এমন কিছু আনবে যাতে গরমে নষ্ট না হয়।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।'

ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা।

বিস্কুট-টিস্কুট যা ছিল খেয়ে নিয়ে রকি বীচে রওনা হয়ে গেল রবিন।

ছয়

সন্ধ্যার সময় ফিরে এল সে।

'এসেছ,' মুসা বলল, 'বাঁচালে। নাড়িভুঁড়িগুলোও হজম হয়ে গেছে আমার। দাও, দাও, জলদি দাও, দেখি কি এনেছ?'

প্যাকেট বাড়িয়ে দিল রবিন। তার খাওয়া লাগবে না, আসার সময় পেট ভরে খেয়ে এসেছে।

রেখে রেখে খাওয়ার জন্যে অনেক কিছু বানিয়ে দিয়েছেন রবিনের আম্মা। দিয়েছেন ভাজা মাংস, সেদ্ধ করা প্রচুর শাক-সজি, সালাদ, আর ঘরে বানানো পাঁউরুটি।

গপ গপ করে গিলতে লাগল মুসা। চিতাকেও দিল। পেট কিছুটা শান্ত হয়ে এলে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'মা কি বলল?'

'জলদি জলদি ফিরে যেতে। নইলে এসে কান ধরে নিয়ে যাবেন।'

'চিতাকে নিতে দেবে? কিছু বলল?'

'আন্টি কিছু বলেননি। তবে আংকেল ভরসা দিয়েছেন। চুপি চুপি বললেন, অনেকটা নরম করে ফেলেছেন আন্টিকে।'

চওড়া হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'দারুণ একটা খবর দিলে।' যেন সেই খুশিতেই বড় একটুকরো মাংস মুখে পুরল। চিবিয়ে গিলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোরের কি খবর?'

'ভাল না। দুনিয়াসুদ্ধ মাল কিনে নিয়ে এসেছেন রাশেদচাচা। কাজ করতে করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সবাই। বোরিস আর রোভারকে রোজই ওভারটাইম করতে হচ্ছে।'

'কিশোর এখানকার কথা শোনেনি?'

'শুনেছে। আসার জন্যে অস্থির। কাজ একটু কমলেই চলে আসবে।'

'কটেজের রহস্যময় আলোর কথা শুনেছে?'

'হ্যাঁ। পাগলা ছেলেটাকে দেখারও খুব ইচ্ছে। চলে আসবে। আমার বিশ্বাস কাল-পরশুই। বলে বলে লোভ জাগিয়ে দিয়েছি তার। আজ রাতে ঘুম হবে না।'

হাসল মুসা।

খেয়ে খেয়ে পেট ভারি করে ফেলল সে। ঝর্না থেকে দুই মগ পানি খেয়ে এসে ধপ করে বসে পড়ল। পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'আহ্, খেলাম।'

অন্ধকার হতে কিছুটা দেরি আছে। রবিন বলল, 'বসেই থাকব? এত তাড়াতাড়ি শোয়াও যাবে না। চলো, একটু ঘুরে আসি।' কটেজের দিকেই যাওয়ার ইচ্ছে তার। মনে ক্ষীণ আশা, আবার যদি আলো দেখা যায়?

আগে আগে চলল চিতা। কটেজের আলো নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, সে চায় একটা খরগোশ ধরতে। আর কিছু না হোক, তাকে তাড়া করতে দিলেই খুশি। ইস্, কত যে খরগোশ আছে এখানে! আজ যেন আরও বেশি বেরিয়েছে। জটলা করছে, ছোটাছুটি করছে, এ-গর্ত থেকে উঁকি দিচ্ছে, ও-গর্তে ঢুকে পড়ছে।

কিন্তু কিছুতেই তাকে কাছে যেতে দিল না মুসা। মনে বড় দুঃখ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসতে হলো চিতাকে।

ফেরার পথে অন্ধকার হয়ে গেছে। কটেজটার দিকে বার বার ফিরে তাকিয়েছে রবিন। কিন্তু আলো দেখেনি।

হেঁটে গা গরম হয়ে গেছে। ঝর্না থেকে পানি খেয়ে এল তিনজনেই।

হাই তুলতে লাগল রবিন। 'আজ আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'পাবেই। সারাদিন ছুটাছুটি করেছ। আজ কিন্তু আমার পাচ্ছে না। প্রায় সারাটা দিনই শুয়ে থেকেছি ঝোপের মধ্যে।'

'টর্চ রেডি রাখো তাহলে। কটেজে কোন শব্দ শুনলেই দেখতে যাব।'

'ঘুমাবে না?'

'ঘুমাব। তুমি শুনলে আমাকে ডেকো।'

খুব নিচু দিয়ে একটা বাদুড় উড়ে গেল। ঘাউ ঘাউ করে উঠল চিতা। যেন বলতে চাইল, 'বাহাদুরি দেখাচ্ছ, দেখাও! গলার কলারটায় বিপদে ফেলে দিয়েছে, নইলে দেখাতাম মজা!'

পাতার বিছানায় আগের রাতের মতই কম্বল বিছানো হলো। শুয়ে পড়ল রবিন আর মুসা। মুসার পাশে ঘাসের ওপর শুলো চিতা।

চিত হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গুণতে লাগল মুসা। বলল, 'কিশোর এলে খুব ভাল হত, তাই না, রবিন? জমত। ওকে ছাড়া আসলে জমে না।'

জবাব নেই।

'অ্যাই, রবিন...' কাত হয়ে ফিরে তাকাল মুসা।

ঘুমিয়ে পড়েছে রবিন।

তারা দেখতে দেখতে মুসা কখন ঘুমিয়ে পড়ল, সে-ও বলতে পারবে না। একটা মাকড়সা এসে উঠল তার হাতে। বাহু বেয়ে নেমে গেল তালুতে, সেখান থেকে আঙুলে, নিথর আঙুলগুলোতে জাল পাতবে কি পাতবে না দ্বিধা করতে লাগল। ঝোপের ভেতর শজারুর আনাগোনা। একটা কান খাড়া করে ঘুমের মধ্যেই সব শুনতে পাচ্ছে চিতা। কিন্তু সবই স্বাভাবিক শব্দ বলে কোন উচ্চবাচ্য করছে না।

সুন্দর, নীরব শান্ত একটা রাত।

সারারাত টানা ঘুম দিয়ে পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল দুই গোয়েন্দার। ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর, মন। খিদেও পেয়েছে।

হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে নিল। গায়ের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বিছানাটা। আরও কিছু পাতা কুড়িয়ে এনে গদি উঁচু করতে লাগল। সময় লাগল না বেশি। দেখতে দেখতে কাজ শেষ।

'এবার গোসল,' ঘোষণা করল মুসা।

কোন আপত্তি নেই রবিনের। অফুরন্ত সময় আছে হাতে। যা খুশি করতে পারে। ডোবার পাড়ে রওনা হলো ওরা।

পথে দেখা হয়ে গেল সেই ছেলেটার সঙ্গে। তবে ওদের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে। সঙ্গে কার্ব।

রাফিকে দেখেই ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল কুকুরটা, খেলা জমানোর জন্যে। চিতাও এগিয়ে গেল।

দূর থেকেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল ছেলেটা। চিৎকার করে বলল, 'ভয় নেই, আমি তোমাদের কাছে আসছি না। তোমাদের ক্যাম্পও অনেক দূরে। কথার খেলাপ করেছি বলতে পারবে না। কার্ব, আয়।'

চিতার সঙ্গে খেলতে না পেরে মনমরা হয়ে চলে গেল কার্ব।

ডোবার কাছে এসে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দার। ওদের আগেই এসে নেমে পড়েছে আরেকজন, সাঁতার কাটছে।

'জায়গাটাকে যতটা নির্জন ভেবেছিলাম, ততটা নয়,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'আসলে মানুষ ছাড়া জায়গা কোথাও পাওয়া যায় না…'

'মুসা!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে তার বাহুতে হাত রাখল রবিন, 'সাঁতার কাটছে কে দেখেছ? লম্বা লম্বা চুল…'

'আরি, এইমাত্র না ওকে দেখে এলাম ওদিকে!'

পানির কিনারে চলে এল দুজনে, ভাল করে দেখার জন্যে।

কোন ভুল নেই। সেই ছেলেটাই।

ওদেরও দেখতে পেল সে। হাপুস করে মুখ থেকে পানি বের করে দিয়ে বলল, 'ভয় নেই। আমি উঠে যাচ্ছি এখুনি। তোমাদের বিরক্ত করব না।'

'কিন্তু তুমি এলে কি করে এখানে?' রবিন জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে তো ঘুরতেও দেখলাম না, এদিকে আসতেও দেখলাম না!'

'আমার কাছাকাছি ছিলে না, সে জন্যে দেখোনি। আমি এসেছি অনেকক্ষণ হয়েছে।'

'আল্লারে, এ-কি পাগলের পাল্লায় পড়লাম!' মুসা বলল, 'এই, তোমার মাথাটাতা ঠিক আছে তো?'

'না থাকার তো কোন কারণ দেখি না। আমার তো ধারণা, তোমরাই পাগল।'

পানি থেকে উঠল ছেলেটা। গা থেকে পানি ঝরছে। মুছল না, শুকানোর চেষ্টা করল না। আর কোন কথাও বলল না। রওনা হয়ে গেল যেদিকে তার ক্যাম্প, অর্থাৎ যেদিকে মাটি খুঁড়তে দেখা গেছে তাকে সেদিকে।

আশেপাশে কোথাও কার্বকে দেখা গেল না। মুসা বলল, 'মাথাটাই খারাপ করে দিল! এমন আচরণ করে কেন ছেলেটা?'

হাত ওল্টাল রবিন। 'আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। একবার হাসে, আরেকবার গম্ভীর, একবার ভাল করে কথা বলে, আরেকবার খারাপ।'

যা-ই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে পানিতে নামল দুজনে। চিতাও নামতে চাইল। কলার ভিজে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাকে নামতে দিল না মুসা। তীরে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল কুকুরটা, আর নীরবে লেজ নাড়তে লাগল। ভাব দেখে মনে হয়, আহা, কত দুঃখী!

অনেকক্ষণ দাপাদাপি করে পানি থেকে উঠল দুই গোয়েন্দা। গা শুকাল। তারপর ফিরে চলল ক্যাম্পে। খিদে পেয়েছে।

শুয়ে বসে কাটতে লাগল দিনটা। ছেলেটাকে আর দেখল না। মাঝে মাঝে কানে এল পাথরের গায়ে গাঁইতির কোপের আওয়াজ।

মুসা বলল, 'এত কষ্ট করে কয়েকটা মাটির হাঁড়িকুড়ি নাহয় পাবে, তাতে কি লাভ বলো তো? আসলেই পাগল।'

'আমার কি মনে হয়, জানো? সব মানুষের মধ্যেই পাগলামি থাকে। তোমার মধ্যে আছে, আমার মধ্যে আছে। নিজেরটা নিজে বুঝতে পারি না।'

কেটে গেল দিনটা। নতুন কিছু ঘটল না।

সন্ধ্যার পর বিছানায় শুয়ে পড়ল। আজ দুজনের কারোই ঘুম নেই। আকাশে তারাও নেই। কেমন ভারি হয়ে আছে আকাশের মুখ। মেঘ জমছে। গুমোট গরম।

'বৃষ্টি হবে মনে হয়,' রবিন বলল।

'ঝড় না উঠলেই বাঁচি।'

'বেশি বৃষ্টি হলে ঠেকাতে পারবে না আমাদের তাঁবুটা। ভিজে যাব।'

'তা বটে।'

তবে সেটা নিয়ে বেশি চিন্তা করল না ওরা। কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

কুকুরটা ঘুমাল না। তার কানে এল বাজের চাপা গুড়ুগুড়ু। এই শব্দকে ভয় পায় না সে, তবে পছন্দও করে না।

আকাশের এমাথা-ওমাথা চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুতের নীলচে-সাদা তীব্র আলো। ক্ষণিকের জন্যে আলোয় আলোকিত হয়ে গেল চারদিক। আবার অন্ধকার।

আস্তে দুই থাবার মাঝে থুতনি নামিয়ে চোখ মুদল চিতা।

আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। বড় এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল তার নাকে। আরেকটা পড়ল কার্ডবোর্ডের কলারে। ভাল লাগল না ব্যাপারটা। উঠে বসে গরগর শুরু করল সে। যেন ভয় দেখাতে চাইল বৃষ্টিকে।

এগিয়ে আসছে বাজের শব্দ।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল।

বাজ পড়ল বিকট শব্দে।

চমকে জেগে গেল দুই গোয়েন্দা।

'খাইছে! এসেই গেল,' মুসা বলল।

'তাঁবুতে ঢোকো।'

রবিনের কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের ঝিলিক। দানবীয় কোন সাপের জিভের মত লিকলিক করে গেল যেন, মাথাটা তেমনি চেরা।

'তাঁবুতে ঢুকে লাভ নেই,' মুসা বলল। 'এই তাঁবুতে বৃষ্টি মানবে না।'

'কটেজটাতেই গিয়ে ঢুকতে হবে আমাদের। আর কোন উপায় নেই। চলো, জলদি।'

টর্চটা পাশেই রাখা ছিল, খাবলা দিয়ে তুলে নিল মুসা। একটানে তুলে ফেলল একটা কম্বল। আরেকটা কম্বল তুলে নিল রবিন। ভাল বৃষ্টিই শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে।

টর্চের আলোয় পথ দেখে মাথা নিচু করে দৌড় দিল দুজনে। ঘেউ ঘেউ করে আগে আগে ছুটছে কুকুরটা।

ভাঙা, খোলা দরজা দিয়ে ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। যাক, বাঁচা গেল। বৃষ্টিতে আর ভিজবে না। এককোণে এসে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল দুজনে।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক, সেই সঙ্গে প্রচুর বজ্রপাত করে আর বৃষ্টি ঝরিয়ে একসময় সরে গেল ঝড়। একটা দুটো করে তারা উঁকি দিতে শুরু করল মেঘের ফাঁকে। ঝড়ো বাতাস সমস্ত মেঘ তাড়িয়ে নিয়ে গেল। আবার তারায় ঝলমল করে উঠল আকাশটা।

'বাইরে আর শুতে পারব না,' মুসা বলল। 'সব ভিজে গেছে। ব্যাগগুলো নিয়ে আসিগে। বালিশ বানিয়ে এখানেই শুয়ে পড়ব।'

'চলো।'

বৃষ্টি মোটামুটি ভালই ঠেকিয়েছে তাঁবুটা। মুসা যতটা আশঙ্কা করেছিল ততটা পানি ঢোকেনি। ব্যাগট্যাগগুলো শুকনোই আছে।

ঘরের কোণে কম্বল পেতে ব্যাগ মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়ল দুজনে। মুসার প্রায় গা ঘেঁষে রইল চিতা।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু জেগে রইল চিতা। অস্বস্তি বোধ করছে। খুবই অস্বস্তি।

হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ঘাউ ঘাউ করে।

চমকে জেগে গেল ছেলেরা।

'চিতা,' আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি দেখেছিস, চিতা, কী! ভূত?'

'যাসনে চিতা,' রবিনও ভয় পেয়েছে, 'আমাদের ফেলে যাসনে ভাই!'

সাত

চিৎকার থামিয়েছে চিতা। মুসার হাত থেকে ছুটে যেতে চাইছে।

পরিবেশটা ভীতিকর। ঝড়বৃষ্টি, রহস্যময় পোড়ো বাড়ি, তার পর কুকুরটার এই হঠাৎ উত্তেজনা ভয় পাইয়ে দিল দুই গোয়েন্দাকে।

'ব্যাপারটা কি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বুঝতে পারছি না। কোন কিছু উত্তেজিত করে দিয়েছে ওকে।'

চুপ করে ঘরের কোণে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে রইল দুজনে। আরও বার দুই গরগর করল চিতা, কিন্তু ঘেউ ঘেউ আর করল না।

আবার শোনা গেল বাজের শব্দ। আরেকটা ঝড় আসছে।

উত্তেজনা চলে গেল মুসার। 'এটাই তাহলে কারণ। রবিন, ঝড়ই উত্তেজিত করেছে ওকে।' চিতাকে বলল, 'দূর বোকা, ঘরে থাকলে এসবকে কেউ ভয় পায় নাকি।'

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা।

'মহা মুসিবত! বাজের চেয়ে তো তুই-ই চেঁচাচ্ছিস বেশি,' ধমক দিল মুসা।
আবার বেরোতে চাইল কুকুরটা। কলার ধরে রাখল সে।
'এই বৃষ্টিতে বেরোবি কি? এখানেই বেশি আরাম। চুপ থাক।'
'ছেড়ো না ওকে,' রবিন বলল। 'থাক এখানেই। অবাক কাণ্ড! হঠাৎই কেমন ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো।'
'বাড়িটা না ধসে পড়ে!'
'তা পড়বে না। তিন-চারশো বছর ধরে এসব অত্যাচার সয়েছে। আরও কিছুদিন পারবে।'
উঠে দাঁড়াল রবিন।
'যাচ্ছ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মুসা।
'জানালার কাছে। বিদ্যুতের আলোয় জায়গাটা কেমন লাগে দেখব।'
জানালার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। পাল্লা-শার্সি তো কিছু নেই, আছে শুধু ফোকরটা। ঝিলিক দিয়ে উঠল তীব্র আলো। ক্ষণিকের জন্যে বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ল, তারপরই গায়েব, ঢেকে গেল অন্ধকারে, যেন জাদু-মন্ত্রের মত।
আচমকা চিৎকার করে উঠল রবিন, 'মুসা, মুসা...'
চমকে গেল মুসা। 'কি হয়েছে?'
'মানুষ!'
'মানুষ?' উঠে এল মুসা। চিতাকে ছাড়ল না। সঙ্গে নিয়ে এল।
'দু-তিনজন মনে হলো। দাঁড়িয়ে আছে।'
'কই, কোথায়?'
'ওই যে, ওদিকে।'
আবার বিদ্যুৎ চমকাল।
'আরি, এখন তো নেই! গেল কোথায় এত তাড়াতাড়ি!'
'ভুল দেখেছ তুমি। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল বলছ তো? গাছ। গাছকেই মানুষ মনে হয়েছে। কে আসবে এখানে এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মরতে? তা-ও আবার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।'
'কিন্তু উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছিল কুকুরটা।'
'সে তো করছিল বাজের আওয়াজে ভয় পেয়েছিল বলে।'
'কি জানি...'
গুম-গুড়ুম করে আবার পড়ল বাজ। চোখ ধাঁধানো তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে গেল পুরো অঞ্চল। চিৎকার করে উঠল মুসা, রবিন দুজনেই। ঘেউ ঘেউ শুরু করল কুকুরটা। বেরিয়ে যেতে চাইল আবার। ছাড়ল না মুসা।
'ওই...ওই যে, দেখেছ এবার!'
'খাইছে! ঠিকই তো! আমাদের দিকেই চেয়ে আছে। এত রাতে এখানে কি করছে?'
বাড়িটার কাছে চলে এসেছে লোকটা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল গোয়েন্দাদের দিকে।

রবিন বলল, 'যে দু-তিনজনকে দেখেছিলাম, ও নিশ্চয় তাদেরই একজন। বিদ্যুতের আলোয় কটেজটা চোখে পড়েছে। আশ্রয় নিতে এসেছে এখানে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু এরকম সময়ে এই খোলা অঞ্চলে রাতের বেলা ঘুরতে বেরোল কারা? রবিন, এই ভূতুড়ে এলাকায় আর না। কালই আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। মরে ভূত হতে চাই না।'

জানালার কাছ থেকে নড়ল না ওরা।

রবিন বলল, 'ঝড় কিন্তু থেমে যাচ্ছে আবার।'

চুপ হয়ে গেছে চিতা। উত্তেজনাও চলে গেছে তার।

মুসা বলল, 'রাতটা কাটাই কি করে? ঘুমের তো বারোটা বেজেছে। আর আসবে না।'

'শুয়ে শুয়ে কথা বলি, আর কি করব।'

জানালা-দরজার ফোকরগুলোতে ফেকাসে আলো দেখা গেল একসময়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দুই কিশোর। ভোর হচ্ছে। খানিক পরেই সূর্য উঠবে। অন্ধকারে যে ভয়টা ছিল, আলোতে সেটা কেটে গেল অনেকখানি। উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। বাইরে বেশ আলো। দেখা যাচ্ছে ভেজা মাঠ, ঝোপঝাড়, ওকগাছ।

পাশে এসে দাঁড়াল রবিন।

বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেই মুসা বলল, 'এখন আর ভয় লাগছে না। অন্ধকার আসলে মানুষের মনটাকে কাবু করে দেয়।'

হাসল রবিন। 'তার মানে আজ বাড়ি ফিরছ না?'

'পাগল। চিতার হার্ডবোর্ড না ফেলে আর না। মা আবার খেপবে। রকি বীচের পোলাপানগুলোর টিটকারিও অসহ্য।'

'আমারও অবশ্য যেতে ইচ্ছে করছে না এত তাড়াতাড়ি,' হাই তুলল রবিন। 'এতক্ষণে ঘুম পাচ্ছে আমার।'

'আমারও। ভয় আর উত্তেজনা চলে গেছে তো, তাই।'

কুকুরটাও শান্ত হয়ে শুয়ে আছে।

কম্বলের বিছানায় এসে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল দুজনে।

অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল ওদের। ভাঙিয়ে দেয়া হলো। নইলে আরও ঘুমাত।

খুটখাট শব্দ হলো। শুনেই চেঁচিয়ে উঠল চিতা।

জেগে গেল দুই গোয়েন্দা।

ঘুম জড়িত গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা, 'অ্যাই, কি হয়েছে…'

'আরি, কার্ব!' রবিন বলল, 'কি রে, আমরা কেমন আছি দেখতে এসেছিস?'

ছুটে গিয়ে ছোট্ট কুকুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চিতা। শুরু হয়ে গেল খেলা। মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি, জাপটা-জাপটি…

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার ওপর চোখ পড়ল রবিনের।

মুখে চওড়া হাসি নিয়ে বলল ছেলেটা, 'ঘুম তাহলে ভাঙল ঘুমকাতুরেদের। ঝড়ের পর কেমন আছ দেখতে এলাম। আসব না কথা দিয়েছি বটে, কিন্তু

তোমাদের জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তাই আর থাকতে পারলাম না।'

'থ্যাংকিউ।' উঠে বসল রবিন। কাপড়ে লেগে থাকা ধুলো-ময়লা হাত দিয়ে ঝাড়তে লাগল।

মুসাও বসেছে। বলল, 'রাতটা ভালই কেটেছে, তবে অদ্ভুত কিছু...'

রবিনের কনুইয়ের গুঁতোয় থেমে গেল সে। রহস্যময় ঘটনাগুলোর কথা ছেলেটাকে জানাতে চায় না রবিন। 'সাংঘাতিক এক রাত গেল, তাই না? তোমার কেমন কাটল?'

'ভাল। একটা ট্রেঞ্চে ঢুকে বসেছিলাম। বৃষ্টি আমার নাগাল পায়নি। ঠিক আছে, যাই। কার্ব, আয়।'

চলে গেল ছেলেটা।

'পাগল হোক আর যা-ই হোক, ভালই কিন্তু ছেলেটা,' রবিন বলল। 'এখন তো পাগলামিরও কোন লক্ষণ দেখলাম না। একেবারে স্বাভাবিক।'

ঘর থেকে বেরোল ওরা। নিজেদের তাঁবু আর জিনিসপত্রগুলোর কি অবস্থা দেখতে চলল।

তাঁবু ভেজা। তবে টিনে ভরা খাবারের কোন ক্ষতি হয়নি। পানি ছুঁতে পারেনি ওগুলোকে। রুটি, মাখন ও সার্ডিন মাছ ভাজা বের করে খেতে বসে গেল ওরা। আগে পেট ঠাণ্ডা, তারপর অন্য কথা।

সবে রুটিতে কামড় দিয়েছে মুসা, এই সময় বলে উঠল রবিন, 'ছেলেটা আসছে আবার।'

কাছে এসে ছেলেটা বলল, 'গুড মর্নিং। কেমন আছ দেখতে এলাম। উফ্, সাংঘাতিক একটা ঝড় গেল।' মুখে হাসি নেই তার।

হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে দুই গোয়েন্দা।

কয়েক মুহূর্ত ভাষা খুঁজে পেল না ওরা। অবশেষে মুসা বলল, 'দেখো, ভাল ছিলে ভাল থাকো। পাগলামি শুরু কোরো না আবার। ভাল যে আছি আমরা বলা হয়েছে তোমাকে।'

'না বলোনি।...যাই, উন্মাদের সঙ্গে কথা বলা চলে না।'

চলে গেল সে।

'দেখলে!' রবিন বলল, 'ও আসলেই পাগল। ভাল তাকে বলেও সারতে পারলাম না, অমনি এল খারাপ হওয়ার জন্যে। নাকি আমাদের নিয়ে মজা করছে?'

'কি জানি! হতে পারে!'

কড়া রোদ উঠল। বৃষ্টির পর এই রোদ গায়ে ছ্যাঁকা দেয়। ভেজা জিনিসপত্র তাতে শুকাতে দিল ওরা। ঝোপের ছায়ায় বসে কথা বলতে লাগল।

'যা-ই বলো,' রবিন বলল, 'মন থেকে সরাতে পারছি না কথাগুলো।'

'কি কথা?'

'এই ধরো, ছেলেটার উল্টোপাল্টা আচরণ...'

'করে করুকগে। আমাদের কি?'

'কিছু না। কিন্তু খচখচ করে মনে। এরকম সাধারণত হয় না।'

'পাগলে কি না বলে···'

'তারপরেও, ঠিক মেনে নিতে পারছি না। তার ওপর আরও দুটো ঘটনা। প্রথম দিন রাতে কটেজে দেখলাম রহস্যময় আলো। কাল রাতে ঝড়ের মধ্যে দেখলাম মানুষ। সব কিছুই যেন এই আছে এই নেইয়ের ভেলকিবাজি।'

'এর জবাব পেতে হলে ভূত বিশ্বাস করতেই হবে তোমাকে।'

'এখন কিশোর থাকলে খুব ভাল হত। মুসা, তাকে গিয়ে নিয়ে আসব নাকি? রহস্যের কথা বললে যত কাজই থাক, সব ফেলে···'

বাধা পড়ল রবিনের কথায়। ঘেউ ঘেউ করে উঠল চিতা।

'আহ্, অনেক দিন বাঁচবে!' চিৎকার করে বলল মুসা। 'নাম নিতে না নিতেই এসে হাজির!'

রবিনও দেখল। পায়েচলা পথটা ধরে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে স্বয়ং কিশোর পাশা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দুজনে।

গোয়েন্দাপ্রধানকে এগিয়ে আনতে ছুটল।

আট

'এই তাহলে তোমার চিতা। এরই জন্যে ঘর ছেড়েছ,' নিচু হয়ে কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল কিশোর। 'কি রে, কেমন আছিস?'

একবার 'ঘাউ' করেই অনেক কথা বুঝিয়ে দিল কুকুরটা। আন্তরিকতা দেখানোর জন্যে হাত চেটে দিল কিশোরের। ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল। জিভটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে মুখ থেকে। আদুরে ভঙ্গি।

'আরি, এ তো এক্কেবারে জিনার রাফিয়ান,' হেসে বলল কিশোর। 'স্বভাব-চরিত্র এক। কেবল চেহারাটা আলাদা।'

'ভাল বলেই তো রাখতে চেয়েছি।'

'কিন্তু তোমার আম্মা?'

'না দিলেও রাখব। জোর করে রাখব।'

'বিদ্রোহ করবে নাকি?'

'করবে আর কি?' রবিন বলল, 'করে তো বসেই আছে।'

'তা বটে।'

তাঁবুর কাছে চলে এল ওরা। ছায়ায় বসল।

রবিন বলল, 'এক্কেবারে ঠিক সময়ে এসেছ, কিশোর। তোমাকে আনতে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।'

'পালিয়ে এসেছি। আজকে আরও কয়েক ট্রাক মাল আনতে যাওয়ার কথা। ভয়েই পালিয়েছি। চিঠি লিখে রেখে এসেছি চাচীকে, কদিনের জন্যে আরও অন্তত দুজন লোক রাখতে।···হ্যাঁ, এবার বলো, আনতে যাচ্ছিলে কেন?'

'রহস্য।'

সজাগ [illegible] পার। [illegible] উঠল চোখের তারা। 'রহস্য?'

'খাবে [illegible]?' জিজ্ঞে[illegible] করল মুসা। 'খিদে পেয়েছে? খেতে খেতেই শুনো...'

'তা অবশ্য [illegible] বলোনি। চাচীকে ফাঁকি দিয়ে পালানোটা খুব কঠিন। খাওয়ার আর সুযোগ [illegible] নিজের ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। 'অনেক খাবার কিনে এনেছি। দাঁড়া[illegible], খুলি।'

খুব খুশি লাগছে মুসা ও রবিনের। কিশোর আসাতে যেন সব কিছু বদলে গেছে। দুশ্চিন্তা, [illegible] সব উধাও। জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন পরিবেশ। আবার ভাল লাগছে সব কি[illegible]

ভেজা প্রকৃতি আর ভেজা নয়, শুকিয়ে দিয়েছে কড়া রোদ। বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেছে ধুলো, ঝলমল করছে গাছের পাতা। কোথা থেকে বেরিয়ে এসেছে হাজার হাজার ফড়িং। ওকের ডালে উড়ে এসে বসল একটা দোয়েল। মিষ্টি শিস দিতে লাগল।

নাস্তা খেয়েছে যে বেশিক্ষণ হয়নি, তা-ও আবার খিদে পেয়ে গেছে মুসার। রবিনেরও। কিশোরের খাবার খোলার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে।

একে একে বের করল কিশোর চিকেন স্যাণ্ডউইচ, স্যামন স্যাণ্ডউইচ, বীফ রোল, ফ্রুট কেক, সালাদ, চকলেট, পনির, জেলি, ফলের টিন।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'তোমার ব্যাগ-ভর্তি শুধু খাবারই ছিল নাকি?'

'না,' হাসল কিশোর, 'কাপড়-চোপড়ও আছে। টুথপেস্ট, ব্রাশ, সাবান, সব। অন্যের ব্রাশ দিয়ে কি আর দাঁত মাজা যায়।'

মুসা হাসল। রবিনও হাসল।

'আহ্, কি জিনিস এনেছ,' খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল মুসা, 'গন্ধেই পেট খালি।'

'ঠিক আছে, ভরতে শুরু করো,' কিশোর বলল। 'এখানকার খবর জানিয়ে আমার মগজটাও ভরাও।'

বলতে শুরু করল রবিন। প্রথম রাতে কটেজে আলো দেখেছে, ফিসফিস করে কথা বলতে শুনেছে, পায়ের আওয়াজ শুনেছে, এসব বলার পর বলল, 'মুসা আর আমি গিয়ে দেখি কিছুই নেই। ভাবলাম, হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে গিয়ে ভুল দেখেছি, ভুল শুনেছি। কিন্তু এখন আর তা মনে করি না।'

'কেন?' স্যাণ্ডউইচ চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে কিভাবে গিয়ে কটেজে ঢুকেছে মুসা ও রবিন, খোলা মাঠে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, সব জানানো হলো তাকে।

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'রহস্য একটা আছে। জায়গাটা দেখে কিন্তু মনে হয় না এখানে কারও আগ্রহ জাগানোর মত কিছু থাকতে পারে।'

'তা আছে, প্রত্নতত্ত্বের খোরাক। মাটি খুঁড়ে প্রাচীন ইনডিয়ানদের থালা-বাসন বের করার চেষ্টা করছে এক প্রফেসরের ছেলে।'

'ছেলেটা পাগল,' মুসা বলল। 'কখন কি বলে না বলে ঠিকঠিকানা নেই। এই

'রাখব কোথায়?' মুসার প্রশ্ন।
'কেন, এত সুন্দর কটেজটা থাকতে ভাবনা কি,' কিশোর বলল।
'ওটা সুন্দর হলো! একটা ধসে পড়া পোড়ো বাড়ি, ভাঙাচোরা জানালা-দরজা, রোজ-র্যাম্বলারের ঝাড়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করছে...'
'এমন জায়গায় থাকতেই তো মজা। নাও, ওঠো, আর দেরি করে লাভ নেই।'
জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে কটেজে সাজিয়ে রাখতে ব্যয় করল ওরা পরের আধ-ঘণ্টা। এক কোণে একটা তাক পাওয়া গেল, তাতে তুলে রাখল ব্যাগগুলো। খাবার রাখল পুরানো ফায়ারপ্লেসটার পেছনে একটা অন্ধকার তাকে।
কাজ শেষ।
'এইবার,' কিশোর বলল, 'চলো, তোমাদের পাগলা ছেলেটাকে দেখতে যাওয়া যাক।'

নয়

রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। পায়ে পায়ে চলল চিতা। এত মানুষ দেখে খুব খুশি সে। একবার এর পায়ে গা ঘষছে, একবার ওর পা ঘেঁষে চলছে, দৌড়ে সামনে যাচ্ছে, পিছিয়ে আসছে, আনন্দে পাগল হয়ে গেছে যেন। গলার কলারটা নড়ছে হাস্যকর ভঙ্গিতে।
'খেপে গেল নাকি ব্যাটা,' হেসে বলল কিশোর।
'না, বেশি খুশি;' মুসাও হাসল।
'এটাকে রাখতে পারলে মন্দ হয় না।'
'তা তো হয়ই না। কিন্তু মা তো সেটা বুঝতে চায় না।'
'বাড়ি গিয়ে দেখো এবার, দেন কিনা। না দিলে ইয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে রেখে দেব। তিন গোয়েন্দার একটা কুকুর দরকার।'
হেসে বলল রবিন, 'চার গোয়েন্দা হয়ে যাবে।'
'হোক না, ক্ষতি কি? গোয়েন্দা কুকুর অনেক কাজে লাগে। আমরা এটাকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে পুলিশের কুকুরগুলোর মত বানিয়ে ফেলব।'
'ভালই হবে।'
'কিন্তু মেরিচাচী যদি রাখতে না দেন?' মুসার প্রশ্ন।
'তা দেবে,' কিশোর বলল। 'রাজি করিয়ে ফেলব, কষ্ট হবে আরকি। কুকুর আমাদের আগেও ছিল, ভুলে গেছ? চাচার ছিল, আমার ছিল। চাচী অবশ্য সব সময়ই বিরক্ত থাকত...'
'কিন্তু রাজিটা করাবে কি করে, শুনি?' নিশ্চিন্ত হতে চাইছে মুসা।
তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'তুমি ভাবছ হাতে-পায়ে ধরে অনুরোধ করব? মোটেও না। ইয়ার্ডে মালপত্র ছড়ানো থাকে, চুরি হওয়াটা স্বাভাবিক। বেশ কিছু দামী মাল চুরি হয়ে যাবে রাতের বেলা। পুলিশের কাছে চাচীকে যেতে দেব না কিছুতেই। তদন্তের দায়িত্ব পড়বে আমাদের ওপর। জিনিসগুলো খুঁজে বের

করবে কুকুরটা। তারপর আর কি? এমন একটা কাজের কুকুর রাখতে তখন কোন আপত্তি থাকবে না চাচীর। বরং সর-মাখন খাওয়াবে।'

'কিন্তু সময়মত চুরি যে হবেই তার ঠিক কি?'

'হওয়ানোর ব্যবস্থা করব।'

ভুরু কুঁচকে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল, 'বুঝেছি। মেরিচাচী খুব ভাল। আমার মা-কে কিন্তু এভাবে ফাঁকি দেয়া সম্ভব না।'

রবিন বলল, 'আরেকটা বড় প্রশ্ন কিন্তু রয়েই গেল। যাকে নিয়ে এত ঝামেলা করছি আমরা, তার মালিক কে কিছুই জানি না। যদি খোঁজ পেয়ে এসে নিয়ে যেতে চায়?'

'গিয়েই আগে বিজ্ঞাপন দেব। মালিক থাকলে আসবে। কিনে রাখার চেষ্টা করব তার কাছ থেকে।'

'যদি বিক্রি না করে?'

'সে তখন দেখা যাবে।' কুকুরটাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি রে চিতা, গোয়েন্দা হবি?'

'হউ' করে মাথা ঝাঁকাল চিতা।

'বাহ্, রাজি,' হাসল কিশোর।

রবিন হেসে বলল, 'কিছু জিজ্ঞেস করলেই ওরকম হউ হউ করে আর মাথা ঝাঁকায়...'

মুসা বলে উঠল, 'ওই যে বসে আছে!'

'কে?'

'ওই ছেলেটা।'

ঝোপের পাশে বসে তাকে বই পড়তে দেখল কিশোর। 'কই, তেমন বিশেষ কিছু তো মনে হচ্ছে না। অতি সাধারণ।'

'এসো, কথা বলি।'

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'হালো। কার্ব কোথায়?'

মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা, 'কি করে বলব?'

'আজ সকালেও তো তোমার সঙ্গে ছিল।'

'না, ছিল না। কখনও আমার সঙ্গে থাকে না। দয়া করে বিরক্ত কোরো না আমাকে, আমি পড়ছি।'

কিশোরের দিকে ফিরল মুসা, 'এই হলোগে অবস্থা। সকাল বেলা কুত্তাটাকে নিয়ে দেখা করতে এসেছিল, এখন পুরোপুরি অস্বীকার করছে। পাগল ছাড়া আর কি বলবে?'

'পাগল তো তোমরা!' ঝাঁঝিয়ে উঠল ছেলেটা। 'যাও এখান থেকে!'

খানিকটা সরে এসে কিশোর বলল, 'ও এখন এখানে। জায়গাটা দেখার এই-ই সুযোগ। জলদি চলো।'

খোঁড়ার কাজ যেখানে চলছে সেই ক্যাম্পের কাছাকাছি হতেই শিস শোনা

গেল, আর মাটি কোপানোর শব্দ। ট্রেঞ্চের কাছে পৌছে নিচে উঁকি দিয়ে এতটা চমকে গেল মুসা, আরেকটু হলেই পড়ে গিয়েছিল।

আপনমনে শিস দিতে দিতে মাটি খুঁড়ে চলেছে ছেলেটা। কপালে এসে পড়া লম্বা চুল সরাতে গিয়ে চোখ পড়ল তিন গোয়েন্দার ওপর। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'আবার এসেছ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে মুসা বলল, 'ডানা আছে নাকি তোমার? উড়ে এসেছ?'

'উড়ে আসব কেন? হেঁটে এসেছি।'

'এই না দেখলাম বই পড়ছ?'

'বই পড়ব কেন? এখানেই তো আছি। মাটি খুঁড়ছি, এক ঘন্টা হয়ে গেল।'

'পাগল!'

রেগে গেল ছেলেটা, 'এ তো সত্যি সত্যি পাগল বানিয়ে দেবে দেখছি! তোমাদের না কতবার বললাম, দয়া করে এসো না এখানে, আমার ডিসটার্ব হয়···'

'দেখো, তোমাকে ডিসটার্ব করতে আসিনি আমরা,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'শুধু দেখতে এসেছি। জায়গাটা কি তোমার?'

'আমার হতে যাবে কেন? এত বড় জায়গা কি কারও একলার সম্পত্তি হয়। বছরখানেক আগে এখানে মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করেছিল আমার আব্বা। গবেষণা চালানোর জন্যে সরকারের কাছ থেকে চেয়ে নিল জায়গাটা। এসব ব্যাপারে আমারও আগ্রহ আছে। সে জন্যেই দেখতে এসেছি কিছু পাওয়া যায় কিনা। আব্বাকে বলে এসেছি এখানে ছুটি কাটাব। কি পেয়েছি দেখবে?'

হাত তুলে একটা পুরানো তাক দেখাল ছেলেটা। তাতে সাজানো রয়েছে একটা ভাঙা হাঁড়ি, একটা আদিম ব্রোচ, টাই-পিনের মত কোন একটা অলঙ্কার, আর পাথরে তৈরি একটা মানুষের মাথার অর্ধেকটা।

কৌতূহল হলো কিশোরের। লাফ দিয়ে নামল ট্রেঞ্চে। 'দারুণ সব জিনিস পেয়েছ মনে হয়। মোহর-টোহর পেয়েছ?'

'পেয়েছি,' পকেট থেকে তিনটে মুদ্রা বের করল ছেলেটা, দুটো তামার, একটা রূপার। 'এই দেখো। কয়েকশো বছরের পুরানো। স্প্যানিশদের।'

'হুঁ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার গোয়েন্দাপ্রধান।

তার দেখাদেখি রবিনও নেমে এসেছে। প্রত্নতত্ত্বে তারও আগ্রহ আছে।

মুসার এসব ভাল লাগে না। সে [illegible] গেল ওপরে। বিশাল একটা পাথরের ওপর বসল। চোখ পড়ল একটা খরগোশের ওপর। সাদা আরেকটা পাথরের ধারের একটা গর্ত থেকে উঁকি দিচ্ছে

একবার তাকিয়ে ভয় পেয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল ওটা, আবার বেরোল। ভয়ে ভয়ে তাকাল মুসার দিকে। আবার ঢুকল, আবার বেরোল। কিন্তু পালিয়ে যাচ্ছে না। নিশ্চয় ছানা আছে, ভেবে পাশে সরল মুসা। ঢুকে গেল খরগোশটা। হাতে ভর দিয়ে উবু হয়ে গর্তের ভেতর উঁকি দিল সে। অন্ধকার।

কোমরে ঝোলানো টর্চটা জ্বেলে আলো ফেলল ভেতরে। কিন্তু খরগোশটাকে

দেখা গেল না। তার বদলে দেখল একটা সুড়ঙ্গ। দেয়ালের একপাশে ছোট ছোট কয়েকটা ফোকর, খরগোশের বাসা। মূল সুড়ঙ্গটা তেরছা হয়ে কয়েক ফুট গিয়েই শেষ, তারপর শুধুই শূন্যতা। আশ্চর্য! কুয়া-টুয়া নাকি?

সঙ্গীদেরকে খবরটা জানানোর জন্যে উঠে এসে ট্রেঞ্চের পাড়ে দাঁড়াল সে। কিশোরকে তার আবিষ্কৃত জিনিস গর্বের সঙ্গে দেখাচ্ছে ছেলেটা।

'অ্যাই,' ডেকে বলল মুসা, 'কি পেয়েছি জানো? সুড়ঙ্গ। তার আবার শেষ নেই।'

'ও, ওটা,' বিশেষ গুরুত্ব দিল না ছেলেটা। 'জানি। শেষ আছে ওটার। আব্বা বলেছে, অনেক বড় একটা গুহা আছে ওখানে। স্টোররুম হিসেবে ওটাকে ব্যবহার করত স্প্যানিশরা। গরমকালে মাংস জমিয়ে রাখত। লুটের মাল আর অন্যান্য জিনিসও রাখত। খুব সাধারণ গুহা।'

নিরাশ হলো মুসা। আবার গিয়ে বসল পাথরের ওপর।

আরেকটা তাকের কিছু জিনিস দেখিয়ে রবিন জিজ্ঞেস করল ছেলেটাকে, 'এগুলো তোমার?'

'না।'

'কার?' বলতে বলতে গোল সুন্দর একটা পাত্র নামাতে গেল রবিন।

হাঁ হাঁ করে উঠল ছেলেটা, 'ধরো না, ধরো না!'

তার চিৎকারে চমকে গেল রবিন। আরেকটু হলেই দিয়েছিল হাত থেকে ফেলে।

'রাখো ওটা! যেখানে আছে রেখে দাও!' আবার চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা।

'আহা, শান্ত হও,' মোলায়েম গলায় বলল কিশোর, 'অত রেগে যাওয়ার কি হলো। ভাঙেতোনি।'

'কিন্তু ভাঙতে পারত। ভাবলাম এত নিরালা জায়গা, কাজ করে একটু শান্তি পাব। কোথায়! মানুষের হাত থেকে নিস্তার নেই! খেদাতে খেদাতে মরলাম!'

সজাগ হয়ে উঠল কিশোরের গোয়েন্দা মন। মনে পড়ে গেল রবিনের গল্প ঃ *ঝড়ের মধ্যে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল দু-তিনজন লোক!* জিজ্ঞেস করল, 'মানুষ? কেমন মানুষ?'

'কেমন আর। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো যাদের স্বভাব। ট্রেঞ্চে নেমে এসে খুঁজতে চায়।'

'কী?'

'তা কি করে বলব? হয়তো ভাবছে মোহর খুঁজছি আমি। স্প্যানিশদের গুপ্তধনে বোঝাই এ-জায়গা।'

'তেমন কোন সম্ভাবনা আছে নাকি? মানে গুপ্তধন…'

'আরে না! এই এলাকার ওপর লেখা কম বই তো আর পড়িনি। কোথাও গুপ্তধনের ইঙ্গিত নেই। থাকলে, আব্বাও বলত আমাকে। খামোকা সন্দেহ করে এসে বিরক্ত করে। বোকা, হদ্দ বোকার দল সব…' শেষ করল না কথাটা, কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। 'তোমরা কিছু মনে কোরো না, তোমাদের বলিনি।'

'কাল রাতে কেউ এসেছিল?' জানতে চাইল কিশোর।

'দেখিনি। তবে কার্ব খুব চেঁচামেচি করছিল। ভাবলাম, ঝড়-তুফান দেখে ওরকম করছে। অবাকই লাগছিল। ঝড়বৃষ্টিকে ভয় করে না সে।'

'দেখো কাণ্ড, এতক্ষণ ধরে কথা বলছি, অথচ তোমার নামই জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'রোনাল্ড কুইলার। রনি।'

'স্যার মরিস কুইলারের ছেলে না তো তুমি, বিখ্যাত প্রত্নবিদ?'

হাসল রনি, 'হ্যাঁ। প্রত্নতত্ত্বের অনেক খবরই তো রাখো তোমরা।' একটা বেলচা তুলে নিল, 'ঠিক আছে, সময় করে আলাপ করা যাবে···'

ট্রেঞ্চ থেকে উঠে এল দুই গোয়েন্দা। মুসা বলল, 'গরম লাগছে। চলো, সাঁতার কাটি।'

'চলো,' কিশোর বলল।

ডোবার কাছে এসেই বলে উঠল মুসা। 'খাইছে! আবারও আমাদের আগেই এসে বসে আছে!'

পানিতে ডুব দিচ্ছে আর মাথা তুলে হাপুস-হুপুস করছে ছেলেটা, মুখ দিয়ে পানি ছাড়ছে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে কপালের চুল সরাল। তারপর সোজা রওনা দিল উল্টোদিকের পাড়ের দিকে।

চিৎকার করে ডাকল মুসা, 'হেই রনি, থাকো, থাকো, আমাদের সঙ্গে সাঁতার কাটো!'

কিন্তু থামল না ছেলেটা। পাড় বেয়ে উঠে পড়ল ওপরে। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আমার নাম রনি নয়।'

আর একটা মুহূর্তও দাঁড়াল না সে। হারিয়ে গেল ঝোপের ভেতর।

কিশোরের দিকে ফিরে মুসা বলল, 'কাণ্ডটা কি করল দেখলে? পাগল!'

জবাব দিল না কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ঝোপটার দিকে। ঘন ঘন দুবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে।

পানিতে নেমে খিদে না পাওয়া পর্যন্ত দাপাদাপি করল তিনজনে। হতাশ ভঙ্গিতে তীরে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল চিতা। করুণ দৃষ্টি। দাপাদাপিতে যোগ দেয়ার তারও খুব ইচ্ছে। কিন্তু মুসা নামতে দিচ্ছে না। হার্ডবোর্ড ভিজে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

পানি থেকে উঠে পাড়ে বসে গা শুকিয়ে নিল ওরা। তারপর ফিরে চলল কটেজে।

টিনে ভরা আনারস দিয়ে পাঁউরুটি খেতে লাগল। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রচুর ফ্রুট কেক আর শর্টব্রেড বিস্কুট। সবই খেলো চেটেপুটে। আনারসের রসটুকুও ফেলল না। টিন থেকে মগে ঢেলে নিয়ে তাতে পানি মিশিয়ে খেয়ে ফেলল।

ঢেকুর তুলতে তুলতে বাংলায় বলল মুসা, 'আহ্, খাইলাম! আল্লায় খাওয়াইল!'

অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রবিন। বাংলা বোঝে সে-ও। 'এটা আবার

শিখলে কোত্থেকে?'

'বাংলাদেশের একটা লোককে বলতে শুনেছি। কে জানি অর্ধেকটা বাসি রুটি ফেলে গিয়েছিল ডাস্টবিনের কাছে। সেটা খেয়ে হাত তুলে দোয়া করছিল।'

হেসে ফেলল রবিন। 'পচা রুটি খেয়েই এত ভক্তি! দেখলে কোথায়?'

'রকি বীচের ফুটপাথে। ভিক্ষে করছিল।'

শুনে গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। বিড়বিড় করল, 'হুঁ, এই তো করবে, জানেই তো কেবল ভিক্ষে করা!'

'কি বললে?'

'অ্যাঁ!...না,' নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় টেনে টেনে বলল কিশোর, 'আর কোনো কাম ন হাইলে বিক্কা করিও, বালা হইসা কামাইতা হাইরবা।'

বুঝতে পারল না মুসা। 'মানে?'

বুঝিয়ে দিল কিশোর, 'আর কোন কাজ না পেলে ভিক্ষে কোরো, অনেক পয়সা কামাতে পাররে।'

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল রবিন। মুসাও হাসছে। চিতা ভাবল, তারও হাসা দরকার, নইলে মজলিসে মানায় না। খেঁক খেঁক করে কুকুরে-হাসি হাসল সে।

কিশোর হাসল না। 'ব্যাপারটা হাসির নয়। ইদানীং ভবঘুরের সংখ্যা বাড়ছে এদেশেও। প্রচুর এশিয়ান আছে তাদের মধ্যে। কি করে কি করে বেআইনী ভাবে ঢুকে পড়ে আমেরিকায়। তারপর আর কাজ পায় না, পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। দেশে থাকলে যে হালে থাকত, তার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থা হয়ে যায় এখানে। ওরা ভাবে আমেরিকায় এলেই সব সমস্যার সমাধান, টাকার ছড়াছড়ি...হায়রে বোকা মানুষ!'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'মানুষ নিয়ে গবেষণা অনেক হয়েছে। চলো, ওঠো, এবার কটেজটাতে খুঁজব।'

'আমরা খুঁজেছি,' রবিন বলল। 'পাইনি কিছু।'

'তবু আরেকবার খুঁজি।'

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো বাড়িটাতে। সিঁড়ি, ওপরতলার দুটো ঘর—ঘর আর বলা যায় না ওগুলোকে; ছাত, দেয়াল বেশির ভাগই ধসে পড়েছে, নিচ তলার ঘর, কোন জায়গা বাদ দিল না।

'বললাম না, পাবে না,' রবিন বলল।

'ছাউনিটাতে চলো,' মুসা বলল। 'আস্তাবল ছিল যেটা।'

ভেতরটা অন্ধকার। জানালাগুলো এত ছোট, আলো আসে অতি সামান্য। চোখে সইয়ে নিতে সময় লাগল।

উবু হয়ে একটা নাল তুলে নিয়ে দেখে, আবার মেঝেতে ফেলল কিশোর। টন্ করে উঠল পাথরে লেগে। সেদিকে তাকিয়ে থমকে গেল সে। 'এই, দেখে যাও, ব্যাপারটা অদ্ভুত!'

'কী?' এগিয়ে এল মুসা আর রবিন।

'দেখো তো এই পাথরটা। আগের বার এরকমই দেখেছিলে কিনা?'

'এরকমই তো…' মুসা বলল।
রবিন ভাল করে দেখে বলল, 'না, তোলা হয়েছে মনে হয়! তুমি ঠিকই ধরেছ কিশোর, আগের বার এরকম ছিল না। একটা পাশ উঁচু হয়ে আছে। কিনারে লেগে থাকা শেওলাও নেই।'
'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'তার মানে তোলা হয়েছিল। নিচে কিছু লুকানো থাকতে পারে।'
'তাহলে কি এর জন্যেই এসেছিল লোকগুলো কাল রাতে?'
'কি আছে নিচে?' মুসার প্রশ্ন।
'এখনই জানা যাবে,' বসে পড়ল কিশোর 'দেখি, হাত লাগাও, তুলতে হবে।'

দশ

পাথরটা আলগা রয়েছে বলেই তুলতে পারল ওরা। তবু অনেক কসরত করতে হলো। বেজায় ভারি।
ধুড়ুম করে একপাশে কাত হয়ে পড়ল ওটা। লাফিয়ে সরে গেল তিন গোয়েন্দা। ঘেউ ঘেউ শুরু করল চিতা।
কিন্তু কিছুই নেই নিচে। একটা গর্তও না। লোহার মত শক্ত কালো মাটি, ব্যস, আর কিছু না।
শুকনো কঠিন মাটির দিকে বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে তিনজনে। নিরাশ হয়েছে। কিছু একটা পাবেই আশা করেছিল।
কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? যার তলায় কিছুই নেই, সেটাকে এত কষ্ট করে তুলতে যাবে কেন কেউ?'
'হয়তো ভেবেছিল আছে।'
রবিন বলল, 'এমন কিছু খুঁজছে, যা এখানে নেই।'
'সেটা কি?' মুসার প্রশ্ন।
'সেটাই তো বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল। 'ও হয়তো শুধু এটুকু জানে, এখানকার কোন পাথরের নিচে আছে জিনিসটা। কিন্তু কোন পাথরটার নিচে, তা জানে না।'
'তাহলে বাকিগুলো তুলে দেখছি না কেন আমরা?'
'কারণ, কোনটার নিচে আছে জানা নেই। কি আছে তা-ও জানি না। এত ভারি পাথর তোলা সহজ কাজ নয়। না জেনে অযথা পরিশ্রম করার কোন মানে হয় না। তুলতে তুলতে ঘাম ঝরিয়ে ফেলব, তারপর হয়তো দেখব কিছু নেই।'
ওল্টানো পাথরটার ওপর বসে পড়ল কিশোর। অন্য দুজন বসল তার দিকে মুখ করে। কুকুরটাও বসল কাছেই। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে জরুরি এই মীটিঙে সে-ও অংশ নিতে চায়।
নিচের ঠোঁটে কয়েকবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। বলল, 'রবিন, প্রথম

রাতে কটেজে আলো দেখেছ তুমি। কথা শুনেছ। তারপর কাল রাতে ঝড়ের সময় খোলা মাঠে মানুষ দেখেছ।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ। কাল রাতে মুসাও দেখেছে।'

'তারমানে সত্যি আছে ওরা। এর একটাই অর্থ, এখানে কোন কাজ আছে ওদের। কিছু খুঁজতে এসেছে।'

মুসা বলল, 'পাথরের নিচে গুপ্তধন লুকানো নেই তো?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'বাড়িটা দেখেই বোঝা যায় এখানে যারা বাস করত তার ধনী ছিল না। বড়জোর দু-চারটা সোনার মোহর ফেলে গেলেও যেতে পারে। এবং সেগুলোও এখন নেই। অনেক আগেই পেয়ে নিয়ে গেছে লোকে।'

'ইদানীং কেউ কিছু এনে লুকিয়ে থাকতে পারে। চোরাই মাল।'

'তা পারে। এক পক্ষ এনে লুকিয়েছে, আরেক পক্ষ সেগুলো খুঁজতে এসেছে। সে জন্যেই জানে না কোথায় লুকানো আছে, রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে আসে খোঁজার জন্যে। ঝড়ের সময়ও এসেছিল। নিশ্চয় তোমাদের তাঁবুটা দেখেছে, কিংবা কটেজে ঢুকতে দেখেছে। তাই জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে এসেছিল তোমরা ঘুমিয়েছ কিনা।'

'তাহলে তো আবার খুঁজতে আসবে, যদি না পেয়ে গিয়ে থাকে।'

'তা তো আসবেই।'

'আমরা কি চলে যাব?'

'কেন? কয়েকটা ছিঁচকে চোরের ভয়ে?'

'যদি অন্য কিছু হয়...'

হেসে ফেলল কিশোর। 'ভূতের কথা বলছ তো? ওসব নেই। ওঠো, গিয়ে দেখি কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা। মানুষ হলে অবশ্যই কিছু না কিছু ফেলে যাবে।'

'যদি না ফেলে যায়?'

'তাহলেও ভূত হবে না। অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকবে।'

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হাত তুলে দেখাল রবিন, ঝড়ের সময় কোনখানটায় লোকগুলোকে দেখেছিল।

'দেখি,' কিশোর বলল, 'পায়ের ছাপ পাই কিনা। ভেজা মাটি। ছাপ বসবে ভালভাবেই।'

কিন্তু ওখানে এসে দেখা গেল, জায়গাটাতে পুরো হয়ে পাতা বিছিয়ে আছে। ঝরে পড়েছে প্রবল বাতাসে। পায়ের ছাপ পড়েনি। আর পড়লেও পাতার তলায় রয়েছে, বোঝার উপায় নেই।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর কিশোর বলল, 'জানালাটার নিচে দেখব।'

আগে আগে চলল মুসা। তার চোখেই আগে পড়ল ছাপ দুটো। বেশ গভীর হয়েই পড়েছে। বাঁ পাশেরটার একটা ধার সামান্য অস্পষ্ট, ডান পাশেরটা বেশি গভীর। তার মানে ওই পায়ের ভরই বেশি পড়েছে মাটিতে।

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর, 'বুঝলে তো, সেকেণ্ড, ভূত নয়।'

চুপ করে রইল সহকারী গোয়েন্দা, কিছু বলল না।

ছাপটার দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল কিশোর, 'রাবার সোল, মাঝারি হিল, আট নম্বর সাইজ। মুসা, তোমার পায়ের মাপ...'

'আমার জুতোর নয় ওটা...'

হাত নাড়ল কিশোর, 'বলছিও না সেকথা। বলছিলাম, লোকটার পা তোমার পায়ের সমান।' রবিনের দিকে তাকাল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কাগজ আছে?'

'আছে। কি করবে?'

'দরকার আছে। দাও।'

পকেটে নোটবুক আর পেন্সিল সব সময় রাখে রবিন। নোটবুকের ভেতর থেকে বের করল ভাঁজ করে রাখা এক তা সাদা কাগজ। দিল কিশোরকে।

কাগজটা ছাপের ওপর রেখে হালকা করে তার ওপর সীস বোলাল কিশোর, জোরে চাপ দিলে কেটে যেতে পারে কাগজ, কিংবা ফুটো হয়ে যেতে পারে। তারপর সেটা তুলে নোটবুকের ওপর রেখে, চেপে আরেকবার পেন্সিল চালাল রেখাগুলোর ওপর। আঁকা হয়ে গেল ছাপটা। 'ব্যস, হয়ে গেল।' রবিনের নোটবুক ও পেন্সিল ফিরিয়ে দিয়ে, কাগজটা ভাঁজ করে সযত্নে পকেটে রাখল সে। পকেটের ওপর চাপড় দিয়ে বলল, 'থাক, কাজে লাগতে পারে।'

'তা তো হলো,' বলল মুসা। 'কিন্তু কটা বাজে দেখেছ? আমার খিদে পেয়েছে।'

'আমারও। আশ্চর্য এলাকা! এখানে এত খিদে লাগে কেন?'

'লাগলেই তো ভাল। লাগবে আর খাব, খাব আর লাগবে, চলুক না এমন করেই।'

'হ্যাঁ, আর কাজ নেই তো, কুমড়ো হয়ে বাড়ি ফিরি।'

'এক সময় তো কুমড়োই ছিলে,' হেসে বলল মুসা।

'সে জন্যেই তো এত ভয়। না বাবা, আমি বরং শসা থাকতে চাই, তা-ও রোগাটে শসা, কুমড়ো আর নয়।'

কটেজের এক কোণে এসে বসল ওরা। কম খাবে বললেও ততটা কম কিন্তু খেলো না কিশোর, যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধেই খাবারগুলো উঠে এল তার আঙুলে, ঠেলে দিতে লাগল মুখের ভেতর। স্যামন স্যাণ্ডউইচ, ফ্রুটকেক, চকলেট, আনারস, এবং আনারসের রস গিলতে গিলতে ঢাউস করে ফেলল পেট।

খাওয়ার পর মুসা বলল, 'অন্ধকার হয়ে আসছে। আজও কি কটেজে ঘুমাব?'

'ঘুমাব। তাহলে রাতে কেউ ঢোকার চেষ্টা করলে জানতে পারব।'

রবিনের প্রশ্ন। 'পাহারা দেব?'

'দরকার নেই,' বলল মুসা। 'চিতাই দিতে পারবে। তার কান আমাদের চেয়ে সজাগ। কেউ এলেই সাবধান করে দেবে।'

'যদি তারা অশরীরী না হয়,' হাসল রবিন।

ঝট করে ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল মুসা। কোণগুলোতে ছায়া। নিচু গলায় বলল, 'অলক্ষুণে কথা বোলো না তো! এমনিতেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জানো

না, মাগরিবের আজানের পর পরই ওরা বেরোয়…' অস্বস্তিতে গাল চুলকাল সে। 'অশরীরী এলেও টের পায় কুকুরেরা। ওরা সব বোঝে।'

'তাহলে আর ভাবনা কি?' হেসে বলল কিশোর, 'আজ তাহলে ভূতই শিকার করব। ধরতে পারলে গলায় রশি বেঁধে নিয়ে যাব রকি বীচে, টিকিট দিয়ে দেখাব। বড় লোক হয়ে যাব দু-দিনেই।'

'হাসছ তো? হাসো! ঘাড়ে এসে যখন পড়বে তখন বুঝবে মজা!'

'ভূতের আলোচনা অনেক হয়েছে, এবার ওঠো, বিছানাটা ঠিক করে ফেলি।'

আরও অনেক পাতা-লতা এনে বিছিয়ে পুরু গদি তৈরি করা হলো। তিনজনের শোয়ার জন্যে অনেক জায়গা দরকার। তার ওপর কম্বল বিছিয়ে দিতেই তৈরি হয়ে গেল চমৎকার বিছানা।

ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। মোম জেলে কাজ করছে ওরা। বিশাল ঘরটার অন্ধকার এই অল্প আলোয় কাটছে না, বরং কোণগুলোতে আরও জমাট বেঁধেছে। ইঁটের দাঁত বের করা দেয়ালে ছায়া নাচছে, ভূতুড়ে করে তুলেছে পরিবেশ।

শুয়ে পড়ল কিশোর। হাই তুলে বলল, 'আমার ঘুম পেয়েছে।'

চিতা এসে শুয়ে পড়ল মুসার গা ঘেঁষে। ঠেলে সেটাকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল সে, 'হাই কুত্তা, সর। নিচে নাম। এমনিতেই জায়গা নেই, খালি বিছানায় ওঠে দেখো।'

শুয়ে পড়লেও ঘুম এল না কিশোরের চোখে। ভাবতে লাগল পাথরের ফলকটার কথা। কেউ একজন আশা করেছিল ওটার নিচে কিছু আছে। কি আশা করেছিল? কি করে বুঝল ওটাই সেই পাথরটা? তার কাছে কোন নকশা কিংবা ম্যাপট্যাপ আছে? নকশাই যদি থাকে তাহলে ভুল করল কেন? নাকি নকশাটাও ভুল?

ভাবতে ভাবতেই চোখ লেগে এল একসময়।

চিতাও ঘুমিয়েছে। তবে একটা কান খাড়া। শুনতে পেল, গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ইঁদুর। দেয়ালে যে একটা বড় গোবরে পোকা হাঁটছে, তা-ও তার কানে ঢুকল। বাইরে ঘোরাফেরা করছে একটা শজারু।

আস্তে আস্তে ঝুলে পড়ল কানটা। তারমানে আর কোন শব্দই শুনছে না।

হঠাৎই খাড়া হয়ে গেল আবার কান। মুহূর্ত পরে দ্বিতীয় কানটাও। অদ্ভুত একটা শব্দ ভেসে আসছে। বাড়ছে শব্দটা…বাড়ছে…আরও বাড়ছে…

জেগে গেল সে। কান খাড়া করে শুনতে শুনতে পা দিয়ে খোঁচা দিল মুসার গায়ে। জাগানোর জন্যে। ঘুমের মধ্যে বিরক্ত হয়ে থাবা দিয়ে পা-টা সরিয়ে দিল মুসা। কিন্তু দুই সেকেণ্ড পরই জেগে যেতে হলো।

ভয়াবহ শব্দ! রাতের নীরবতাকে চিরে, কেটে ফালাফালা করে দিয়ে যেন ছুটে আসছে কানের পর্দায় আঘাত হানার জন্যে। তীক্ষ্ণ, তীব্র সেই শব্দ একবার বাড়ছে, একবার কমছে। ভীষণ যন্ত্রণায় যেন ছটফট করছে কোন অজানা জন্তু, আর্তনাদ করছে, গোঙাচ্ছে।

'কিশোর! রবিন! জলদি ওঠো!' হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন মুসার বুকের

ভেতর, পাগল হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা।

জেগে গেছে অন্য দুজনও। উঠে বসল। শুনতে লাগল সেই আওয়াজ। কিসের চিৎকার বুঝতে পারছে না।

থামল চিৎকার। কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে আবার শুরু হলো।

চিতার গায়ে হাত পড়ল মুসার। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে কুকুরটার।

লাফিয়ে উঠে জানালার দিকে দৌড় দিল কিশোর।

'দেখে যাও, দেখে যাও!' চিৎকার করে বলল সে।

মুসা আর রবিনও ছুটে এল জানালার কাছে। গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা।

এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল গোয়েন্দাদের।

এখানে ওখানে জ্বলছে নীল ও সবুজ আলো। একবার মলিন হচ্ছে, একবার উজ্জ্বল। সাদা গোল আরেকটা আলো ভাসছে ওগুলোর মাঝখানে, ধীরে ধীরে শূন্যে উঠছে।

রবিনের বাহু খামচে ধরেছে মুসা। বিড়বিড় করে দোয়া-দরূদ পড়ছে আর আল্লাহকে ডাকছে।

মনে হচ্ছে এদিকেই আসছে আলোটা। ককিয়ে উঠল মুসা, 'আলো, দোহাই তোর, এদিকে আসিস না, ভাই! ও কিশোর, কিসের আলো? চিৎকার করে কেন?'

'দেখে আসি, কিসের,' জানালার কাছ থেকে সরে গেল কিশোর। 'চিতা, আয় তো আমার সঙ্গে।'

পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল মুসা, 'কিশোর, দোহাই তোমার, যেয়ো না! মেঠো ভূতগুলো খুব শয়তান হয়, শুনেছি…'

কিন্তু শোনার জন্যে বসে নেই কিশোর, বেরিয়ে গেছে।

থেমে গেল চিৎকার। মিলিয়ে গেল শব্দের রেশ।

কয়েক মিনিট পর কিশোরের জুতোর শব্দ কানে এল। ফিরে এসেছে।

ঘরে ঢুকল সে।

'কি দেখলে?' একসঙ্গে জানতে চাইল মুসা আর রবিন।

'কিছুই না,' জবাব দিল কিশোর। 'অন্ধকারে দেখা যায় না। সকালে জানা যাবে।'

এগারো

অন্ধকারে বসে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল তিনজনে।

মুসা বলল, 'আর আমি এখানে নেই। কালই বাড়ি চলে যাব।'

'এরকম একটা রহস্যের কিনারা না করেই?' কিশোর জানাল, 'ওখানে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠল কুকুরটা, চেঁচামেচি, ছোটাছুটি…অন্ধকারে যতটা সম্ভব আমিও দেখার চেষ্টা করেছি। কিছুই চোখে পড়ল না।'

'আলোগুলোর কাছে গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'গিয়েছি। কিন্তু অনেক ওপরে ছিল। ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিসের আলো বুঝতে পারিনি।'

'মানুষেই যদি করবে, কেন বুঝলে না?' মুসার প্রশ্ন। 'আর তুমি নাহয় বোঝোনি, চিতার তো বোঝার কথা ছিল। মানুষ হলে কুকুরের চোখ এড়াতে পারত না।'

নিজের নাম শুনেই বোধহয় মৃদু 'হউ' করে উঠল কুকুরটা।

'পারুক আর না পারুক,' জোর গলায় বলল কিশোর, 'আলোর রহস্য আমি কাল ভেদ করবই। করেছে মানুষেই। এবং কেন করেছে সেটাও বুঝতে পারছি।'

'কেন করেছে?'

'আমাদের এখান থেকে তাড়ানোর জন্যে। যাতে এসে এখানে ভাল করে খুঁজতে পারে। আমরা থাকাতে ওদের অসুবিধে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এইটা হতে পারে,' একমত হলো রবিন। 'তবে অবাকটা লাগছে, চিতা ওদের দেখল না কেন?'

'সে কালই বোঝা যাবে।'

'যদি না যায়?' মুসা বলল, 'যদি কিছু পাওয়া না যায়?...তোমরা যাও আর না যাও, আমি বাবা আর এর মধ্যে নেই। সোজা বাড়িতে। ভূতের সঙ্গে আরেকটা রাত কাটাতে আমি রাজি না। সম্ভব হলে এখনই পালাতাম।'

'ঠিক আছে, কাল পর্যন্ত দেখি। যদি কিছু বুঝতে না পারি, তখন ভাবব কি করা যায়। রাত এখনও অনেক। বসে থেকে লাভ নেই। শুয়ে পড়া যাক।'

শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু উত্তেজিত মন নিয়ে ঘুম আর আসতে চাইল না। কান খাড়া করে রেখেছে তিনজনেই। কিন্তু আর শোনা গেল না অদ্ভুত চিৎকার।

ঘুমাতে ঘুমাতে অনেক দেরি হলো, তাই ভাঙতেও দেরি হলো।

সবার আগে জাগল কিশোর। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। তারপর মনে পড়ল, ভাঙা পুরানো কটেজে।

কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে মুসাকে জাগাল সে।

হাই তুলল মুসা। হাত-পা টানটান করে আড়মোড়া ভাঙল। বলল, 'ইস্, কি ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিল রাতে। অতটা ভয় পেয়েছিলাম ভাবতেই অবাক লাগছে এখন। কেমন অবাস্তব লাগছে, না?'

'না। আমি এখনও একই কথা বলব, ভয় দেখিয়ে কেউ আমাদের তাড়ানোর চেষ্টা করছে। ওদের কাজে বাধা হয়ে আছি আমরা।'

রবিনও জেগেছে। বলল, 'তাহলে চলো তদন্ত শুরু করি।'

কিশোর বলল, 'অত তাড়াহুড়ো নেই আমাদের। ধীরেসুস্থে করব। শরীরটা একেবারে জমে আছে। আগে গোসল করব, নাস্তা করব, তারপর অন্য কাজ। চলো, ওঠো।'

বাইরে উজ্জ্বল রোদ। ডোবার দিকে চলল তিন গোয়েন্দা। খুশিমনে লেজ নাড়তে নাড়তে ওদের সঙ্গে চলল চিতা।

দূর থেকে দেখল ওরা, পানিতে মুখ ডুবিয়ে আরাম করে ভেসে রয়েছে সেই

আজব ছেলেটা।

'রনি,' হাত তুলে দেখাল রবিন।

'এখন জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলে দেবে আরেক নাম,' মুসা বলল। 'ওর তো মতিগতির কোন ঠিক নেই।'

পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। দেখে হাত নাড়ল ছেলেটা।

ডেকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'তোমার নাম রনি তো?'

অবাক হলো রনি। 'নিশ্চয়। নাম কি রোজ রোজ পাল্টায় নাকি মানুষ? গোসল করতে এলে?'

'হ্যাঁ।'

পানিতে নামল তিন গোয়েন্দা। অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে, কয়েক ডজন করে ডুব দিয়ে, চোখ লাল করে তারপর উঠল পানি থেকে। শরীরের জড়তা একেবারে কেটে গেছে।

পাড়ে উঠে বসল গা শুকানোর জন্যে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রনি, কাল রাতে অদ্ভুত কিছু দেখেছ?'

মাথা নাড়ল রনি, 'না। তবে একটা চিৎকার শুনেছি। অনেকক্ষণ ধরে হয়েছে। কিসের বুঝতে পারিনি। পাহাড়ী এলাকায় নানা রকম বিচিত্র শব্দ অবশ্য হয়, সেটা বাতাসের জন্যে।'

ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে বেরোল চিতা আর বার্ক। নিশ্চয় খরগোশ তাড়া করে ঢুকে পড়েছিল।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কিশোর বলল, 'আমরা শব্দও শুনেছি, আজব আলোও দেখেছি।'

কি কি দেখেছে রনিকে জানাল গোয়েন্দারা।

মাথা ঝাঁকিয়ে রনি বলল, 'তাই তো, বাতাসে করেছে বলে তো মনে হয় না।'

ব্যাপারটা নিয়ে আরও কয়েক মিনিট আলোচনা করল ওরা।

অবশেষে মুসা বলল, 'আমি আর থাকতে পারছি না। খিদে। কিশোর, চলো।'

'চলো।'

রনিকে গুডবাই জানিয়ে কটেজে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা।

ফেরার পথে রবিন বলল, 'আজ আবার ভাল লাগল ছেলেটাকে। হাসিখুশি, সুন্দর ব্যবহার। অথচ মাঝে মাঝে যেন কেমন হয়ে যায়!'

'একটা রোগের কথা ভাবছি আমি,' কিশোর বলল। 'এক ধরনের হিস্টিরিয়ায় ভোগে এই রোগী। বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে চলে যায়। সেটা কয়েক মিনিটের জন্যেও হতে পারে, কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে। এই সময়টাতে উল্টোপাল্টা আচরণ করে রোগী। অতি পরিচিত জনকেও অনেক সময় চিনতে পারে না। কেউ প্রলাপ বকে, কেউ ঝিম মেরে পড়ে থাকে, কেউ আবার স্বাভাবিক থাকে—অন্তত দেখলে মনে হয় স্বাভাবিক, কিন্তু আসলে স্বাভাবিক নয়। পরে সুস্থ হওয়ার পর আর মনে থাকে না সে-কথা। স্মৃতি থেকে চিরতরে মুছে যায় ওই সময়টা। ছেলেটার অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে ওই রোগের লক্ষণ অনেকখানিই মিলে যায়।'

কথা বলতে বলতে কটেজে পৌঁছল ওরা। কাপড় বদলে নাস্তা খেয়ে নিয়ে আবার বেরোল। আলো দেখা গেছে যেখানে সেখানে চলে এল।

'এখান থেকেই হয়েছে শব্দটা,' কয়েকটা ওক গাছের একটা জটলার কাছে দাঁড়িয়ে বলল কিশোর। 'আলোও এখানেই দেখা গেছে। অনেকটাই ওপরে,' হাত তুলে দেখাল সে।

'অবাক কাণ্ড, তাই না?' মুসা বলল।

'কিশোর,' রবিন বলল, 'এই গাছের ওপরে উঠে আলো দেখাতে পারে। শব্দও করা যেতে পারে। পারে না?'

গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। হাসল হঠাৎ। 'ঠিক বলেছ, এটাই জবাব! ওখানেই উঠেছিল, অন্তত দুজন। সাইরেন জাতীয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ করেছে। আলো দেখানোটাও সহজ। বাজি পুড়িয়ে ওরকম রঙিন আলো সৃষ্টি করা যায়। নীল আর সবুজ আলো তৈরি করেছে বাজি পুড়িয়ে। সাদা আলোটা স্রেফ ব্যাগ।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'সাদা ব্যাগের মধ্যে হালকা গ্যাস ভরে দিলেই সেটা উড়তে থাকবে। খোলা মুখটা থাকবে নিচের দিকে। মোম জ্বেলে সেখানে আটকে দিলেই ব্যাগের ভেতরটা আলোকিত করে দেবে। দূর থেকে মনে হবে অদ্ভুত একটা সাদা আলো উড়ে যাচ্ছে।'

'এবং অন্ধকার রাতে কেউ দেখলে ভয়ে প্যান্ট খারাপ করে ফেলবে,' হেসে বলল মুসা।

'তুমি করেছিলে নাকি?' হাসল রবিন।

মুসার হাসিটা চওড়া হলো। 'করিনি। তবে আরেকটু হলেই করতাম।'

'ভূতের আলোর জবাব তো পেলে?' ভুরু নাচিয়ে বলল কিশোর।

'পেলাম,' নিচের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'এটা কি?' নিচু হয়ে একটুকরো রঙিন প্লাস্টিক কুড়িয়ে নিল সে।

'দেখি?' জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখল কিশোর। শুঁকল। 'হুঁ, আরও শিওর হয়ে গেলাম। দেখো, বারুদের গন্ধ। বাজির খোসা এটা।'

রবিন আর মুসাও শুঁকে দেখল এক এক করে। চিতাও শুঁকতে চাইল। টুকরোটা মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে মুসা বলল, 'শোঁক, ভাল করে শোঁক। এই গন্ধ লেগে থাকা লোক খুঁজবি এখন থেকে। যাকে পাবি তাকেই ধরবি।'

'যা-ই বলো, বুদ্ধিটা ভালই করেছিল,' রবিন বলল। 'কিন্তু কাজে লাগল না।'

'লাগবে,' পলকে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে।

'লাগবে মানে? ভয় তো পাইনি আমরা। এই কিশোর?' ধাক্কা দিল মুসা।

'উঁ?...কে বলল ভয় পাইনি?'

'শুধু আমি পেয়েছি। রবিন কিছুটা পেয়েছে। তুমি একেবারেই পাওনি।'

'পেয়েছি।'

'কি যা তা বলছ?'

'যা তা নয়। পেয়েছি। এবং পালাবও আমরা।'
'দোহাই তোমার, কিশোর, সহজ করে বলো।'
'সহজেই তো বললাম। ভয়ে পালাব আমরা। বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে চলে যাব কটেজ থেকে।'
হাঁ করে আছে মুসা।
রবিন বুঝে ফেলল। তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'বুঝেছি! ওদেরকে বোঝাব, আমরা চলে গেছি। কিন্তু আসলে যাব না। লুকিয়ে ফিরে আসব। চোখ রাখব কটেজের ওপর। এই তো?'
'হ্যাঁ, আজ রাতেই করব সেটা।'

বারো

বিকেল বেলা মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে কটেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।
'আমাদের ওপর চোখ রাখা হচ্ছে,' মুসা বলল। 'চলে যাচ্ছি দেখলে খুশি হবে।'
'কি করে রাখছে?' চারপাশে তাকাল রবিন। 'কেউ লুকিয়ে থাকলে কুকুরটা টের পেয়ে যেত।'
'অনেক দূরে রয়েছে ও। চিতার নাকের আওতার বাইরে।'
'তাহলে দেখছে কি করে?'
'দূরবীণ যন্ত্রটার নাম নিশ্চয় শুনেছ তুমি। একটা পাহাড়ের ওপর বসে আছে সে...'
তাকাতে গেল রবিন। তাড়াতাড়ি বাধা দিল কিশোর, 'না না, তাকাবে না। ওকে বুঝতে দেয়া চলবে না আমরা টের পেয়ে গেছি। মুসা, কি করে বুঝলে সে আছে?'
'কাচে আলো পড়ে ঝিক করে উঠছে। দূরবীণের চোখে।'
ক্যাম্পে এসে তাঁবু গুটিয়ে নিল ওরা। ঝোপের মধ্যে সাইকেলটা লুকিয়ে রেখেছিল মুসা, বের করে ভারি মালপত্র তুলে নিতে লাগল ক্যারিয়ারে। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে করছে এসব, যাতে পাহাড়ে বসা লোকটা দেখতে পারে।
রবিন বলে উঠল হঠাৎ, 'দেখো, একজন মহিলা আসছে।'
ফিরে তাকাল অন্য দুজন।
দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছে মহিলা। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় গাঁয়ের অধিবাসী। শাল দিয়ে মাথা ঢাকা, হাতে একটা ঝুড়ি। চোখে শস্তা চশমা। মেকাপ-টেকাপ নেই। চুলগুলো পেছন দিকে টেনে বাঁধা।
ছেলেদের দেখে এগিয়ে এল।
'গুড আফটারনুন,' ভদ্রকণ্ঠে বলল কিশোর। 'আবহাওয়াটা খুব ভাল, তাই না?'
'খুব সুন্দর,' মহিলা বলল। 'ক্যাম্পিঙে বেরিয়েছ বুঝি? ভাল সময়ে বেরিয়েছ।'

'বেরিয়েছিলাম। এখন চলে যাচ্ছি। ওদিকে একটা পোড়ো বাড়ি আছে না, পুরানো কটেজ, তাতে ঘুমিয়েছিলাম রাতে। বাপরে বাপ, থাকার জো নেই।'

'কেন, ভূত দেখেছ বুঝি?'

'কি যে দেখলাম কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

'শুনেছি আমিও। ওই বাড়িতে নাকি রাতে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে। কখনও অবশ্য নিজের চোখে দেখিনি।'

'আমরা দেখেছি। ভূতুড়ে ব্যাপার। নানা রকম আলো, চিৎকার, রাত দুপুরে তুফানের সময় জানালায় উঁকি দেয় মানুষের মুখ...' শিউরে উঠল কিশোর।

'তাই নাকি? সাংঘাতিক ব্যাপার। তা যাচ্ছ কোথায়?'

'বাড়িতে। রকি বীচ। চেনেন?'

'চিনি। খুব সুন্দর জায়গা। আবহাওয়া কিন্তু ভালই ছিল। থেকে গেলে পারতে।'

'মাথা খারাপ! আর একটা রাতও না। এমন ভূত জনমে দেখিনি।'

'ভয় পেলে তো আর থাকা চলে না। এসব এলাকায় থাকতে সাহস দরকার। আচ্ছা, যাই, কাজ পড়ে আছে। গুড-বাই।'

তাড়াহুড়া করে চলে গেল মহিলা।

'মালপত্র গোছাও,' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'পাহাড়ের দিকে তাকিয়ো না। এখনও আছে সে।'

'কিশোর,' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'মহিলার সঙ্গে এভাবে কথা বললে কেন?'

'কারণ সে ওদেরই চর। তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখোনি?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না।'

'গ্রামবাসীর অভিনয় করেছে বটে, কিন্তু মোটেও গাঁয়ের লোক নয়।'

'সন্দেহটা কেন হলো তোমার? সবই তো ঠিক আছে! মুখে মেকাপ নেই, মাথায় পুরানো শাল, কটেজটার ব্যাপারে সব জানে...'

'মুসা, গাঁয়ের মহিলারা কখনও সোনার দাঁত লাগায় না। হাসার সময় খেয়াল করোনি তার সোনার দাঁত ছিল?'

'করেছি,' জবাব দিল রবিন।

'পরচুলা পরে এসেছে, সেটা খেয়াল করেছ? তাড়াহুড়ায় ঠিকমত পরতে পারেনি। কালো চুলের নিচে লালচে চুলের গোড়া দেখেছি আমি। ভালমত ঢেকে আসেনি।'

'আরেকটা ব্যাপার!' উত্তেজিত হয়ে পড়েছে রবিন, 'গাঁয়ের মহিলাদের মত করে কথা বলতে চেষ্টা করেছে। পারেনি। কখনও শুদ্ধ, কখনও অশুদ্ধ হয়ে গেছে। টানও অন্য রকম।'

'আমি একটা গাধা!' কপাল চাপড়াল মুসা। 'এত কিছু খেয়াল করেছ তোমরা, অথচ আমি কিচ্ছু দেখিনি!'

'কাল রাতে যারা ভয় দেখাতে চেয়েছে আমাদের, মহিলা তাদের দলের লোক। আমাদের জিনিসপত্র গোছাতে দেখে জানতে এসেছে সত্যিই আমরা চলে

যাচ্ছি কিনা।'

'জানিয়ে তো দিয়েছ ভাল করেই,' হাসল মুসা। 'ওরা কি আর জানে, কার পাল্লায় পড়েছে।'

যাতে পড়ে না যায়, সে জন্যে দড়ি দিয়ে শক্ত করে ক্যারিয়ারে মালপত্র বাঁধা হয়েছে। দড়ির শেষ গিঁটটা দিয়ে বলল কিশোর। 'যাব কোথায় বলতে পারো? কোথায় লুকাব?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মুসা। চুটকি বাজাল, 'জানি। ঝর্নার বেশ খানিকটা ভাটিতে বিশাল এক ঝোপ আছে। ঢুকেছি ওর মধ্যে। বাইরেটা খুব ঘন, ভেতরে খোলা, অনেকটা গুহার মত। ঝোপের গুহা বলতে পারো।'

'তাহলে ওখানেই যাব। চলো।'

পাহাড়ের দিকে তাকাল মুসা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল দুই সেকেণ্ড। বলল, 'চলে গেছে লোকটা। আমরা তো এখনও যাইনি?'

হাসল কিশোর। 'আর দরকার কি থাকার? মহিলা গিয়ে সব বলেছে। জেনেই তো গেল, আমরা চলে যাচ্ছি। খুব একচোট হেসেছে ওরা।'

'এবার আমরা হাসব,' বলল রবিন।

কিছু মাল হাতে, কিছু পিঠে বাঁধা ব্যাকপ্যাকে, কিছু সাইকেলের ক্যারিয়ারে নিয়ে রওনা হলো ওরা। ঝর্নার ভাটিতে সেই জায়গাটায় পৌঁছতে দেরি হলো না। প্রয়োজন নেই, তবু আরেকবার পাহাড়ের দিকে তাকাল কিশোর, সাবধানের মার নেই। এখান থেকে গাছপালার জন্যে দেখা যায় না চূড়াটা। নজর রাখার জন্যে লোকটা যদি আবার ফিরেও আসে তাহলেও আর দেখতে পাবে না ওদের।

ঝোপটা খুব পছন্দ হলো কিশোরের। ভেতরটা সত্যিই সুন্দর। দুপুরে বাইরে যখন কড়া রোদ, তখনও নিশ্চয় এর ভেতরে ছায়া থাকে। খুব আরাম। নিচে বিছিয়ে আছে ঝরা-পাতা। তার ওপর আর কিছু পাতা ছড়িয়ে নিলেই বিছানা হয়ে যায়।

এত ঘন, ঢোকাই কঠিন। এক দিকের ডালপাতা কিছু সরিয়ে সরু একটা সুড়ঙ্গমত করে নেয়া হলো। প্রবেশ পথ। তিন গোয়েন্দা ঢুকতে পারল, সমস্যা হলো কুকুরটাকে নিয়ে। গলায় এত বড় কলার নিয়ে কিছুতেই ঢুকতে পারল না। কিন্তু ওকে বাইরে রাখাও উচিত না।

'কানটা দেখো,' কিশোর বলল, 'ঘায়ের কি অবস্থা? তাহলে খুলে ফেলো হার্ডবোর্ড।'

টিপেটুপে দেখল মুসা। রা-শব্দ করল না কুকুরটা। তারমানে তেমন ব্যথা পাচ্ছে না। 'মনে হয় ভালই।'

'খুলে ফেলো।'

জোড়ার সেলাইগুলো কেটে দিয়ে কলারটা খুলে ফেলল মুসা। খুলেই হা-হা করে হাসতে লাগল। কুকুরটাকে বলল, 'কেমন লাগছে তোকে, জানিস? বড় করে গোঁফ রেখে কামিয়ে ফেলার পর যেমন লাগে, বেড়ালের পাছার মত, তেমন। হা-হা-হা!'

কিশোর আর রবিনও হাসতে লাগল।

কিছুই না বুঝে 'খউ! খউ!' করে ডাক ছেড়ে দুবার কুকুরে-হাসি হাসল চিতা। এত জোরে লেজ নাড়ছে, ঝড় উঠেছে যেন শরীরের পেছনটায়, ভীষণভাবে আন্দোলিত হচ্ছে।

তেরো

বাইরে আঁধার নামছে। ঝোপের ভেতর তো এখনই ঘুটঘুটে অন্ধকার। মোম জ্বালানো নিরাপদ না এখানে, আগুন লেগে যেতে পারে। টর্চ আছে তিনজনেরই, কিন্তু ব্যাটারি বাঁচানোর জন্যে কেবল একটা টর্চ জ্বালানো হয়েছে।

খেতে বসেছে ওরা। সঙ্গে করে আনা খাবার প্রায় শেষ। টেনেটুনে আর একদিন চলতে পারে।

তবে খাবার নিয়ে ভাবনা নেই ওদের। শেষ হলে আবার গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে।

খাওয়া শেষ হলো।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এখনই যাব?'

'আরও কিছুক্ষণ পর,' জবাব দিল কিশোর। 'এত তাড়াতাড়ি বোধহয় আসবে না ওরা। রাত হলেই আসবে। সাবধানী লোক।'

'তাহলে আগেই গিয়ে বসে থাকা দরকার।'

রবিন বলল, 'কুকুরটাকে নিয়ে সমস্যা হবে। যদি চুপ না থাকে, লোকগুলোকে দেখলেই চেঁচানো শুরু করে, এত কষ্ট তাহলে সব মাটি।'

'ভাল কথা মনে করেছ,' কিশোর বলল, 'ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'কিন্তু একাও তো থাকতে চাইবে না,' মুসা বলল। 'আমরা বেরোলেই পিছু নেবে। বেঁধে রেখে যাওয়াও অমানবিক হয়ে যাবে।'

'এবং তখনও চেঁচাবে। মুসা, এক কাজ করো, তুমিও থেকে যাও। যাব তো দেখতে, চোর ধরতে নয়, বেশি লোক দরকার নেই। বেশি গেলে বরং ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।'

'আমি থাকব!' থাকার ইচ্ছে নেই মুসার।

'আর কোন উপায় তো দেখছি না।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হলো মুসাকে।

রসিকতা করল রবিন, 'কেন, ভালই তো হলো। ভূতুড়ে বাড়িতেও যেতে হলো না, ভূতের ভয়ও করতে হলো না। এখানেই শান্তি।'

'ভয় এখানেও আছে,' কিশোর বলল।

চমকে গেল মুসা, 'মানে?'

'না না, ভূতের কথা বলছি না। বাস্তব জিনিস। কালো কালো শুঁয়াপোকা, লোম লাগলে চুলকাতে চুলকাতে মরবে। পায়ে এসে বসতে পারে শজারু, কাঁটা ফুটিয়ে দিতে পারে। তবে বেশি ভয় হলো সাপের। যদি কোন র‍্যাট্‌ল্‌ উত্তাপ খুঁজতে এসে তোমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ে…'

'হয়েছে, হয়েছে,' হাত নাড়ল মুসা, 'এসবের পরোয়া আমি করি না। যেতে হবে, যাও, আমি একলা থাকতে পারব।'

হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর ও রবিন। পেছন পেছন কুকুরটাও রওনা হলো, ডেকে তাকে ফেরাল মুসা।

বাইরে ভীষণ অন্ধকার। তবু টর্চ জ্বালল না দুই গোয়েন্দা। কোনমতেই পড়তে চায় না কারও চোখে। চেনা পথ। হাঁটতে খুব একটা অসুবিধে হলো না।

কোথায় লুকাবে আগেই ঠিক করে রেখেছে। ওপরতলায়। যতটা মনে হয়, লোকগুলো খুঁজবে নিচতলায়, ওপরে উঠবে না। সুতরাং ওখানেই ওরা নিরাপদ।

পা টিপে টিপে কটেজে ঢুকল দুজনে। কোন সাড়াশব্দ নেই। লোকগুলো আসেনি এখনও। নিঃশব্দে উঠে এল দোতলায়। একটা ভাঙা দেয়ালের গা ঘেঁষে পড়ে আছে কতগুলো ইঁট, দেয়ালটা থেকেই খুলে পড়ে স্তূপ হয়ে আছে। তার ওপর বসল ওরা। এবার অপেক্ষার পালা। কথা বলার জো নেই। কে কোনখান থেকে শুনে ফেলে। কাজেই একদম চুপ।

কাটছে সময়, খুব ধীরে। উষ্ণ কোমল মৃদু বাতাস এসে লাগছে গায়ে। সব কিছু নীরব, সব স্থির, কেবল রোজ-র‍্যাম্বলারের পাতাগুলো ছাড়া। বাতাসে সড়সড় করছে ওগুলো।

পৌনে এক ঘণ্টা বসে থাকার পর রবিনের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিল কিশোর, ফিসফিস করে বলল, 'আসছে!'

ভাঙা দেয়ালের ফোকর দিয়ে বাইরে তাকাল রবিন। দূরে টর্চের আলো চোখে পড়ল। অন্ধকারের কালো চাদরে যেন একটা সাদা ফুল। এগিয়ে আসতে লাগল ফুলটা। নাচছে হাঁটার তালে তালে।

আরও কাছে এল টর্চের আলো। এখন আর একটা নয়, তিনটে।

কটেজে এসে ঢুকল লোকগুলো। তিনজন ছড়িয়ে পড়ল তিনদিকে।

'ওপরে না এলেই হয়,' রবিন বলল।

'বলা যায় না। আসতেও পারে। চলো, চিমনিটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ি।'

নিঃশব্দে উঠে সরে যেতে লাগল দুজনে। খুব সাবধান। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে রোজ-র‍্যাম্বলার। চিমনির কাছেও আছে। ওগুলোতে লাগলে শব্দ তো হবেই, কাঁটা ফোটারও ভয়। ওঠার সময়ই একবার হাতের আঙুলে ফুটেছে রবিনের, রক্ত বন্ধ করার জন্যে আঙুল চুষতে হয়েছে তাকে।

চিমনি মানে চিমনির অবশিষ্ট। ভাঙা একটা ফানেল। তবে বাকি যা আছে এখনও, অনেক বড়। তারাজ্বলা আকাশের পটভূমিতে কালো একটা ছায়া। ওটার গা ঘেঁষে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। এখান থেকে সিঁড়িটা বেশ দূরে।

'বললাম না আসবে!' ভয় পেয়ে গেছে রবিন। বুক কাঁপছে। 'ইস্, একটা কাঁটা যদি ফুটত…'

'চুপ!'

'উহ্!' করে উঠল একটা কণ্ঠ। সত্যিই কাঁটা ফুটেছে লোকটার গায়ে। চেঁচিয়ে বলল, 'এই যন্ত্রণা যে কেন লাগিয়েছিল! যত্তসব!'

টর্চ জ্বলে উঠল সিঁড়িতে। কাঁটা ফোটাতেই বোধহয়, সতর্কতা নষ্ট হয়ে গেল লোকটার। ওপরতলার ঘরগুলোতে একবার আলো ফেলেই ফিরে চলল। চিমনির কাছে এল না।

সিঁড়ির নিচে তার কথা শোনা গেল, 'কেউ নেই। ছেলেগুলো সত্যিই চলে গেছে।'

হাঁপ ছাড়ল দুই গোয়েন্দা। যাক, বাঁচা গেল! আপাতত এখানে আর কারও আসার সম্ভাবনা নেই।

নিচে কথা বলছে তিনজন মানুষ, তাদের মধ্যে একজন মহিলা। কণ্ঠটা চিনতে পারল দুজনেই, বিকেলে ও-ই এসেছিল ওদের সঙ্গে কথা বলতে।

'নিক, কোনখান থেকে শুরু করব?' জিজ্ঞেস করল কাঁটা ফুটেছে যার, সেই লোকটা।

'এই নাও, নকশা,' জবাব দিল নিক। গলার স্বর অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে, যেন কণ্ঠনালী চেপে ধরা হয়েছে।

চিমনির কাছ থেকে সরে এল কিশোর। আস্তে করে এসে উঁকি দিল সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে।

দুটো লণ্ঠন জ্বালানো হলো। একটা কাগজ মাটিতে বিছিয়ে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে তিনজনে। গভীর মনোযোগে দেখছে।

'একটা জিনিস বুঝতে পারছি, সাদা পাথরের নিচে খুঁজতে হবে আমাদের। পাথরটার সাইজও জানি। কিন্তু কোন জায়গায় আছে ওটা, বলা হয়নি। কম জায়গায় তো আর দেখলাম না। মাটি খুঁড়ছে ছেলেটা যে জায়গায়, ওখানেও বাদ নেই...তাহলে?'

রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে কিশোরের পাশে। আস্তে খোঁচা দিল কিশোরের গায়ে। ইঙ্গিতে যেন প্রশ্ন করতে চাইল, সাদা পাথরের নিচে কি জিনিস খুঁজছে ওরা?

আঁচ করতে পারল মুহূর্ত পরেই। ঘড়ঘড়ে-কণ্ঠ, অর্থাৎ নিক বলল, 'দরকার হলে এই এলাকার সমস্ত সাদা পাথরের তলায় খুঁজব। ওটা না নিয়ে যাচ্ছি না আমি। তার জন্যে এই বাড়িটা যদি ধসিয়ে দিতে হয়, তা-ও দেব। নইলে আমাদের ছাড়বে না বস্‌।'

'যত নষ্টের মূল ওই বোথামটা। সে করল চুরি, আমাদের ফেলল বিপদে। আর ফেললি যখন, ভাল করে লিখে দে...'

'কি করে দেবে? মাথাই তো খারাপ। হাতও যে পরিমাণ কাঁপে, দেখলে বুঝতে।'

'সব তার দোষ। জেল থেকে পালাতে গেল কেন? গেল বলেই মাথায় গুলি খেলো। পাগলও হলো। আর কদিন পরে তো এমনিতেই ছাড়া পেয়ে যেত।'

'বেচারার দুর্ভাগ্য। মাথায় ভূত চাপে বলে একটা কথা আছে না। তার হয়েছিল সেই অবস্থা...যাকগে, আমাদের এখন ওসব ভেবে লাভ নেই। জিনিসটা বের করতে হবে, নইলে আমাদের কপালেও দুঃখ আছে।'

'কিন্তু কি করব, বলো? মানেই তো বুঝি না। এই শব্দটার মানে কি? এই যে

ডব্লিউ-এ-ডি-ই-আর?'

'ওয়াডার? দূর, এর কোন মানে নেই। তবে মাঝের ডি-টা বদলে টি করে নিলেই মানে হয়ে যায়। ওয়াটার। এখানে ওয়াটার, অর্থাৎ পানি কোথায় আছে? সাদা পাথরের নিচে? একমাত্র রান্নাঘরে, হ্যাণ্ডপাম্পটার নিচে। কুয়োটাতে।'

কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন।

চোদ্দ

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, ফোঁস-ফোঁস, নানা রকম শব্দ হচ্ছে নিচতলায়। বিশাল পাথর তোলার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে লোকগুলো।

'জাহান্নামে যাক! পাথর না পাহাড়!' বলল ঘড়ঘড়ে কণ্ঠ। 'জেরি, দেখি শাবলটা আমার হাতে দাও। তুমি তো কিছুই করছ না।'

আরও কয়েক মিনিটের অবিরাম চেষ্টার পর পাথরটা তোলা সম্ভব হলো। দড়াম করে কাত হয়ে পড়ল একপাশে। কেঁপে উঠল বাড়িটা, মনে হলো ধসে পড়বে।

উত্তেজনায় কাঁপছে দুই গোয়েন্দা। চোরেরা কি পেয়েছে দেখার জন্যে অস্থির। কিন্তু তা তো আর পারবে না। ওদের কথা শুনেই বুঝতে হবে জিনিসটা কি?

মহিলা বলে উঠল, 'এ-কি! এখনও অনেক পানি!'

টর্চের আলোয় তিনজনেই দেখল কিছুক্ষণ। তারপর হতাশ কণ্ঠে জেরি বলল, 'নাহ্, এটা সুড়ঙ্গপথ হতেই পারে না। এখান দিয়ে কেউ কোথাও যেতে পারবে না। অতি সাধারণ একটা কুয়া।'

'কি যে বিপদে পড়লাম!' মহাবিরক্ত হয়ে বলল মহিলা। 'এটা নকশা, না ধাঁধা! ওর বাপের মাথা লিখেছে, চোরের বাচ্চা চোর! যেটা হজম করতে পারবি না, গেলি কেন চুরি করতে!'

'এই মাপের সাদা পাথর এখানে যা আছে সবগুলো উল্টে দেখতে হবে,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল নিক।

'সেটা কি সম্ভব?' জেরি বলল, 'তেমন এক ডজন পাথর আছে এখানে।'

'সম্ভব করতে হবে, মরতে না চাইলে। আমরা পাইনি, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না বস্। ভাববে, পেয়েও লুকিয়ে রেখেছি, বেশি টাকার জন্যে। মুখ খোলানোর জন্যে মারতে মারতেই মেরে ফেলবে তখন।'

'ইস্,' মহিলা বলল, 'ভালই ছিলাম, কেন যে এত টাকার লোভ করতে গেলাম!'

'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না,' বলল জেরি।

খেঁকিয়ে উঠল নিক, 'রাখো তোমার ওসব নীতিকথা। ভাল্লাগে না। এসো, হাত লাগাও। এই পাথরটাও এই মাপের।'

একের পর এক পাথর উল্টে চলল চোরেরা। ওদের মত দৈহিক কষ্ট না হলেও উত্তেজনা কম হচ্ছে না গোয়েন্দাদের। স্নায়ু টান টান করে অপেক্ষা করছে ওরা, কখন শুনবে উল্লাস-ভরা চিৎকার।

কিন্তু সেই চিৎকার আর শুনল না। বার বার কেবল হতাশার কথা।

একটা ব্যাপারে ভুল করেছে জেরি। তেমন পাথর এক ডজন নয়, মাত্র চারটা। সবগুলোর নিচেই খুঁজে দেখা হলো। কিন্তু পেল না ওদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা।

শেষ পাথরটা তোলার পর এমন জোরে চিৎকার করল জেরি, গোয়েন্দারা মনে করল পেয়ে গেছে। কি পেয়েছে দেখার জন্যে সরতে গিয়ে একটা লতায় পা বাধিয়ে শব্দ করে ফেলল কিশোর।

কানে গেল এক চোরের। চেঁচিয়ে উঠল, 'কে? কে শব্দ করে?'

শক্ত হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর মহিলা বলল, 'হবে ছুঁচোটুঁচো কিছু। কিংবা ভুল শুনেছ। শোনারই কথা। যা পরিশ্রম হয়েছে!'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গোয়েন্দারা। বড় বাঁচা বেঁচেছে।

'এখানে নেই ওটা,' নিক বলল। 'ওই ক্যাম্পের কাছটাতেই গিয়ে আরও ভালমত খুঁজতে হবে। ওখানেই কোথাও আছে।'

'কিন্তু ওখানে আর কোথায় খুঁজব? কোন জায়গা তো বাকি রাখিনি।'

'আছে, বাকি আছে। ট্রেঞ্চের কাছের গর্তটা, যেটাতে কিছু নেই ভেবে নামিনি আমরা...'

'কিন্তু ছেলেটা যে সরে না,' জেরি বলল। 'ওই গর্তে খুঁজতে হলে অনেক সময় দরকার। আটঘাট বেঁধে যেতে হবে। তাতে সন্দেহ হতে পারে ওর। গিয়ে লোকজনকে বলে দিতে পারে।'

'ওকে সরাতে হবে। সোজা আঙুলে না হলে, আঙুল বাঁকা করে।'

অন্ধকারে ভ্রূকুটি করল কিশোর। রনির বিপদ বুঝতে পারছে। পারছে রবিনও। কিশোরের হাত চেপে ধরল।

'চলো,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মহিলা, 'এই ভূতের বাড়ি থেকে বেরোই। শুধু শুধু কষ্ট করলাম। নিক, আজ আর কোথাও খুঁজতে পারব না, বুঝলে। কাল।'

বেরিয়ে গেল লোকগুলো।

ভাঙা দেয়ালের ফোকর দিয়ে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা।

ধীরে ধীরে মাঠ ধরে গিয়ে ঝোপের ওপাশে হারিয়ে গেল টর্চের আলো। তার পরেও আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা।

'আর থেকে কি করব?' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, চলো আমরাও যাই। ভোরবেলা গিয়ে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে রনিকে।'

সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে আরেকবার লতায় পা জড়াল রবিন। পড়ে যাচ্ছিল, কিশোরকে ধরে সামলাতে গিয়ে তাকেও ফেলে দিচ্ছিল আরেকটু হলে।

'কি হলো?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল কিশোর।

'কি আর! হতচ্ছাড়া রোজ-র‍্যাম্বলারের কাঁটা। এহ্, গোড়ালিটাই বুঝি গেল!'

টর্চ জ্বেলে দেখা গেল, কাঁটার খোঁচায় কয়েক জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। সাংঘাতিক কিছু না।

'জঘন্য কাঁটা!' কিশোর বলল। 'দেখেশুনে পা ফেলতে পারো না।'

কটেজের বাইরে বেরোল ওরা। হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, 'কি জিনিস এখনও কিন্তু জানলাম না আমরা। শুধু জানলাম, একটা বিশেষ মাপের পাথরের নিচে আছে ওটা এবং সেখানে পানি আছে। পাথরটার মাপ পেলে হত, দিনের বেলা আমরাও খুঁজতে পারতাম।'

'মাপের আর অসুবিধে কি? অনেকগুলো পাথর উল্টেছে ওরা। যে কোন একটা মেপে নিলেই হয়।'

'তাই তো! এই সহজ কথাটা মাথায় ঢুকল না! মাঝে মাঝে এমন বোকা হয়ে যায় না মানুষ···'

ঝোপের কাছাকাছি হতেই ভেতর থেকে চিতার ডাক শোনা গেল। খানিক পরেই সুড়ঙ্গমুখে উঁকি দিল মুসার মাথা। 'কে? কিশোর, তোমরা?'

'হ্যাঁ।'

'এলে তাহলে। আমার তো মনে হচ্ছিল, কত শত বছর কেটে গেছে।···তো, কি হলো? এসেছিল ওরা? কিছু পেয়েছে?'

'ভেতরে চলো, বলছি।'

ঝোপের ভেতরে ঢুকে মুসাকে সব কথা জানাল কিশোর ও রবিন। রনি যে বিপদে পড়তে যাচ্ছে, একথাও বলল।

মুসা বলল, 'তাহলে তো ভারি মুশকিল। কি করা যায়?'

কিশোর বলল। 'ভোরে উঠেই দৌড় দেব। সাবধান করে দেব ওকে। অনেক রাত হয়েছে। এসো, শুয়ে পড়ি। নইলে সকাল সকাল উঠতে পারব না।'

কয়েক ঘণ্টা পর হঠাৎ চাপা গরগর শুরু করল চিতা।

ঘুম ভেঙে গেল মুসার। ঘুম-জড়িত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই, কি দেখলি আবার?'

গরগর করেই চলল কুকুরটা।

কিশোর আর রবিনও জেগে গেছে।

'কি দেখেছে?' কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করছে রবিন। 'আমি তো কিছুই শুনছি না।'

'তোমার কান কি আর ওর মত?'

'কিন্তু দেখল কি? এই মুসা, দেখবে নাকি?'

'এই অন্ধকারে আর কি দেখব? হবে হয়তো ছুঁচো, বেজি, কিংবা শজারু।'

কিন্তু ভুল করেছে মুসা, ঘন ঝোপের ভেতর গাঢ় অন্ধকার বটে, বাইরে ভোর হচ্ছে। ফর্সা হয়ে গেছে পুবের আকাশ।

অবশেষে গরগর থামাল চিতা। ছড়ানো দুই থাবার মাঝে থুতনি গুঁজে দিল। যে জিনিসটা উত্তেজিত করেছিল তাকে, সেটা চলে গেছে।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

ঝোপের ভেতরের অন্ধকার কাটল।

এবারও মুসাই আগে জাগল। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'উফ্, মাটিতে শুয়ে গা একেবারে শক্ত হয়ে গেছে। আরও পুরু করে পাতা বিছানো দরকার

ছিল।'

চোখ মেলল কিশোর। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়েই লাফিয়ে উঠে বসল, 'সর্বনাশ! আটটা বাজে! রবিন, ওঠো, ওঠো!'

তাড়াহুড়ো করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল ওরা।

ক্যাম্পের কাছাকাছি আসতে ফোঁপানোর শব্দ শুনতে পেল।

অবাক হয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল ওরা। কাঁদে কে?

ট্রেঞ্চের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখা গেল রনিকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আশ্চর্য! কি হয়েছে ওর? এমন করছে কেন?

টপাটপ ট্রেঞ্চে লাফিয়ে নামল তিন গোয়েন্দা।

রনির পিঠে হাত রেখে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রনি, কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?'

'রনিকে ওরা নিয়ে গেছে!' বলল ছেলেটা। 'আর ফিরবে না সে, আমি জানি! ওকে ওরা মেরে ফেলবে!' হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে।

আরও অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

কিশোর বলল, 'নিয়ে গেছে মানে? রনি তো তুমিই!'

'না, আমি না! আমি ডনি!'

ভয় পেল কিশোর, পুরোপুরিই পাগল হয়ে গেছে ছেলেটা। মৃগী রোগীর মত ছটফট করছে। আলতো করে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কোমল গলায় বলল, 'তোমার শরীর খুব খারাপ। ভেব না, আমরা তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে বসল ছেলেটা। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি রনি নই, আমি ডনি! ডনি! আমরা যমজ!'

পুরো রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার কাছে। দুইবার দুইরকম আচরণ করেছে কেন 'ছেলেটা' তার সব জবাব পেয়ে গেল। পুরো এক মিনিট লাগল ওদের ধাতস্থ হতে।

বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'আমি একটা বলদ! খালি রোগের কথাই ভাবলাম, সহজ কথাটা মনে এল না...' ডনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা ভেবেছি তোমরা একজন।'

'না, দুজন,' চোখ মুছতে মুছতে বলল ডনি। 'এখানে এসে ঝগড়া করেছিলাম। আর যমজদের ঝগড়া যে কি জিনিস না দেখলে বুঝবে না। দু-চোখে দেখতে পারতাম না একজন আরেকজনকে। কেউ কারও ছায়া মাড়াতাম না। একসঙ্গে খাওয়া, বসা, ঘুম, কোনটাই হত না। ভীষণ শত্রুতা। এমনই অবস্থা হলো, ভাই যে আরেকজন আছে তা-ও মনে করতে চাইতাম না। কারও কাছে বলা তো দূরের কথা।'

'এইজন্যেই আমরা কিছু বুঝতে পারিনি,' মুসা বলল।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রনির কি হয়েছে খুলে বলো তো?'

'যমজদের ঝগড়া যেমন বেশি হয়, ভাবও হয় বেশি। কাল রাতে আমার সঙ্গে মিটমাট করতে গিয়েছিল রনি। কিন্তু আমি পাত্তাই দিলাম না। এক ঘুসি মেরে

ফেলে দিয়ে আরেক দিকে চলে গেলাম। তারপর মন নরম হয়ে গেল। ভোরবেলা উঠেই চলে এলাম তার সঙ্গে দেখা করতে…তারপর…' আবার ফুঁপিয়ে উঠল সে।

'হ্যাঁ, তারপর কি হলো বলো?' তাগাদা দিল কিশোর।

'দেখি দুটো লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। চিৎকার করছে, লাথি মারছে, ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে। তাড়াহুড়ো করে লাফিয়ে নামতে গিয়ে আমার পা গেল মচকে। রনিকে নিয়ে উঠে গেল ওরা।' আবার কেঁদে উঠল সে। 'আমার ভাইটাকে নিয়ে গেল, আমি কিছুই করতে পারলাম না! কেন যে ঝগড়া করলাম! একসঙ্গে থাকলে তো অনেক বল পেত ও…'

পনেরো

সবাই সান্ত্বনা দিতে লাগল ডনিকে।

হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসল মুসা। 'দেখি, তোমার পা-টা?'

গোড়ালির কাছে খানিকটা ছড়ে গেছে। ফুলে আছে। সেখানে টিপেটুপে দেখল। উহ্-আহ্ করল ডনি।

মুসা বলল, 'দেখো তো, হাঁটতে পারো নাকি?'

পারল ডনি। ততটা খোঁড়াতে হলো না।

'হুঁ, তেমন কিছু হয়নি: জলপট্টি দিলেই সেরে যাবে।' পকেট থেকে রুমাল বের করে দিল মুসা। 'নাও, গাল মুছে ফেলো।'

গাল মুছতে মুছতে ডনি বলল, 'রনিকে খুঁজে বের করতে পারবে তোমরা? ইস্, কেন যে ঝগড়া করতে গেলাম…'

হাত নাড়ল মুসা, 'থাক থাক, কান্না থামাও। খুঁজে ওকে বের করবই আমরা।'

কিশোর বলল, 'যা যা জানো, এখন বলো। দেখি কি করতে পারি।'

'আমার নাম ডোনাল্ড কুইলার। রনি আর আমার একই নেশা, মাটি খুঁড়ে পুরানো জিনিস বের করা। ছুটি পেলেই চলে আসি, খোঁড়াখুঁড়ি করি, প্রত্নতত্ত্বের ওপর পড়াশোনা করি।' তাকে সাজানো জিনিসগুলো দেখাল সে, 'এগুলো আমরা খুঁজে বের করেছি।'

ওই তাকে রাখা একটা পাত্রই সেদিন আরেকটু হলে ভেঙে ফেলছিল রবিন। 'আশ্চর্য! রনি তোমার কথা একটিবার উচ্চারণও করেনি। মানুষ বটে তোমরা! এমন ভাবে চুপ করে রইলে, আমরা বুঝতেই পারলাম না তোমরা একজন নও, দুজন।'

'ওই যে বললাম, ঝগড়া করেছি। যখন ভাল থাকি, দুনিয়ার সব চেয়ে বেশি ভালবাসি একজন আরেকজনকে, আবার যখন ঝগড়া করি…'

'লোকগুলোর কথা বলো,' কিশোর বলল। 'ওদেরকে চিনতে তোমরা?'

'ঠিক চিনতাম না। কয়েক দিন হলো এসেছে এই এলাকায়। রনিকে বলল সরে যেতে, কি নাকি খুঁজবে। রেগে গেল রনি। বলল, কিছুতেই সরবে না। ওরা বলল, জোর করে সরাবে। রনি বলল, কাছে এলে পাথর ছুঁড়ে ঘিলু বের করে দেবে। ও এমনিতে খুব ভাল, কিন্তু রেগে গেলে আর হুঁশ থাকে না।'

'ওই লোকগুলোই তাকে ধরে নিয়ে গেছে? তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ।'

'কোন দিকে গেছে বলতে পারবে না, না?'

'না।' বলেই আবার ফুঁপিয়ে উঠতে গেল ডনি।

তাড়াতাড়ি আবার হাত নেড়ে বলল মুসা, 'বললাম তো, কাঁদতে হবে না। ওকে আমরা বের করব।'

'আশপাশটা একবার খুঁজে দেখা দরকার,' কিশোর বলল। 'কোন সূত্র পাই কিনা দেখি। চিহ্নটিহ্ন হয়তো ফেলে গেছে।'

'গেছে তো অনেক আগে,' রবিন বলল। 'এখন কি আর পাওয়া যাবে? নিশ্চয় গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে বেচারাকে। এতক্ষণে বহুদূর চলে গেছে।'

'কিডন্যাপ করেছে!' ককিয়ে উঠল ডনি।

'করেছে,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে গাড়িতে করে নিয়ে গেছে বলে মনে হয় না। ওদের প্রয়োজন কিছু সময়ের জন্যে ওকে সরিয়ে রাখা। এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারে। রাখার জায়গার তো আর অভাব নেই। ঝোপ আছে, গুহা আছে...'

'চলো, এখানেই খুঁজে দেখি। না পাওয়া গেলে পরে দেখা যাবে,' মুসা বলল।

আশেপাশে যে কয়টা ট্রেঞ্চ, গর্ত, গুহামুখ, আর ঘন ঝোপ দেখল সবগুলোতে উঁকি দিয়ে দেখল ওরা। পেল না রনিকে। কোন দিকে নিয়ে গেছে, তারও কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না।

হাল ছেড়ে দিল কিশোর, 'নাহ্, হবে না এভাবে। বিশাল এলাকা। তার চেয়ে বরং নীচে চলে যাই, পুলিশকে খবর দিই।'

'আমিও একথাই ভাবছিলাম,' রবিন বলল।

'এসো, ডনি,' ডাকল মুসা। 'তোমারও যাওয়া দরকার। পুলিশকে বলতে পারবে সব। যাবে তো?'

'নিশ্চয়। রনিকে ফিরে পেতে সব করব আমি। আর কক্ষনো ঝগড়া করব না...'

ফুঁপিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ডনি, তাকে থামিয়ে দিল মুসা। 'থাক, থাক, কেঁদো না।' মনে মনে বলল, 'বাপরে বাপ, কত কাঁদতে পারে ছেলেটা! চোখের পানি মুছেই রুমাল ভিজিয়ে ফেলল!'

মলিন হাসি ফুটল ডনির মুখে।

ক্যাম্প এলাকা থেকে সরে এল তিন গোয়েন্দা। ডনিকে নিয়ে চলল তাদের ঝোপটার কাছে।

ভেতরে ঢুকে খাবারের টিনগুলোর ওপর চোখ পড়তে টের পেল, কতটা খিদে পেয়েছে।

'হায় হায়!' আঁতকে উঠল মুসা, 'নাস্তা যে করিনি এমন একটা কথা ভুলে থেকেছি এতক্ষণ! এসো, এসো, বসে যাও সব।'

রবিন বলল, 'খেয়ে শেষ করে ফেলাই ভাল। টিনগুলোর বোঝা বইতে হবে না আর তাহলে।'

ঝোপের ভেতর না বসে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। ঝলমলে রোদ। মাথার ওপর একটা পাখি শিস দিচ্ছে। সুন্দর সকাল। কিন্তু দেখার মন নেই কারোরই। ডনির মনে দুঃখ, তিন গোয়েন্দা উদ্বিগ্ন।

খেতে খেতে কিশোর বলল, 'সকালে চিতা যখন গরগর করছিল, তখন বেরোলেই হয়ে যেত। এপথ দিয়েই গেছে লোকগুলো। রনিকে বাঁচাতে পারতাম। পিছু নিয়ে অন্তত জানতে পারতাম, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'মুসাকে তো বলেছিলাম দেখতে,' রবিন বলল।

'আমি কি আর জানি, ওই বদমাশের দল যাচ্ছে!'

'যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আর ভেবে লাভ নেই। পানি আনা দরকার। আমিই যাই,' বলে আনারসের খালি টিনটা নিয়ে উঠল সে। ঝর্নায় চলল পানি আনতে।

কুলকুল করে বইছে ঝর্না। চমৎকার এই সকালে ভারি মিষ্টি লাগছে আওয়াজটা।

'পানি বওয়ার শব্দ সত্যিই ভাল,' ভাবতে ভাবতে চলেছে কিশোর। ঝর্নার কিনারে পৌঁছে নিচু হয়ে টিনে পানি ভরার সময় তাকাল বাঁকের দিকে। সাদা পাথরটায় চোখ পড়ল। হঠাৎ যেন ঘণ্টা বেজে উঠল মনের কোথাও। *পানি! ওয়াটার! ওয়াটার! পাথরের ফলক!* যে সাইজের পাথর উল্টে উল্টে দেখেছে চোরগুলো, এটাও তার সমান। পানিও আছে কাছে। তবে কি ওটার নিচেই লুকানো আছে সেই মহামূল্যবান জিনিস, যেটা এত খোঁজাখুঁজি করছে লোকগুলো?

টিনটা নিয়ে সোজা হলো সে। প্রায় দৌড়ে চলল ঝোপের দিকে।

তাকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে সবাই অবাক।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, কিশোর?'

'বোধহয় পেয়ে গেছি!'

'কী! রনিকে?'

'না। পাথরটা।'

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল রবিন, কোন পাথরটার কথা বলছে কিশোর। লাফিয়ে উঠল সে, 'কই? কোথায়?'

দল বেঁধে পাথরটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

মুসা বলল, 'সত্যি আছে তো এর নিচে?'

'না তুললে বুঝি কি করে?' কিশোর বলল, 'তবে আমার ধারণা, এটাই সেই পাথর। আকার, সাদা রঙ, পানি, সব মিলে যাচ্ছে।'

'তাহলে তো তোলা দরকার।'

অনেক টানাহেঁচড়া করল ওরা। নড়াতে পারল না। পাথরটা সাংঘাতিক ভারি, মাটিতে অনেকখানি দেবে আছে।

'একটা শাবল হলে ভাল হত,' কিশোর বলল। 'এমনি নড়াতে কষ্ট হবে।'

'ট্রেঞ্চে আছে,' ডনি বলল। 'দাঁড়াও, নিয়ে আসি।'

'তোমার পায়ে ব্যথা,' মুসা বলল। 'তাড়াতাড়ি করতে পারবে না। তুমি

থাকো, আমিই যাচ্ছি।'

দৌড় দিল সে।

কিসের পাথর, কেন সেটা তুলতে চায়, জানে না ডনি। সংক্ষেপে তাকে জানাল কিশোর ও রবিন। রনিকে কেন ধরে নিয়ে গেছে চোরেরা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো ডনির কাছে।

মুসা গেল তাড়াতাড়ি করার জন্যে, কিন্তু আসতে অনেক দেরি করতে লাগল। অনেকক্ষণ পর এল, তা-ও খালি হাতে।

'শাবল কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল মুসা, একটা শাবলও খুঁজে পায়নি। মাটি খোঁড়ার কোন যন্ত্রই নেই ট্রেঞ্চে।

'রনি হয়তো অন্য কোথাও রেখে গেছে,' কিশোর বলল।

'সবগুলো গর্তে খুঁজেছি। কোথাও নেই।'

'আশ্চর্য! কি করল?...ডনি, তুমি জানো?'

মাথা নাড়ল ডনি, 'না। গর্তেই তো ফেলে রাখে। কি করল? চুরি হয়ে গেল না তো?'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'পুরানো শাবল-বেলচাও চুরি হয় নাকি এখানে? এত ছ্যাঁচড়া চোরও আছে?'

গাল চুলকাল ডনি। 'তা তো জানি না। পাওয়া যখন যায়নি, চুরি ছাড়া আর কি হবে?'

'ওই তিন চোরই হয়তো নিয়েছে,' মুখ বাঁকাল রবিন। 'পাথর তুলে তুলে খোঁজে তো। শাবল ওদের দরকার। ও-ব্যাটারা ছাড়া আর কেউ না।'

'শাবল দরকার,' কিশোর বলল, 'কিন্তু বেলচাগুলো নয়। ওগুলো নেবে কে? আর কেনই বা নেবে?'

'কিশোর, মাটির নিচে গুপ্তধন খুঁজছে না তো কেউ? এখানে তো খালি খোঁজাখুঁজির কারবার।'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

'এ তো দেখি আরেক রহস্য!'

জিরানো হয়ে গেল মুসার।

কিশোর বলল, 'এসো, হাত লাগাও। শাবল ছাড়াই সরাব।'

অনেক কায়দা-কসরৎ, অনেক চাপাচাপি-ঠেলাঠেলির পর পাথরটা সরাতে পারল ওরা। ঝপাৎ করে পড়ল ওটা পানিতে। পানি ছিটকে এসে লাগল গায়ে। কেয়ারই করল না ওরা।

পাথরের নিচে একটা গর্ত। ঝুঁকে বসে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। কোমর থেকে টর্চ খুলে নিয়ে আলো ফেলল ভেতরে। অন্য তিনজন ঝুঁকে এল তার কাঁধের ওপর দিয়ে। কুকুরটাও দেখার চেষ্টা করল।

একবার দেখেই ফিরে তাকাল কিশোর। 'সুড়ঙ্গ!'

'ভেরি গুড!' উরুতে চাপড় মারল মুসা। 'পেয়ে গেলাম তাহলে! দেরি কেন

আর? চলো, নেমে পড়ি।'

গর্তটার মুখটা তেমন চওড়া নয়। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো। কিছুদূর যাওয়ার পরই সামনে পাওয়া গেল একটা গুহা। বেশ বড়। দুদিকে দুটো সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে ওটা থেকে। কোনটা ধরে যাবে?

ডানেরটা দিয়েই যাওয়া উচিত, একমত হলো সবাই।

এই সুড়ঙ্গটা উঁচু, আর চওড়া। চলতে অসুবিধে হলো না। কিন্তু গজ বিশেক যাওয়ার পরই শেষ হয়ে গেল ওটা। সামনে দেয়াল। আর এগোনো যাবে না।

আবার ফিরে আসতে হলো গুহায়।

'আর আছে একটা পথ,' মুসা বলল। 'যদি এটাও বন্ধ থাকে?'

'তাহলে আর কি,' কিশোর জবাব দিল, 'ফিরে আসতে হবে। তবে আমার মনে হয় না এটা বন্ধ হবে।'

তার কথাই ঠিক হলো। চলেছে তো চলেছেই ওরা, শেষ আর হয় না। সাংঘাতিক আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ, ছাত নিচু হতে হতে একেক জায়গায় এত নেমে আসছে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হচ্ছে। ওসব জায়গায় যদি সামনে পথ রুদ্ধ দেখা যায়, ভীষণ অসুবিধেয় পড়তে হবে। পথ এতটাই সরু, শরীর ঘুরিয়ে যে ফিরে যাবে, তার উপায় নেই। যে-ভাবে রয়েছে সেই অবস্থায় থেকেই পেছন দিকে চলতে হবে।

তবু হাল ছাড়ল না ওরা। আরেকটা গুহায় পৌছল। কয়েকটা মুখ বেরিয়ে গেছে এখান থেকে। কোনটা দিয়ে যাবে ওরা ভাবছে, টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখছে, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দেখো, চিহ্ন!'

একটা মুখের পাশে দেয়ালে চক দিয়ে আঁকা বড় একটা তীরচিহ্ন।

'ঠিক পথেই চলেছি আমরা,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'এটা দিয়েই যেতে হবে।'

এই সুড়ঙ্গটা বেশি লম্বা নয়। শেষ হয়ে গেল তৃতীয় আরেকটা গুহায় এসে। দেয়ালে কোন সুড়ঙ্গমুখ দেখা গেল না। এত কষ্ট করে এসে তবে কি সব বিফল হলো? ফিরে যেতে হবে?

ওপর দিকে টর্চের আলো ফেলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'একটা ফোকর! মনে হয় ওটাই পথ!...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো তীরচিহ্ন আঁকা!'

ওখানে উঠতেও কোন অসুবিধে নেই। পাথুরে দেয়ালের গায়ে খাঁজকাটা, সিঁড়ির ধাপের মত হয়ে আছে। মানুষের কাটা নয়, প্রাকৃতিক ভাবেই তৈরি হয়ে গেছে সিঁড়িটা।

'সহজেই উঠে যেতে পারব,' টর্চ হাতে এগিয়ে গেল কিশোর।

ফোকরটার কাছে পৌছে মাথা গলিয়ে দিল তাতে। ওপরতলার আরেকটা গুহায় ঢুকল মাথা। টর্চটা দাঁতে কামড়ে দু-হাতে ওপরের গুহাটার মেঝের কিনার ধরে টেনে তুলে আনল শরীরটা।

মুসা উঠল তার পরে। সব শেষে রবিন ও ডনি। না না, কুকুরটা রয়ে গেছে নিচে। নিজে নিজে উঠতে পারবে না। তুলে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মুসা বলল, 'কিশোর, চিতাকে উঁচু করে ধরছি আমি। তোমরা তুলে নেবে।'
নিচে থেকে ঘউ ঘউ শুরু করেছে ততক্ষণে চিতা। ভয় পেয়েছে, ভেবেছে তাকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে ছেলেরা।
'আরে বাবা আসছি,' বলে আবার নিচে নেমে গেল মুসা।
বেজায় ভারি কুকুর। দু-হাতে ধরে ফোকরের ভেতর দিয়ে উঁচু করে ধরল সে।
ওপর থেকে তুলে নিল ওটাকে কিশোর ও রবিন।
হাঁপাতে হাঁপাতে আবার ফোকর গলে উঠে এল মুসা। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'বাপরে বাপ, কুত্তা তো না, একটা গরু!'
'কুত্তা আবার গরু হয় কি করে?' হেসে জিজ্ঞেস করল মুসা।
'দূর, কিচ্ছু বোঝে না! বললাম, গরুর মত ভারি।'
'তো এটা বুঝিয়ে বললেই হয়।'
'যত কম কথা বলে বেশি বোঝানো যায়, রচনার ক্লাসে বলেন না, স্যার। বেশি বলতে গেলে ঢিলে হয়ে যায়…'
'কিন্তু বোঝার মত করে বলতে হবে তো?'
ওদের কথায় কান নেই কিশোরের। গুহাটা দেখছে। লম্বাটে একটা ছোট হলঘরের মত গুহাটা। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে বিশাল এক পাথর, আরেক দিকের দেয়ালে একটা তাকমত হয়ে আছে। তাকে কি যেন একটা জিনিস। পাথরের মত লাগছে না।
ভাল করে দেখার জন্যে এগিয়ে গেল কিশোর।
চিনতে আর অসুবিধে হলো না। বাদামী রঙের একটা চামড়ার ব্যাগ। গায়ে আঁকা রয়েছে একটা তীরচিহ্ন।
'অ্যাই পেয়েছি, পেয়েছি!' চিৎকার করে বলল সে।
দৌড়ে গেল অন্য তিনজন।
ব্যাগটা নামিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে কিশোর। ঝাঁকি দিয়ে দেখল। নড়ল না কিছু। আনমনে বিড়বিড় করল, 'এত হালকা! ভেতরে কিছু আছে বলে তো মনে হয় না!'

ষোলো

'চাবি ছাড়া খোলা যাবে না।'
জোরে জোরে ব্যাগটা ঝাঁকাতে লাগল কিশোর, যেন ঝাঁকিতেই ঝটকা দিয়ে মুখ খুলে গিয়ে ভেতরের জিনিস সব ছিটকে পড়বে।
'তার মানে ভেতরে কি আছে জানতে পারব না!' চরম হতাশ হয়ে বলল মুসা। 'এমনও তো হতে পারে, ফাঁকি দিয়েছে বোথাম না বোতাম, সেই লোকটা? ভেতরে কোন জিনিসই নেই। আসল জিনিসটা সরিয়ে খালি ব্যাগটা ফেলে রেখে গেছে। অন্যদের বোকা বানানোর জন্যে?'
'কেটে খোলা যায় না?' ছুরি বের করার জন্যে পকেটে হাত দিল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, খুব শক্ত চামড়া। সাধারণ পকেট-নাইফ দিয়ে এ-জিনিস কাটা যাবে না। আমার আর্টফলার ছুরিটা আনতে ভুলে গেছি।'

'এমনই হয়। যখন যে জিনিসটা বেশি প্রয়োজন, সেটাই হাতের কাছে পাওয়া যায় না।'

ব্যাগটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল মুসা, যেন ভেতরের জিনিসটা দেখার ওপরই নির্ভর করছে তার জীবন-মরণ।

'যা পাওয়ার তো পেয়েছি, এখন কি করা?' ভোঁতা গলায় যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল রবিন, 'আবার ওই ছুঁচোর গর্তে ঢুকব? যা চিপার চিপা, আসার সময় একেকবার মনে হয়েছে দম আটকেই মরে যাব। এত সরু সুড়ঙ্গে চলা যায়?'

'কি আর করা। বেরোতে তো হবে…'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' কিছু দেখতে পেয়েছে মুসার তীক্ষ্ণ চোখ। 'ওগুলো কি?'

দেয়ালে দুই সারি তীরচিহ্ন আঁকা। একসারি নির্দেশ করছে নিচের দিক, আরেক সারি এগিয়ে গেছে দেয়াল ধরে।

'কি মানে এর?' জবাবটাও নিজেই দিল রবিন, 'যারা জানে না তাদেরকে ধাঁধায় ফেলার চেষ্টা?'

'উঁহু,' চিহ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'নিচের দিক নির্দেশ করে বোঝাচ্ছে ওদিক দিয়ে বেরোনোর পথ আছে, যেদিক দিয়ে আমরা উঠে এলাম। তার মানে অন্য সারিটাও কোন পথই নির্দেশ করছে।'

চিহ্নের ওপর টর্চের আলো ফেলে ফেলে এগোল সে।

দেয়াল ঘেঁষে পড়ে থাকা বড় পাথরটার ওপাশে ঢুকে গেছে চিহ্নগুলো। কাছাকাছি এসে পাথরের অন্য পাশে উঁকি দিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'এই তো আছে পথ! দেখে যাও।'

দেখল সবাই। সরু আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ। মুখের কাছে এসে শেষ হয়েছে তীরচিহ্ন। বুঝিয়েছে, এই মুখ দিয়েও ঢোকা যায়।

'কিন্তু,' প্রশ্ন তুলল রবিন, 'এটা যে সহজ পথ, কি করে বুঝব? যেটা দিয়ে এসেছি, তার চেয়ে খারাপ হতে পারে।'

'তার চেয়ে খারাপ আর কি হবে?'

সুড়ঙ্গটা দেখার পর থেকেই কি যেন ভাবছিল ডনি। বলল, 'আমার বিশ্বাস, ক্যাম্পের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। সুড়ঙ্গটা ওদিকেই গেছে, তবে কোনখান দিয়ে বেরিয়েছে বলতে পারব না।'

মুসা বলে উঠল, 'কিশোর, সেদিন একটা গর্ত দেখেছিলাম রনির ট্রেঞ্চের কাছে, মনে আছে? খরগোশ উঁকি দিতে দেখে যেটা বের করেছিলাম। ওটা দিয়ে বেরোয়নি তো?'

'স্প্যানিশরা যেটাকে স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করত, সেটার কথা বলছ?' ডনি জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।'

মাথা দোলাল ডনি, 'তা বেরোতে পারে। এখানকার পাহাড়ের নিচে গুহারও

অভাব নেই, সুড়ঙ্গেরও অভাব নেই। আব্বা বলেছে, সুড়ঙ্গগুলো জালের মত ছড়িয়ে গেছে, একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত। আমি আর রনিও অনেকগুলোতে ঢুকেছি। তবে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে বেশি ঘোরাঘুরি করতে সাহস পাইনি। যে গর্তটার কথা বলছ, ওটাতেও ঢুকিনি কখনও।'

'ক্যাম্পের কাছাকাছি হলে এটা দিয়ে এগোনোই ভাল,' সুড়ঙ্গমুখটা দেখিয়ে বলল কিশোর। 'রাস্তা অনেক কম হবে।'

সরু মুখ। কুকুরটাকে আগে ঢুকিয়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল মুসা। হাতে টর্চ। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে চলল। পেছনে একে একে ঢুকে পড়ল অন্য তিনজন।

বেশিদূর এগোতে হলো না, চওড়া হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। চলতে আর কোন অসুবিধে নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা।

কিছুদূর সোজা এগিয়ে নিচের দিকে প্রায় খাড়া হয়ে নেমেছে সুড়ঙ্গ। বসে পড়ে পিছলে নামতে শুরু করল গোয়েন্দারা। কুকুরটা দৌড়ে চলল। নেমে গেল সবার আগে। কয়েক গজ গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল যেন ধাক্কা খেয়ে। সামনে পথ বন্ধ। দেয়াল নয়, ছাত ধসে পড়েছে।

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'এইবার মরেছি! নেমেছি ঢাল বেয়ে, উঠে যেতেও বারোটা বাজবে এখন!'

সামনে খুব খারাপ অবস্থা। ছাত থেকে ধসে পড়া পাথর, বালি আর মাটির স্তূপ হয়ে আছে। রুদ্ধ করে দিয়েছে পুরো সুড়ঙ্গটা। এগোনোর চেষ্টা করে লাভ হবে না।

'দূর!' স্তূপের গায়ে লাথি মারল মুসা।

'পাথরকে গালাগাল করে লাভ নেই,' শুকনো গলায় বলল কিশোর। 'বেরোতে হলে নিজেদের চেষ্টায়ই বেরোতে হবে। ফিরেই যেতে হবে। যত জলদি পারা যায়। টর্চের ব্যাটারিও ফুরিয়ে আসছে। আলো না থাকলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাব।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরল ওরা। একেবারে দমে গেছে। গা ঘেঁষে আসা সরু সুড়ঙ্গ ধরে আবার বেরোনোর কথা ভাবতেই ঘেমে যাচ্ছে হাত-পা।

'অ্যাই চিতা, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়,' ডাকল মুসা।

কিন্তু এল না কুকুরটা। দাঁড়িয়েই আছে স্তূপের কিনারে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে কি যেন। কান খাড়া। অবাক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ করেই চেঁচিয়ে উঠল ঘাউ ঘাউ করে।

বদ্ধ জায়গায় বিকট শব্দ হলো। চমকে গেল সবাই।

'কি হয়েছে? চেঁচাচ্ছিস কেন? ওদিক দিয়ে বেরোতে পারবি না। আয়।'

তবু এল না কুকুরটা। স্তূপের মাটি আঁচড়াতে শুরু করল। একনাগাড়ে চেঁচিয়ে চলল, হউ! হউ! হউ! হউ!

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'নিশ্চয় কিছু দেখেছে।'

আঁচড়ে চলল চিতা। মাটি আর ছোট ছোট পাথর ছিটাচ্ছে।

'স্তূপের ওপাশে কিছু আছে,' রবিন বলল, 'ওটার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে

সে। মুসা, ওকে থামতে বলো। দেখি, কিছু শোনা যায় কিনা?'
অনেক কষ্টে কুকুরটাকে থামাল মুসা।
কান পাতল সবাই। হ্যাঁ, মৃদু একটা শব্দ এখন ওদের কানেও আসছে।
খাউ! খাউ! খাউ! খাউ!
'আরে, এ তো কার্ব!' সবাইকে আরেকবার চমকে দিল ডনি। 'নিশ্চয় রনিও আছে তার সঙ্গে! কক্‌খনো তার কাছছাড়া হয় না কুকুরটা।' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'কার্ব! এই কার্ব!'
আবার চিৎকার শুরু করল চিতা। মাটি আঁচড়ানো বেড়ে গেছে।
ভীষণ আওয়াজ হচ্ছে। আরও জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে হলো কিশোরকে, 'কার্বের ডাক যখন শোনা যাচ্ছে, স্তূপটা বেশি পুরু নয়। এর ভেতর দিয়ে পথ করে ঢোকার চেষ্টা করব। এসো, হাত লাগাও, মাটি খোঁড়ো।'
পাশাপাশি চারজনের জায়গা হয় না, কুকুরটা বাদে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দুজন দাঁড়াতে পারে। ফলে চারজন একসঙ্গে কাজ করতে পারল না। প্রথমে শুরু করল মুসা ও কিশোর।
পালা করে মাটি খুঁড়ে চলল ওরা। একই সঙ্গে চলল পাথর সরানো। ধীরে ধীরে ছোট একটা ফোকর দেখা দিল।
মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে খুঁড়তে গেল মুসা।
বাধা দিল কিশোর, 'উঁহু, ঢোকো না। অনেক পুরু স্তূপ। মাটি আর পাথরগুলোও আলগা। বেশি চাপাচাপি করতে গেলে ওপর থেকে বসে গিয়ে জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।'
ককিয়ে উঠল ডনি, 'তাহলে যাব কিভাবে ওপাশে?'
তার প্রশ্নের জবাবেই যেন স্তূপের চূড়ায় দেখা দিল একটা মুখ। ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।
উঠে এসেছে কার্ব। ছাত আর স্তূপের ওপরে সরু একটা ফাঁক আছে।
এপাশে লাফিয়ে পড়ল কুকুরটা।
'কার্ব, কার্ব, রনি কোথায়?' ভাইয়ের খবর জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল ডনি।
তার হাত চেটে দিতে লাগল কুকুরটা।
'রনি!' চিৎকার করে ডাকল কিশোর, 'ওপাশে আছ তুমি?'
দুর্বল কণ্ঠে জবাব এল, 'আছি! কে?'
'আমরা, রনি,' জবাব দিল তার ভাই। 'আমি ডনি।'
নিচে ফোকর করে যাওয়ার চেয়ে স্তূপের ওপরের মাটি সরিয়ে পথ করে যাওয়া সহজ ও নিরাপদ মনে হলো কিশোরের। স্তূপের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল সে। তবে তার আগেই কয়েক লাফে ওপরে উঠে গেল চিতা। সরু ফাঁকটা গলে চলে গেল ওপাশে।
ওপরের মাটি সামান্য সরাতেই মানুষ যাওয়ার পথও তৈরি হয়ে গেল। স্তূপটা পাড় হয়ে অন্যপাশে চলে এল ওরা।
সুড়ঙ্গের মেঝেতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে রনি। টর্চের আলোয়

ফ্যাকাসে দেখাল তার মুখ।

'কেমন আছ, রনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভাল। শুধু গোড়ালিটা...'

ভাইকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ডনি, 'সব আমার দোষ, রনি! তোর সঙ্গে ঝগড়া না করলে এমন হত না...' কেঁদে ফেলল সে।

রনির চোখও শুকনো রইল না। আবার মিল হয়ে গেল দু-ভাইয়ে।

ডাক্তারি শুরু করে দিল মুসা। রনির পা-টা দেখতে বসে গেল। টিপেটুপে দেখে বলল, 'হুঁ, তোমারটার অবস্থা ডনির চেয়ে খারাপ।'

'ওরও ভেঙেছে নাকি?'

'ভাঙেনি কারোরটাই। তোমারটা মচকেছে, ও শুধু শক্ত ব্যথা পেয়েছে। ওরটা সেরে গেছে। তোমারটাও যাবে।'

'কিন্তু দাঁড়াতেই তো পারি না।'

'পারবে,' অভয় দিল মুসা, 'আমরা সাহায্য করব। দরকার হলে বয়ে নিয়ে যাব। খিদে-টিদে পেয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল রনি।

পকেট থেকে চকলেট বের করে দিল রবিন, 'নাও, এটা খাও।'

ডনির পকেটে বিস্কুট আছে। নাস্তা করার সময়ই রেখে দিয়েছিল, ভাইকে পাওয়া গেলে দেয়ার জন্যে। বের করে দিল।

খেয়েদেয়ে শরীরে বল পেল রনি। তার গোড়ালিটাও রুমাল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে মুসা।

কিশোর জানতে চাইল, 'এখন বলো তো, কি করে এলে এখানে?'

রনি বলল, 'সকালে ঘুমিয়ে ছিলাম। পায়ের কাছে গুটিসুটি হয়ে আছে কার্ব। হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করল। অবাক হলাম। ওরকম করে কেন? উঠে বসলাম। এই সময় দেখি তিনজন লোক...'

বাধা দিল মুসা, 'তাদের একজন মহিলা, না?'

'চেনো নাকি?'

'চিনি। কি করে চিনলাম, পরে বলব,' কিশোর বলল। 'তোমার কথা বলো।'

'লোকগুলো এলেই খালি খোঁজাখুঁজি করে। ওদের এই ছোঁক ছোঁক ভাল লাগে না আমার। একবার এসে পাথর উল্টে উল্টে তছনছ করে দিয়ে গিয়েছিল ক্যাম্প এলাকা। তাই আবার ওদের আসতে দেখে ভীষণ রাগ হতে লাগল। কার্বকে লেলিয়ে দিলাম। লাথি মেরে উল্টে ফেলে দিল ওকে একটা লোক। আর কি ছাড়ি, গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর।'

'সাহস আছে তোমার,' মুসা বলল। 'তারপর? একআধটাকে কাবু করতে পেরেছিলে?'

'না, কি করে? ওদের সঙ্গে কি গায়ের জোরে পারি নাকি? একজন ঠাস করে এক চড় মারল। আরেকজন কি দিয়ে জানি বাড়ি মারল মাথায়। বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। বলতে শুনলাম, এই বিচ্ছুটাকে ছেড়ে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। গিয়ে লোক ডেকে নিয়ে আসবে। সর্বনাশ করে দেবে আমাদের। আরেকজন

বলল, একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। টানতে টানতে আমাকে গর্তের কাছে নিয়ে চলল ওরা।'

'কোন গর্ত?' ডনি জিজ্ঞেস করল।

'ওই যে, স্টোররুম…'

'ওখানে নামাল কি করে? দড়ি ছাড়া তো নামা যায় না…'

'দড়ি ওদের সঙ্গেই ছিল। এক মাথা বাঁধল গাছের গোড়ায়। অনেক চেঁচামেচি করলাম, লাথি মারলাম, কিন্তু আমাকে ছাড়ল না। গর্তে নামতে বলল। কিছুতেই রাজি হলাম না। না হয়ে ভুল করেছি, পরে বুঝলাম। আমি নিজে নিজে না নামায় শেষে জোর করে আমার কোমরে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। বাঁধাটা শক্ত হয়নি, আমি অর্ধেক পথ নামতেই খুলে গেল গিঁট। অনেক ধস্তাধস্তি করেছি, মাথায় বাড়ি খেয়েছি, মাথার ভেতর গোলাচ্ছে তখন। গিঁট খুলে গেলে দড়িটা আর ধরে রাখতে পারলাম না। পিছলে গেল হাত থেকে। গর্তের নিচে পড়ে গেলাম। মনে হলো পা-টা ভেঙে গেল। ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'নেমে এল লোকগুলো। আমার পা-টা একবার দেখলও না। নিজেদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে বসল। আমি তখন ব্যথায় ককাচ্ছি…'

'জানোয়ার!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ডনি, 'আস্ত জানোয়ার!'

'সুড়ঙ্গ, বোথামের নকশা, কি কি সব বলতে লাগল ওরা, কিছুই বুঝলাম না। মাথা চক্কর মারছিল। ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখানে কি করে এসেছি জানি না। নিশ্চয় হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে। হুঁশ ফিরলে দেখলাম, পড়ে আছি।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'লোকগুলোকে আর দেখোনি?'

'দেখেছি। ওরা তখনও যায়নি। পথ বন্ধ দেখে খেপে গেছে। গালাগাল করছে স্তূপটাকে। ওটার ওপরে উঠতে গেল একজন। ছাত থেকে একটা পাথর খসে পড়ল মাথায়। আউ করে উঠে নেমে এল তাড়াতাড়ি, মাথার একপাশ চেপে ধরে। এরপর আর ওঠার সাহস করল না কেউ। ঠিক করল, ফিরে গিয়ে শাবল, বেলচা, এসব নিয়ে আসবে, পথ পরিষ্কার করার জন্যে।'

'ও, শাবল আর বেলচা তাহলে ওরাই নিয়ে এসেছে,' মুসা বলল। 'এ-জন্যেই পাইনি।'

'পাওনি মানে?'

'তোমার ট্রেঞ্চ থেকে একটা শাবল আনতে গিয়েছিলাম। পাইনি।'

'পাবে কি করে, ওগুলো নেই তো ওখানে। এক রাতে দুটো শাবল চুরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আর বাইরে ফেলে রাখি না। কাজ শেষ করে ঘুমাতে যাওয়ার আগে লুকিয়ে রাখি। এমন জায়গায়, সহজে খুঁজে পাবে না কেউ।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'ওই ব্যাটারাই চুরি করেছে, ওদেরই দরকার হয়েছিল। তা লোকগুলো আর এসেছে?'

'না।'

'তোমাকে ফেলে গেছে তো অনেকক্ষণ, এখনও আসছে না কেন?'

'কাছাকাছি কোথাও ওসব যন্ত্রপাতি পাবে না ওরা, যেতে হবে দূরের গাঁয়ে। ওখান থেকে আসতে সময় লাগবে। এতক্ষণে আসার সময় অবশ্য হয়ে গেছে।'

'সর্বনাশ! আমাদের পালানো উচিত।'
'হ্যাঁ।'
'কিন্তু তোমাকে এখানে ফেলে গেল কেন?'
'ওরা জানে আমার পা ভেঙেছে। ভাঙা পা নিয়ে পালাতে পারব না। কোন দিকে যেতে পারব না। ফলে আর তেমন মাথা ঘামায়নি। ওরা কাজ সেরে ফেরত যাওয়ার সময় হয়তো বাইরে বের করে নিয়ে যেত।'
শয়তান লোকগুলো যে কোন সময় এসে হাজির হতে পারে জেনে অস্বস্তিতে পড়ে গেল সবাই।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'গর্ত থেকে এ-জায়গাটা কত দূরে, আন্দাজ করতে পারো?'
'খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না।'
'জলদি করা দরকার,' রবিন বলল। 'যে পথে ঢুকেছে ওরা, নিশ্চয় সে-পথেই বেরিয়েছে। দড়িটা ঝুলিয়ে রেখে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ আবার নামতে হবে। বার বার খোলা-বাঁধার ঝামেলা করবে না।'
'আমারও তাই মনে হয়,' একমত হলো কিশোর। 'এখান থেকে কাছে হলে আমরাও ওদিক দিয়েই বেরোনোর চেষ্টা করব।'
'চলো না যাই,' তাগাদা দিল মুসা। 'ব্যাটারা চলে এলে বিপদে ফেলে দেবে।'
ভাবছে কিশোর, ওদিক দিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। লোকগুলো কখন আসবে জানে না ওরা। এমনও হতে পারে, ওরা দড়ি বেয়ে উঠছে, ঠিক ওই সময় এসে হাজির হলো। নিরাপদ হত, যে পথে এসেছে সে-পথে যদি ফিরে যাওয়া যেত। কিন্তু টর্চের ব্যাটারি প্রায় শেষ। বেশিক্ষণ আর চলবে না। তার ওপর সুড়ঙ্গ জায়গায় জায়গায় এত সরু, সেখান দিয়ে রনিকে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হবে। অতএব সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।
মুসার দিকে তাকাল সে, 'ওকে তোলো।'
রনির ওপর ঝুঁকল মুসা। বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে পারবে তো? না বয়েই নিতে হবে?'
'দেখি চেষ্টা করে।'
কিন্তু পারল না সে। মুসার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, আহত পা-টা মাটিতে ফেলেই আঁউ করে উঠল। রাখতেই পারে না।
'দূর, মিয়া, পারবে না,' মুসা বলল। 'অত শরমের দরকার নেই। দেখি, আমার গলা ধরে ঝুলে পড়ো।'
বস্তার মত করে রনিকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে এগোল মুসা। টর্চ হাতে আগে আগে চলল কিশোর। রবিন, ডনি ও কুকুর দুটো রইল মুসার পেছনে।
সুড়ঙ্গ এখানে যথেষ্ট চওড়া, উঁচুও খুব, মাথা ঠেকে যায় না, ফলে হাঁটতে অসুবিধে হলো না। দেয়ালে একটু পর পরই তীর চিহ্ন দেয়া, ওরা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে নির্দেশ করা।
কয়েক মিনিটেই বিশাল এক গুহায় এসে ঢুকল ওরা। অনেক ওপরে গর্তের মুখ

দিয়ে আলো আসছে। এত নিচে পৌছাচ্ছে না সেই আলো। গর্তের দেয়ালেও তীরচিহ্ন দেখা গেল—সুড়ঙ্গমুখের দিকে নির্দেশ করছে।

মুসা বলল, 'কিশোর, আলোটা ধরো তো?...ওই তো, আছে দড়িটা। বাঁচা গেল।'

কিশোর বলল, 'রনি, কোমরে আবার দড়ি বেঁধেই তোমাকে উঠতে হবে। মুসা, ওকে নিয়ে তুমি থাকো। আমরা উঠে যাই। ওকে প্রথম পাঠাবে। তারপর কুত্তা দুটোকে। টেনে তুলে নেব আমরা।'

দড়ির দিকে এগোল সে। খোদা, লোকগুলো যেন এখন এসে না পড়ে! দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল ও। বেয়ে উঠতে শুরু করল।

নিরাপদেই গর্তের বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে, ঘামছে দরদর করে। তবে কোন ঝামেলা হয়নি। চট করে তাকিয়ে নিল আশেপাশে। লোকগুলোকে আসতে দেখল না। নিচে উঁকি দিয়ে তাড়াতাড়ি করার নির্দেশ দিল রবিন ও ডনিকে।

ওরা দুজনও উঠে এল।

তারপর কোমরে দড়ি বেঁধে পাঠানো হলো রনিকে। ওপর থেকে তাকে টেনে তুলে নিল কিশোররা তিনজনে।

কুকুর দুটোকে তোলাও কঠিন হলো না। ব্যাগটাও দড়িতে বেঁধে পাঠানো হলো।

সব শেষে উঠল মুসা।

সে উঠেও সারল না, কিশোরের কাঁধে হাত রেখে রবিন বলে উঠল, 'আসছে ব্যাটারা!'

এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল বলে নজর রাখতে পারেনি ওরা, লোকগুলোকে আসতে দেখেনি তাই। অনেক কাছে চলে এসেছে। তবে গোয়েন্দাদের দেখেনি।

তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল কিশোর। বলল, 'মুসা, সবাইকে নিয়ে ট্রেঞ্চে নেমে যাও। কুত্তা দুটোকে শান্ত রাখবে। টুঁ শব্দ যেন না করে।'

'তুমি?'

'আমার কাজ আছে। তোমরা যাও। আহ্, তাড়াতাড়ি করো!'

রনিকে আবার পিঠে তুলে নিল মুসা। ট্রেঞ্চে নামার আগে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দেখল, গর্তের কাছেই একটা ঘন ঝোপে ঢুকে যাচ্ছে কিশোর।

চুপ করে ট্রেঞ্চে বসে আছে মুসা। তার সঙ্গীরাও চুপ। কয়েক মিনিট পর নিকের ঘড়ঘড়ে কণ্ঠ কানে এল, 'এসব আর দড়িতে বাঁধতে হবে না। ফেলে দাও নিচে।'

শাবল-বেলচাগুলো গর্তে ফেলতে বলছে লোকটা, বুঝতে অসুবিধে হলো না মুসার।

আরও কিছুক্ষণ ওদের কথাবার্তা শোনা গেল। তারপর সব চুপচাপ।

আরও প্রায় মিনিট পাঁচেক পর ট্রেঞ্চের একপাশ থেকে উঁকি দিল কিশোর পাশার মুখ। হাত নেড়ে হাসিমুখে ডাকল, 'উঠে এসো।'

সতেরো

হন্তদন্ত হয়ে থানায় এসে ঢুকল গোয়েন্দারা। অফিসেই পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে। ভুরু কুঁচকে তাকালেন তিনি, 'কিশোর, তোমরা? কি ব্যাপার? একেবারে সদলবলে?'

হাতের ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে রাখল কিশোর। 'আগে এটা খুলুন, স্যার।'

অবাক হলেন ক্যাপ্টেন, 'কি আছে এতে? কোথায় পেলে?'

'পেয়েছি একটা গুহায়। কি আছে জানি না। খুললেই বোঝা যাবে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আস্তে মাথা ঝাঁকালেন একবার। সামনের চেয়ারগুলো দেখিয়ে ছেলেদের বসতে বললেন।

বসল ওরা।

ড্রয়ার থেকে একটা রিঙ বের করলেন ক্যাপ্টেন। চাবির রিঙের মত, তবে আরও বড়। তাতে নানা রকমের যন্ত্রপাতি চাবির মত করেই আটকানো। একটা যন্ত্র বেছে নিয়ে ব্যাগের তালায় ঢুকিয়ে কয়েকবার মোচড় দিলেন। কাজ হলো না। আরেকটা যন্ত্র বেছে ঢোকালেন তালার ফুটোয়। দুই বার মোচড় আর কয়েকবার ওপরে-নিচে করতেই মৃদু কিট করে একটা শব্দ হলো। গোয়েন্দাদের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুলেছে।'

কি আছে দেখার আর তর সইছে না ছেলেদের। আগ্রহ, উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে এল।

তাড়াহুড়া না করে ব্যাগের মুখের ঢাকনা তুললেন ক্যাপ্টেন। ভেতরে দেখলেন।

'কি আছে, স্যার!' একসঙ্গে জানতে চাইল তিন-চারটে কণ্ঠ।

মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন, 'কিছু না। একেবারে খালি।'

চেয়ার থেকে উঠে গিয়েছিল মুসা, ধপ করে বসে পড়ল। হতাশ ভঙ্গিতে হেলান দিল রবিন। কেবল কিশোরের কোন ভাবান্তর নেই। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ব্যাগটার দিকে। ঘন ঘন চিমটি কাটল দু-বার নিচের ঠোঁটে।

'এবার বলো,' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, 'ব্যাগটা কোথায় পেলে? এর ভেতরে জিনিস আছে কেন মনে হলো?'

'সে-এক লম্বা গল্প, স্যার,' কিশোর বলল।

'বলো, শুনি।' ড্রয়ার থেকে বড় একটা নোটবুক টেনে বের করলেন ক্যাপ্টেন। 'হ্যাঁ, শুরুটা কি করে হলো?'

'শুরুটা হয়েছে স্যার, চিতার কান দিয়ে,' জবাব দিল মুসা।

নোটবুকের পাতায় পেন্সিলের সীস স্থির হয়ে গেল। কুঁচকে অনেক কাছাকাছি হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের ভুরু জোড়া। 'কিসের কান?'

'এই কুকুরটা, স্যার। এর নাম চিতা। বাঁ কানে কোপ মেরেছিল শয়তান পোলাপান। পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বলে দিলেন, চুলকালে ক্ষতি

হবে, কুকুরটার গলায় শক্ত দেখে একটা হার্ডবোর্ডের কলার পরিয়ে দিতে, যাতে নাগাল না পায়।'

নোটবুকে লিখে নিতে নিতে থেমে গেলেন ক্যাপ্টেন। মুখ তুলে বললেন, 'দেখো, অযথা সময় নষ্ট কোরো না আমার। কুকুরের গলার হার্ডবোর্ড নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আসল কথা বলো।'

'এটা আসল কথাই, স্যার।'

মুসা, কিশোর ও রবিন মিলে বলে গেল এক অসামান্য অ্যাডভেঞ্চার আর রহস্যের কাহিনী। লিখতে লিখতে কখনও ভুরু কোঁচকালেন ক্যাপ্টেন, কখনও ভীষণ গম্ভীর হলেন, পরক্ষণেই হয়তো মুচকি হাসি খেলে গেল ঠোঁটের কোণে।

ভূতুড়ে আলো আর শব্দের কথা বলল মুসা।

হাসলেন ইন্সপেক্টর। 'তোমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছে, এ-তো বোঝাই যায়। কিন্তু তোমরা ভয়ও পাওনি, তাড়িতও হওনি। কারা করেছে এসব?'

দুই চোরের কথা বলল গোয়েন্দারা।

নিক ও জেরির নাম আলাদা করে টুকে নিলেন তিনি।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কেউ?'

'এক মহিলা ছিল ওদের সঙ্গে।'

'তার নাম?'

'জানি না, স্যার। ওরা একবারও বলেনি।'

'কোন প্রমাণ আছে তোমাদের কাছে?'

পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করে দিল কিশোর, যেটাতে জুতোর ছাপ এঁকে এনেছে।

একবার দেখলেন ক্যাপ্টেন। আবার ভাঁজ করে একটা ফোল্ডারে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'থাক, কাজে লাগতেও পারে। তারপর কি ঘটল?'

গভীর মনযোগে ওদের সুড়ঙ্গ-অভিযানের কাহিনী শুনলেন তিনি। চুপ করে ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে রইলেন পুরো পনেরো সেকেণ্ড। আবার টেনে নিলেন কাছে। 'খালি কেন বুঝতে পারছি না। বোথামের মিথ্যে বলার কোন কারণ দেখি না। তাদের ফাঁকিই বা দিতে যাবে কেন? সে ওদের কব্জায় রয়েছে। ফাঁকি দিলে আবার চেপে ধরতে পারবে তাকে।' ব্যাগটা তুলে জোরে জোরে ঝাঁকালেন। ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন আরেকবার।

হঠাৎ কিশোর বলল, 'স্যার, আমার হাতে দিন তো। আর আপনার ছুরিটা, প্লীজ!'

ব্যাগটা ঠেলে দিলেন ক্যাপ্টেন। ছুরি বের করে দিলেন ড্রয়ার থেকে।

খুব সাবধানে ব্যাগের লাইনিং কেটে ফেলল কিশোর। আঙুল ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। টেনে বের করে আনল কয়েক পাতা মোটা কাগজ। টেবিলে রাখল।

সবাই ঝুঁকে এল দেখার জন্যে। প্রচুর অঙ্ক, আঁকিবুকি, নকশা আর রেখায় ভরা কাগজগুলো। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, অলস মুহূর্তে কাগজ-কলম সামনে পেয়ে, অহেতুক আঁকাআঁকি করেছেন কোনও অঙ্কের প্রফেসর।

কিছু না জানলে অবশ্য ফালতুই ভাবত, কিন্তু এখন তা ভাবতে পারল না কেউ। ফালতু হলে ব্যাগে ভরে এত কষ্ট করে গুহায় লুকাতে যেত না বোথাম। আর এটা পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠত না তিন চোর।

রবিন বলল, 'আমার বিশ্বাস, এটা কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। কোনও ধরনের ফর্মুলা।'

মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন, 'ঠিক বলেছ। তাই হবে। আর ফর্মুলা হয়ে থাকলে কার, তা-ও আন্দাজ করতে পারছি।'

'কার?' মুসার প্রশ্ন।

'ডক্টর আবু নাসের চৌধুরীর নাম শুনেছ?'

'কোন আবু নাসের, স্যার? বিখ্যাত ফিজিসিস্ট?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'শুনেছ তাহলে?'

'শুনব না কেন? পত্রিকা আর টিভির কল্যাণে বিখ্যাত এই বাংলাদেশী বিজ্ঞানীকে কে না চেনে। এক সাংঘাতিক আবিষ্কার করে বসেছেন তিনি। ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার পদ্ধতি। এর উন্নতি হলে মানুষকেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্র্যান্সমিট করে দেয়া যাবে। সৌরজগতের যে কোন গ্রহে তখন চলে যাওয়াটা কিছুই না মানুষের জন্যে। এমনকি আমাদের সৌরজগতের বাইরেও চলে যেতে পারবে। গুণ্ডা-বদমাশের হাতে এই জিনিস পড়লে ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে যাবে। পুরো পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দেয়া যায় এর সাহায্যে।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। সামনের কাগজগুলোর দিকে তাকালেন অনেকটা ভয়ে ভয়ে, 'আমার বিশ্বাস, এটাই সেই ফর্মুলা,' টেবিলে রাখা যেন আর নিরাপদ নয়, এমন ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে রেখে দিলেন ড্রয়ারে। 'দুই মাস আগে থানায় ডায়েরী করিয়েছেন ডক্টর চৌধুরী—তাঁর একটা মহামূল্যবান ফর্মুলা চুরি হয়ে গেছে বলে। অস্থির হয়ে আছেন। হন্যে হয়ে খুঁজেছে কিছুদিন পুলিশ, বের করতে পারেনি। তিনি নিজেও খুঁজেছেন অনেক। এটা যদি সেই ফর্মুলাই হয়ে থাকে, তাহলে একটা কাজের কাজই করেছ তোমরা।'

'কিন্তু এটা যে তাঁরই ফর্মুলা, শিওর হলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এখনও হইনি, এসব জটিল জিনিস তো আর বুঝি না। তবে হব। ফোন করছি ডক্টরকে।'

রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন ক্যাপ্টেন। কথা বললেন। লাইন কেটে দিয়ে রিসিভার রাখতে রাখতে হাসিমুখে বললেন, 'এখনই রওনা হচ্ছেন তিনি। বিশ মিনিটেই পৌঁছে যাবেন।... তোমরা শুধুমুখে বসে না থেকে কোক খাও। আনাই?'

কারোরই আপত্তি নেই।

ঠিক বিশ মিনিটের মাথায় ঘরে ঢুকলেন ড. চৌধুরী।

রবিন বলেছে, পত্রিকা আর টিভির দৌলতে ডক্টর কারও অচেনা নন, কিন্তু মুসাই কখনও তাঁর ছবি দেখেনি, চিনত না। সে ভেবেছিল এতবড় বিজ্ঞানী, বয়েস নিশ্চয় সত্তরের কাছাকাছি, গোলগাল মুখ, চকচকে টাক, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, ভারি লেন্সের চশমা, কিছুটা পাগলাটে স্বভাবের এবং দুনিয়া সম্পর্কে উদাসীন—জিনার

বাবার মত।

কিন্তু তার কল্পনার সঙ্গে কিছুই মিলল না। ঘরে যিনি ঢুকলেন, বড়জোর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়েস হবে তাঁর, লম্বা, সুদর্শন, ক্লিনশেভ্‌ড, মাথায় চুলের অভাব নেই, চোখে দামী সানগ্লাস, সিনেমার হিরো বলে চালিয়ে দেয়া যায় অনায়াসেই। পাগলাটেও নন, বদমেজাজীও নন।

উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন, 'আসুন, ডক্টর, আসুন।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

হাত মেলালেন ড. নাসের। চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফর্মুলাটা কোথায়? দেখিয়ে আগে নিশ্চিন্ত করুন, তারপর কথা।'

ড্রয়ার থেকে কাগজগুলো বের করে দিলেন ক্যাপ্টেন।

দ্রুত প্রতিটি পাতায় একবার করে চোখ বোলালেন ড. নাসের। হাসলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে। পেলেন কোথায়?'

ইঙ্গিতে গোয়েন্দাদের দেখালেন ক্যাপ্টেন, 'এরা খুঁজে বের করেছে।'

সংক্ষেপে সব জানালেন ডক্টরকে।

মাঝখানে একটিও কথা না বলে চুপচাপ সব শুনলেন ডক্টর। তারপর হাসিমুখে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরাই তাহলে তিন গোয়েন্দা। দেখা হয়ে ভাল হলো। শুধু আমার নয়, সমগ্র মানবজাতির একটা মস্ত উপকার করলে তোমরা।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

হাত মেলাতে মেলাতে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাদের নাম শুনেছেন, স্যার?'

'শুনেছি। ভালমত শুনেছি। তোমাদের কোন কাহিনীই আমার অজানা নেই, অন্তত বই যে কটা বেরিয়েছে। বেরোলেই বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয় আমার নামে।'

এত বড় একজন বিজ্ঞানী 'তিন গোয়েন্দা' পড়েন শুনে হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

সেটা বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললেন ডক্টর, 'কি মনে করো তোমরা, বিজ্ঞানী হলেই বুড়ো হতে হবে, আধপাগলা হতে হবে, বিজ্ঞান ছাড়া দুনিয়ার আর কোন খবর রাখবে না? ভুলটা এবার ভাঙা উচিত তোমাদের। না বলে পারছি না, আমি একজন অ্যাডভেঞ্চারার, বিগ গেম হান্টার, বিগ ফিশ হান্টার, প্রত্নতাত্ত্বিক, এবং বিজ্ঞানী। আরও বলি? ছোটবেলা থেকেই রহস্যের প্রতি অদম্য আকর্ষণ আমার, কিশোর, তোমার মত নেশাই বলতে পারো। আমি তিন গোয়েন্দা পড়ব না তো কে পড়বে?'

ধাক্কাটা সামলাতে কিশোর পাশারও সময় লাগল। বলল, 'আরও আগেই আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত ছিল স্যার, আমাদের। আপনার নাম শুনেছি, টিভিতে চেহারাও দেখেছি, কিন্তু শুধুই বিজ্ঞানী হিসেবে। আরও এতসব গুণ আছে আপনার জানলে, সত্যি বলছি, যত কঠোর প্রহরায়ই থাকতেন, আমাদের ঠেকাতে পারতেন না। ঠিকই গিয়ে হাজির হতাম আপনার দুর্গে।'

হাসলেন ডক্টর। 'খুব সুন্দর করে কথা বলো তুমি, কিশোর। আসলে আমারও অন্যায় হয়েছে। জানি রকি বীচে থাকো, বাংলাদেশী, তোমার গোয়েন্দাগিরিও

আমার ভাল লাগে, একদিন গিয়ে দেখা করে আসা উচিত ছিল।'

'তাতে কি, স্যার? দেখা তো হয়েই গেল।'

'বরং এভাবে দেখা হওয়াটাই ঠিক হয়েছে,' হেসে বললেন ক্যাপ্টেন—খুব উপভোগ করছেন তিনি এক অসাধারণ বিজ্ঞানী আর তিন গোয়েন্দার কথাবার্তা। 'খুব নাটকীয় হয়েছে।'

সবাই একমত হলো সে-ব্যাপারে।

'আরও ভাল হত,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'যদি চোরগুলোকে পাকড়াও করতে পারতে। তবে ছাড়ব না আমি, ব্যাটাদের ধরবই।'

রহস্যময় হাসি হাসল কিশোর। 'শেষ কথাটা বলা হয়নি আপনাকে, স্যার।'

'শেষ কথা মানে?'

'ব্যাটাদের ধরার ব্যবস্থা করেই রেখে এসেছি। দড়ি বেয়ে গুহায় নেমেছে বটে ওরা, কিন্তু আর বেরোতে পারবে না।'

ভুরু কুঁচকে গেল ক্যাপ্টেনের, 'পারবে না কেন! দড়ি বেয়ে আবার উঠে চলে যাবে।'

'পারত, সেই দড়িটা যদি থাকত জায়গামত, তাহলে। ঝোপের মধ্যে বসে দেখছিলাম আমি। তিনজনে নেমে গেল। বেরিয়ে গিয়ে দড়িটা তখন তুলে ফেললাম। এমন জায়গায় ফেলে এসেছি ওটা, অলৌকিক ভাবে ডানা গজিয়ে যদি বেরিয়ে আসতে পারে ওরা, তাহলেও খুঁজে পাবে না।'

কিশোর থামতে রবিন বলল, 'বেরোনোর আরেকটা যে পথ আছে, ঝর্নার পাড়ের সুড়ঙ্গমুখ, সেটাও বন্ধ করে এসেছি বিরাট পাথর দিয়ে। সারা জনম ধরে ঠেললেও ওটা সরাতে পারবে না ব্যাটারা।'

'ভুলে যাচ্ছ, একজন বেটিও আছে তাদের সঙ্গে,' সংশোধন করে দিল মুসা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। হাসি ফুটতে শুরু করল মুখে। বাড়তে বাড়তে হা-হা হাসিতে রূপ নিল সেটা। বললেন, 'তোমরা সত্যি একেকটা রত্ন!···বোসো, আরেকটা করে কোক খাও, কেক খাও, ততক্ষণে আমি লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করি। ব্যাটাদের ধরে নিয়ে আসুক।'

বিজ্ঞানীও হাসছেন। বললেন, 'আমি তাহলে যাই। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।'

'এক মিনিট, ডক্টর। একটা রেজিস্টার সই করতে হবে।'

যাওয়ার আগে ডক্টর বললেন তিন গোয়েন্দাকে, 'এসো না একদিন, চলে এসো আমার ওখানে। অনেক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনাব। তোমাদের *ভীষণ অরণ্য* কিংবা *অথৈ সাগরের* চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয় সেগুলো।'

একটা কার্ড বের করে দিলেন তিনি। তাতে লেখা ঠিকানাটা পড়ল কিশোর:

ড. আবু নাসের চৌধুরী
ডিরেক্টর: ওয়ার্ল্ড অ্যাটমিক সেন্টার
ডিয়ার ক্রীক
লস অ্যাঞ্জেলেস।

'আসার আগে কষ্ট করে একটা ফোন করে নিয়ো আমাকে,' আবার বললেন

তিনি। 'তাহলে আর ঢুকতে অসুবিধে হবে না তোমাদের।'

অবশ্যই যাবে, কথা দিল কিশোর। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ডও দিল ডক্টরকে।

'এই তাহলে তোমাদের সেই বিখ্যাত কার্ড।' যত্ন করে কার্ডটা নিজের ব্যাগে রেখে দিলেন ডক্টর। চিতাকে দেখিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা তোমাদের চার নম্বর গোয়েন্দা হতে যাচ্ছে নিশ্চয়?'

'ভাবছি, স্যার,' বলল কিশোর। 'দেখি, কি করা যায়।'

সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডক্টর।

চোরগুলোকে ধরে আনতে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে অফিস ছেড়ে বেরোলেন ক্যাপ্টেন।

তাঁর ঘরে বসে আরেক প্রস্থ কোক আর কেক চালাল তিন গোয়েন্দা।

ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসলেন ক্যাপ্টেন, 'ফোর্স রওনা করিয়ে দিয়ে এলাম।'

'আমরা তাহলে উঠি, স্যার। তাদের ফিরে আসতে তো কয়েক ঘণ্টা লাগবে। কি হলো, পরে ফোন করে জেনে নেব।'

'ফোন আমিই করব। চোরগুলোকে শনাক্ত করতে হবে তোমাদের। আদালতে সাক্ষিও দেয়া লাগতে পারে।'

চেয়ার থেকে উঠল ছেলেরা।

আঙুল তুললেন ক্যাপ্টেন, 'ও হ্যাঁ, ভাল কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। রনি-ডনিকে কি করেছ?'

'ডাক্তারখানায় পৌঁছে দিয়ে এসেছি। ডাক্তার বললেন, তেমন কিছু হয়নি রনির পায়ে, সেরে যাবে।'

'গুড।'

থানা থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে চিতা।

মুসা বলল, 'সব তো ভালয় ভালয় সারল, এখন কুত্তাটাকে নিয়েই চিন্তা।'

'কোনো চিন্তা নেই,' কিশোর বলল। 'প্রথমে যাব তোমাদের বাড়িতে। আন্টির হাতে-পায়ে ধরব। রাজি করাতে না পারলে মুখ কালো করে বেরিয়ে আসব, তাঁকে দেখাব যে আমরা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছি। তিন-তিনটে ছেলেকে অখুশি করে খুশি হওয়ার মত মনের জোর যদি তাঁর থাকে, ভাল কথা। মাপ করে দেব। বাড়িতে কুত্তা জায়গা দেয়ার বিরক্তি আর সহ্য করতে হবে না তাঁকে। তারপর গিয়ে চাচীর ওপর চড়াও হব। ভাল ভাবে রাজি হলে হলো, না হলে আজই চুরি হবে স্যালভিজ ইয়ার্ডে।'

'তিন গোয়েন্দা থেকে তিন চোর?' হাসল রবিন।

'হলো না। তিন গোয়েন্দা ইকুয়্যালটু তিন চোর।'

হা-হা করে হেসে উঠল তিনজনে। না না, চারজন। চিতাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। তবে তার হাসির শব্দটা অন্য রকম, অনেকটা মানুষের কাশির মত: খুফ্! খুফ্! খুফ্!

*****